সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-খ

স. ইলিন, আ. মতিলেভ

অর্থশাস্ত্র কী

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

২০৫.

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

স. ইলিন, আ. মতিলেভ

অর্থশাস্ত্র কী

GRONTHO.COM

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: প্রফুল্ল রায়

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী: ফ. ভোলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবস্কি (প্রধান সহসম্পাদক), ф. বুর্লাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউরলভ

АВС СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

С. Ильин, А. Мотылев

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ?

На языке бенгали

ABC OF SOCIAL AND POLITICAL KNOWLEDGE

S. Ilyin, A. Motilev

WHAT IS POLITICAL ECONOMY?

In Bengali

© Progress Publishers 1986

© বাংলা অনুবাদ • প্রগতি প্রকাশন • ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

И $\frac{0603000000-507}{014(01)-88}$ 305-88

ISBN 5-01-000808-1

সূচি

GRONTHO.COM

ভূমিকা ৯

অধ্যায় ১। সমাজজীবনের ভিত্তি ১১
- ইতিহাসের খেয়াল ১১
- একটি মহৎ আবিষ্কার ১৪
- বৈষয়িক উৎপাদন ১৬
- মনুষ্যশ্রম ১৮
- শ্রমের সাধিত্র ও শ্রম-প্রয়োগের বস্তু ২০
- উৎপাদনের উপায় ২৪

অধ্যায় ২। দৃশ্য ও অদৃশ্য যোগসূত্র ২৬
- উৎপাদিকা শক্তি ২৭
- উৎপাদন-সম্পর্ক ২৮
- শ্রম বিভাজন ৩২
- সমাজবিপ্লবগুলির মূল কারণ ৩৫
- অর্থনৈতিক ভিত্তি ও অতিসৌধ ৪০
- উৎপাদন-প্রণালী ও শ্রেণীসমূহ ৪৩

অধ্যায় ৩। ভোগ ঘটতে পারার আগে ৪৬
উৎপাদন ও ভোগ ৪৭
উৎপাদ বণ্টন ৫০
উৎপাদ বিনিময় ৫৩
পুনরুৎপাদন পর্বগুলির ঐক্য ৫৫

অধ্যায় ৪। আকস্মিক ঘটনাক্রমে নয় ৫৭
প্রকৃতির নিয়ম ও সমাজের নিয়ম ৫৮
সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট ৬৫
অর্থনৈতিক বর্গসমূহ ৬৭
অর্থনৈতিক নিয়মগুলির সচেতন ব্যবহার ৬৯

অধ্যায় ৫। অণুবীক্ষণ আর বিকারক ছাড়াই ৭৩
অবধারণার সর্বজনীন পদ্ধতি ৭৪
বিমূর্ত ও মূর্ত ৭৬
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ৮৩
যুক্তিগত ও ঐতিহাসিক ৮৫
পরিমাণ ও গুণ ৮৮
সামাজিক কর্মপ্রয়োগ ৯১

অধ্যায় ৬। ভাবধারণার বিপুল ক্ষমতা ৯৬
অর্থশাস্ত্রে বিপ্লব ৯৮
দার্শনিক ভিত্তি ৯৯
সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ভাবধারণা ১০২
সমাজ বিষয়ক অভিমতে ইতিহাসবাদ ১০৪
অর্থনৈতিক গবেষণার ইতিহাস ১০৬

বুর্জোয়া শ্রেণীর মস্তকে এযাবৎ নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্করতম ক্ষেপণাস্ত্র ১১৭
মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু ১২০
বুর্জোয়া গবেষকদের দৃষ্টিতে অর্থশাস্ত্রের বিষয় ১২৭
বুর্জোয়া অবস্থান থেকে ১৩৬
শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান থেকে ১৪৪

অধ্যায় ৭। পুঁজিবাদ দৃশ্যপটে আসার আগে ১৫০
আমাদের কালে অতীতের জেরগুলি ১৫০
মানবজাতির শৈশব ১৫৪
দাসপ্রথা . ১৬৪
সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাস . . . ১৭৯

অধ্যায় ৮। পুঁজির যেখানে সর্বময় কর্তৃত্ব ১৯১
পণ্য উৎপাদন কী? ১৯৩
পণ্য ১৯৫
পণ্য-মূল্য . ১৯৮
শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্র . . . ১৯৯
ব্যক্তিগত ও সামাজিক শ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্ব . ২০১
মূল্যের নিয়মটি কীভাবে কাজ করে? . . ২০৩
অর্থ কী? . ২০৬

পুঁজিবাদী শোষণের সারমর্ম . . ২১২
উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের পদ্ধতি ২২০
পুঁজিবাদী সমাজের দুই মেরুপ্রান্ত . . ২২৯
শোষকদের আয় . . . ২৩৯
সংকটের অর্থনীতি ২৫০
একচেটিয়া আধিপত্য ২৫৭
একচেটিয়া সংস্থাগুলির বৈদেশিক সম্প্রসারণ ২৬৬
ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন ২৭২
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বেক্ষণ ২৭৬

অধ্যায় ৯। সমাজের পরিকল্পনাভিত্তিক নির্মাণ:
সব কিছু মানুষের জন্য ২৮৪
বিদ্যমান সমাজতন্ত্র ২৮৪
নতুন ধরনের সমাজে উত্তরণের কালপর্ব ২৮৯
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার মূলকথা . ২৯৩
জাতিসমূহের সমতার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ২৯৭
নিঃস্বার্থ সহায়তা ২৯৯
কৃষির সহযোগ . . ৩০৫
সাক্ষরতার চেয়েও বেশি ৩১০
সমাজতন্ত্রের মূলস্তম্ভ . . ৩১৩
জনগণের উপকারার্থে ৩১৫
একটিমাত্র পরিকল্পনার অধীনে ৩১৭
বণ্টনের ন্যায়সংগত নীতি ৩২০
অর্থনৈতিক হাতিয়ার . ৩২৪
চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ৩৩০
সামাজিক উৎপাদ ৩৩২

এক নতুন ধরনের বিশ্ব অর্থনীতি . . . ৩৩৬
সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষসাধন ও কমিউনিজমে
ক্রমান্বিত উত্তরণ . . . ৩৪০
কমিউনিজমের উচ্চতর পর্ব ৩৪৬

টীকা ও ব্যাখ্যা ৩৪৮

ভূমিকা

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই আছে নিজস্ব বিষয়। আমরা যখন স্কুলে অংক কষতে শিখি তখন গণিতশাস্ত্রের বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে শুরু করি। যখন আমরা দুটি চকচকে গোলকের মাঝখানে একটি বিদ্যুচ্চমক দেখি, তখন প্রবেশ করি পদার্থবিদ্যার চিত্তাকর্ষক জগতে। রসায়নশাস্ত্র বিবেচনা করে পদার্থসমূহের গঠন, গুণ ও রূপান্তর, এবং জ্যোতির্বিদ্যার কারবার গাগনিক গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নিয়ে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি যত বিকশিত হয়, সেগুলি এসে মেলে একটিমাত্র স্রোতোধারায়, তা আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক বিশ্বের এক সার্বিক চিত্রকে প্রতিফলিত করে। সেগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয় যথার্থ ও ফলিত বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে, যেগুলি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' হিসেবে যা পরিচিত তা কী কী নীতির উপরে গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন

আর কর্মনিপুণ হাত যা কিছু সৃষ্টি করেছে তার গড়নের নীতিগুলি বুঝতে সাহায্য করে।

কিন্তু আরও এক ধরনের সমান গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান আছে, যেগুলি মানবসমাজের নানা দিক বিশ্লেষণ করে। ইতিহাস, দর্শন, আইন, ভাষাবিদ্যা ও অন্য অনেক সামাজিক বিজ্ঞান মানবজাতি যেসব সামাজিক অবস্থায় বাস করেছে ও বিকাশলাভ করেছে সেগুলির জটিল জাল উন্মোচন করতে সাহায্য করে, এবং সমাজপ্রগতির জন্য বাস্তবকে রূপান্তরিত করতে তা সাহায্য করে। এই বিজ্ঞানগুলির মধ্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্র গৌরবময় স্থানাধিকারী। তা অধ্যয়ন করে মানবজাতির বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে উৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থা, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় লোকের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, এবং বৈষয়িক মূল্যগুলির উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়-নিয়ামক নিয়মগুলি।

এই বইটির লক্ষ্য হল এই বিজ্ঞান সম্পর্কে, এক উন্নততর সমাজজীবন সৃষ্টির প্রচেষ্টায় মানুষকে সাহায্য করা যার উদ্দেশ্য সেই বিজ্ঞান সম্পর্কে, পাঠকদের একটা পরিষ্কার ধারণা দেওয়া।

অধ্যায় ১

সমাজজীবনের ভিত্তি

ইতিহাসের খেয়াল

মানবজীবন কখনোই সরল বা সহজ ছিল না, আর মানবজাতির ঐতিহাসিক অগ্রগতি কখনোই একটা অবকাশশিথিল পদচারণা ছিল না। বিপ্লব আর সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, শোষিতের কঠোর মেহনত আর শোষকদের অলস বিলাস, বিস্তীর্ণ শহর আর জঙ্গলে কুঁড়েঘর — এই হল মানবেতিহাসের বৈপরীত্য। তার বিচিত্রদিক্ ঘটনাগুলির মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? সুখ আর সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকে যাওয়ার একটা সোজা রাস্তা খুঁজে বার করার জন্য ইতিহাসের গোলকধাঁধায় এমন কোনো সূত্র কি আছে যেটা কেউ অনুসরণ করতে পারে? সহস্র সহস্র বছর ধরে মানুষ এরকম একটা পথের সন্ধান করেছে। নিপীড়িতরা উত্থিত হয়েছে তাদের উপরে নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে, প্রখর কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিরা এমন এক সামাজিক

বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার প্রকল্প উপস্থিত করেছেন, যেখানে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হবে এবং মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে বাস করবে সমানতা ও ভ্রাতৃত্বের নীতির ভিত্তিতে। সে সমস্তই ছিল সেই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যে সমাজব্যবস্থায় সমাজ বিভক্ত ছিল মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগী শোষক আর বিপুল সংখ্যক শোষিতের মধ্যে, যে শোষিতরা ছিল সুখের অধিকার থেকে বঞ্চিত, আর যাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল ধনী ও অলসদের উপকারার্থে মেহনত করা।

এই উৎকট অবিচার ছিল মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে, পৃথিবীর স্থপতি, তার সমস্ত বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্যের স্রষ্টা মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে। এই পৃথিবীতে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা প্রত্যেকেই সত্যিকার মানুষের জীবনযাপন করার উপযুক্ত।

বিরাট মনুষ্য-শ্রম বিস্ময়কর সব ব্যাপার ঘটাতে পারে। তা খুঁজে বার করতে পারে ও কাজে লাগাতে পারে অস্পৃষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদকে, অন্যান্য গ্রহের পথনির্দেশ করতে পারে এবং ঊষর মরুভূমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত কৃতিত্বগুলির মধ্য দিয়ে মানুষ পরিশীলিত সূক্ষ্ম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি করতে ও চালাতে শিখেছে, যে সমস্ত উপকরণের গুণ প্রাকৃতিক পদার্থগুলির গুণকেও ছাড়িয়ে যায় এমন সব উপকরণ তৈরি করতে শিখেছে, এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করার জন্য জল, হাওয়া, সূর্য, এমন কি পরমাণুর শক্তিকেও

পোষ মানিয়ে কাজে লাগাতে শিখেছে। মানুষের শ্রম, তার কল্পনার পরিধি, তার উদ্দেশ্যপূর্ণ ইচ্ছাশক্তির নিহিত সম্ভাবনাগুলি সীমাহীন।

কিন্তু প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে শেখা এবং তার নিয়মগুলি অনুধাবন করতে শেখার পরও মানুষ তাদের নিজেদের ইতিহাসকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম ছিল। বহু প্রাকৃতিক ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী: ঋতু পরিবর্তন হয়, রাতের পরে আসে দিন ঠিক যেমন দিনের পরে আসে রাত, ইত্যাদি, অথচ সমাজজীবন এই রকম অদম্য পৌনঃপুনিকতায় চিহ্নিত নয়: ঐতিহাসিক যুগগুলির পরিবর্তন লক্ষ করা তত সহজ নয়, কেননা প্রত্যেক প্রজন্ম ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়ে এমন এক সামাজিক গঠন দেখতে পায়, যেটি গড়ে তুলেছে তার আগের প্রজন্মগুলি। সমাজে ক্রিয়াশীল লোকেদের নিজস্ব এক চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি আছে, এবং কোন চালিকা শক্তির জন্য তারা ক্রিয়া করে তা নির্ণয় করা সব সময়ে সহজ নয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলি শাসিত হয় ব্যক্তিদের দ্বারা (জ্ঞানী বা মূর্খ, ভালো বা মন্দ, শাসক অথবা তাদের পারিষদবৃন্দ), তাদের ক্রিয়াকলাপের গতি-প্রকৃতির দ্বারা। ভাব-ধারণাই পৃথিবীকে শাসন করে — সেই অভিমত থেকে এই সরল সিদ্ধান্তটিই টানা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নগুলি অবশ্যম্ভাবী রূপেই ওঠে, সেগুলির জবাব এতে পাওয়া যায় না: সেই ভাব-ধারণাগুলিরই উদ্ভব হয়

কীভাবে? সেগুলি কতটা ফলপ্রসূ এবং ইতিহাসের ধারায় কতখানি প্রাসঙ্গিক তা নিরূপণ করার কোনো মানদণ্ড আছে কি?

উপনিবেশবাদীরা গোটা একেকটা মহাদেশ জয় করে নিয়েছিল এবং সেখানকার জাতিগুলিকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেছিল শুধু এই কারণেই নয় যে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল রক্তপিপাসু সামরিক নেতারা, বরং এই কারণে যে তাদের নির্দিষ্ট সব লক্ষ্য ছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল তাদেরই লুব্ধ বিস্তৃত বাহু দিয়ে, যারা আরও সম্পদের জন্য লোভাতুর ছিল। সেই জন্যই, এমনকি লুঠেরারা যখন দাবি করে যে তারা একটা 'সভ্যকরণ ব্রত' সম্পন্ন করছে এবং বলে যে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জাতিগুলিকে আধুনিক সংস্কৃতির উচ্চশীর্ষে তুলে আনা, তখনও ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের অন্তঃসার পরিবর্তিত হয় না। এই ধরনের বাগাড়ম্বরের আড়ালে তারা অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রত্যেক জাতির সঞ্চিত সাংস্কৃতিক মূল্যগুলিকে পদদলিত করে।

'ভাব-ধারণাই পৃথিবীকে শাসন করে', এই কথা বলাটা অতিপ্রাকৃত শক্তির মুখোমুখি মানুষের অক্ষমতা স্বীকার করারই সমতুল।

একটি মহৎ আবিষ্কার

মানুষের আচরণ, অভিমত ও ক্রিয়ার সত্যিকার চালিকা শক্তির ব্যাখ্যা করতে হলে, সমাজজীবনের

গোটা স্রোতোধারাটা যেখান থেকে প্রবাহিত হয়, সেই মূল পর্যন্ত যাওয়া উচিত।

সে কাজটা সর্বপ্রথম করেছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস — শ্রমিক শ্রেণীর ও অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের মহান শিক্ষকদ্বয়। প্রায় দেড় শতাব্দী আগে, তাঁরা সমাজ সম্পর্কে ও তার ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বৃহত্তম বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন একটি মতবাদ বিশদ করে, যা পরিচিত হয়েছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে, অথবা **ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি** হিসেবে। সেই মহৎ আবিষ্কারের পর থেকে পৃথিবী হয়েছে বড় বড় ঘটনার রঙ্গভূমি, যেসব ঘটনা সমস্ত জাতির, সামগ্রিকভাবে মানবজাতির ভাগ্যকে প্রভাবিত করেছে। সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশে প্রতিটি পদক্ষেপ মার্কসীয় মতবাদের নতুন প্রমাণ উপস্থিত করেছে। সেকেলে হওয়া তো দূরের কথা, এর কিছু কিছু বিরুদ্ধবাদী যেটা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে — তা শক্তি ও প্রাণবত্তা অর্জন করছে, কেননা তা মানুষের প্রগতি, শান্তি ও সুখের পথনির্দেশ করে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধির প্রধান প্রধান বিষয় হল এই:

— ইতিহাস এক প্রাকৃতিক বিষয়গত প্রক্রিয়া এবং তা তৈরি হয় মানুষের নিজেদেরই দ্বারা, কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই;

— মানুষ ইতিহাস তৈরি করে তাদের যথেচ্ছ বাসনা অনুযায়ী নয়, বরং সমাজের বিকাশের প্রতিটি

পর্যায়ে সমাজে যেসমস্ত বৈষয়িক অবস্থা গড়ে ওঠে, সেগুলির ভিত্তিতে;

— এই সমস্ত বৈষয়িক অবস্থাই সমাজের গোটা কাঠামোর প্রাণকেন্দ্র এবং তার আত্মিক জীবন, রাজনীতি, প্রভৃতিকে নির্ধারিত করে। মার্কস তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সুবিদিত এই সূত্রটিতে: 'মানুষের চৈতন্য তাদের অস্তিত্বকে নির্ধারিত করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই চৈতন্যকে নির্ধারিত করে।'* অবশ্য, সামাজিক সত্তা ও চৈতন্য এখানে একজন পৃথক ব্যক্তির জীবনযাপনের অবস্থা বা একক চৈতন্যকে বোঝায় না, বোঝায় সামগ্রিকভাবে সমাজের, নানা শ্রেণী, বিভিন্ন সামাজিক বর্গ, প্রভৃতি গঠনকারী বড় বড় জনগোষ্ঠীর সত্তা ও চৈতন্যকে।

ইতিহাস সম্পর্কে এরূপ এক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনীতি সম্পর্কে, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও ব্যাপারগুলি সম্পর্কে অভিমতেও মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাই, সেই বৈষয়িক উৎপাদন কী, যা মানবসমাজের বিকাশে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে?

বৈষয়িক উৎপাদন

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের দরকার খাদ্য-বস্ত্র, আবাসন ও অন্যান্য বৈষয়িক মূল্য। কিন্তু এগুলি

---

* Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 21.

প্রকৃতির মধ্যে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না, মানুষের নিজেদের দ্বারাই, তাদের শ্রমের দ্বারাই উৎপন্ন হতে হয়।

সমাজবিকাশের গোড়ার পর্যায়গুলিতেই মানুষ বিভিন্ন উৎপাদ উৎপন্ন করার কাজে লিপ্ত ছিল: তারা বন্য পশু শিকার করে তার মাংস ঝলসাত, মাছ ধরত, আদিম হাতিয়ারপত্র বানাত, বাসস্থান নির্মাণ করত, ইত্যাদি। তাদের চাহিদার দ্বারা চালিত হয়ে তারা তাদের শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের পরিধি সম্প্রসারিত করেছিল এবং তাদের হাতিয়ারপত্র ও খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে ত্রুটিহীন করেছিল। শিকার করা থেকে তারা গেল পশুদের পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করার দিকে, এবং তার পরে ফসল ফলানোর দিকে। পরে, তারা নিযুক্ত হতে শুরু করেছিল হস্তশিল্পে: বয়ন, মৃৎশিল্প, ধাতুকর্ম, প্রভৃতিতে। বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে হস্তশিল্পের কৃৎকৌশল আর কায়িক শ্রমের ভিত্তিতে ম্যানুফ্যাকচারগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেল, যা শেষ পর্যন্ত বিকাশলাভ করে পরিণত হল বৃহৎ-পরিসর যন্ত্র উৎপাদনে।

আমাদের কালে, **বৈষয়িক উৎপাদনই** লোকের ব্যবহৃত উৎপাদগুলির প্রধান উৎস। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, আবাসন, প্রভৃতির চাহিদা পূরণের জন্য উদ্দিষ্ট ভোগের সামগ্রী ছাড়াও দরকার হয় সেই সাধিত্রগুলি তৈরি করা, যেগুলির সাহায্যে এই বৈষয়িক মূল্যগুলি উৎপন্ন হয়। উৎপাদনের সংজ্ঞানিরূপণ করা যায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ঘটমান এমন এক প্রক্রিয়া বলে, যেটি চলাকালে মানুষ প্রাকৃতিক পদার্থগুলিকে মানবজীবনের

জন্য প্রয়োজনীয় একটি উৎপাদে রূপান্তরিত করে। উৎপাদন ছাড়া মানবসমাজ টিকে থাকতেও পারে না, বিকশিতও হতে পারে না। ইতিহাসের ধারায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে, একটা সমাজব্যবস্থা আরেকটা সমাজব্যবস্থাকে স্থান ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু উৎপাদন সব সময়েই থাকবে সমাজের জীবনের ভিত্তি।

লোকে বৈষয়িক মূল্য উৎপন্ন করে সম্মিলিতভাবে, গোষ্ঠীবদ্ধ এবং সামগ্রিকরূপে সামাজিকভাবে, যার ফলে উৎপাদনের অবস্থা যাই হোক না কেন, সেই উৎপাদন সব সময়েই সামাজিক, এবং শ্রম সব সময়েই একজন সামাজিক ব্যক্তিমানুষের ক্রিয়া। বৈষয়িক মূল্য উৎপাদন তিনটি মূল উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে: মনুষ্যশ্রম (বা কাজ), শ্রম-প্রয়োগের বস্তু ও শ্রমের সাধিত্র।

মনুষ্যশ্রম

দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শোষণ আর নিপীড়ন এই অভিমতের জন্ম দিয়েছিল যে শ্রম একটা গুরুভার বোঝা। বস্তুতপক্ষে, শ্রম — সচেতন ও উদ্দেশ্যপূর্ণ মানবিক ক্রিয়ার এক প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে লোকে প্রাকৃতিক বস্তুগুলি পরিবর্তিত করে — মানবজীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। বুর্জোয়া গবেষকরা বীবর, মৌমাছি, পিঁপড়ে বা মাকড়সার 'শ্রম' বর্ণনা করে সেগুলির প্রতি সামাজিক উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যসূচক 'শ্রম বিভাজন', 'শ্রম সংযোগ' ও অন্যান্য ব্যাপারে আরোপ করার যে চেষ্টা করেন তা অর্থহীন।

পশুপ্রাণীরা প্রায়শই রীতিমত জটিল ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে, কিন্তু সেগুলি তারা করে সহজপ্রবৃত্তিবশে, পক্ষান্তরে মানুষ তার কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রাখে এবং নির্দিষ্ট কিছু ফল পেতে চায়। মার্কস লিখেছেন: '...শ্রেষ্ঠ মৌমাছির থেকে নিকৃষ্টতম স্থপতির প্রভেদটা এই যে স্থপতি তার কাঠামোটি বাস্তবে নির্মাণ করার আগে কল্পনায় খাড়া করে।'*

লোকে প্রকৃতির শক্তিগুলির উপরে কর্তৃত্ব অর্জন করে এবং তার সম্পদগুলিকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে। তারা যন্ত্র তৈরি করে, জমি চাষ করে, খনি থেকে আকরিক ধাতু ও কয়লা তোলে ও তা প্রক্রিয়ণ করে, তেল নিষ্কাশন ও শোধন করে, ইত্যাদি। তাদের বস্ত্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তারা তুলো ফলায়, সুতো কাটে, বয়ন করে এবং পোশাক বানায়। তাদের আবাসনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তারা কাঠ কাটে, ইট ও অন্যান্য উপকরণ বানায় এবং গৃহ নির্মাণ করে। শ্রম হল মানবজীবনের ভিত্তি, তার প্রাকৃতিক ও চিরন্তন শর্ত।

প্রণিধানযোগ্য যে, সব ধরনের কাজই বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রটির অন্তর্গত নয়। যেমন, ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্পী, প্রভৃতিদের কাজ কোনো বৈষয়িক মূল্য উৎপন্ন করে না।

---

* Karl Marx, *Capital*, Vol. I, Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 174.

শ্রমের প্রক্রিয়ায় লোকে তাদের মানসিক, স্নায়বিক ও পেশীগত শক্তি ব্যয় করে, কিংবা, ভাষান্তরে, তাদের **শ্রমশক্তি** ব্যয় করে। শেষোক্তটি হল একজন ব্যক্তিমানুষের কাজ করার কায়িক, মানসিক ও অন্যান্য সামর্থ্যের সমগ্রতা। তাই শ্রম হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে শ্রমশক্তি ব্যয়িত হয়।

শ্রম-প্রক্রিয়া যাতে চলতে পারে, সেজন্য তদনুষঙ্গী বিকশিত মানবিক শ্রমশক্তি দরকার। কার্যত, এর বিকাশের মাত্রা বৈষয়িক উৎপাদনের স্তর নিরূপণ করার একটি মানদণ্ড। উৎপাদনের কৃৎকৌশলগত স্তরের আবার তার পক্ষ থেকে, শ্রমজীবী জনগণের উপরে, তাদের শ্রমশক্তির উপরে একটা প্রতিদানমূলক প্রভাব থাকে। বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনের কাজে মানুষের ব্যক্তিত্ব নিজেই বিকশিত হয়, মানুষের শ্রম-দক্ষতা ত্রুটিহীন হয়, অর্জিত হয় নতুন জ্ঞান। সমগ্র মানবজীবনের প্রথম ও মূল শর্ত হিসেবে শ্রম এক অর্থে খোদ মানুষকেই সৃষ্টি করেছে।

শ্রমের সাধিত্র ও শ্রম-প্রয়োগের বস্তু

শ্রম-প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির উপরে ক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গে লোকে **শ্রমের সাধিত্র** সৃষ্টি ও ব্যবহার করে। এই সবই হল বৈষয়িক উপায়, মানুষ যেগুলি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পদার্থকে রূপান্তরিত করার জন্য, এগুলি হল সেই বৈষয়িক উপায় মানুষ যা ক তার নিজের আর

প্রাকৃতিক পদার্থের মাঝখানে স্থাপন করে প্রাকৃতিক পদার্থের উপরে ক্রিয়া করার উদ্দেশ্যে।

শ্রমের সাধিত্রগুলির মধ্যে পড়ে: প্রথম, শ্রমের কারিগরি যন্ত্র বা হাতিয়ার (যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, সাধনী, ইঞ্জিন, প্রভৃতি); দ্বিতীয়, শিল্পের জন্য ব্যবহার্য অঙ্গনাদি সহ ইমারত; তৃতীয়, পরিবহণ ও যোগাযোগের সুব্যবস্থা; এবং চতুর্থ, শ্রম-প্রয়োগের বস্তুগুলি ভাণ্ডারজাত করার জন্য আধার ও ট্যাঙ্ক (বাঙ্কার, সিস্টার্ন, সিলিণ্ডার, গ্যাস-হোল্ডার, প্রভৃতি), অর্থাৎ অর্থনীতির গোটা উৎপাদনী যন্ত্র। শ্রমের সাধিত্রগুলির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল শ্রমের কারিগরি যন্ত্রগুলির, যেগুলির যান্ত্রিক, পদার্থগত, রাসায়নিক, জীববিদ্যাগত ও অন্য গুণাবলীকে মানুষ ব্যবহার করে বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনের কাজে।

খনিজ সঞ্চয়ভাণ্ডার সহ জমি, জল, অরণ্য ও অন্যান্য সম্পদ হল বিশ্বজনীন শ্রমের সাধিত্র, এগুলি ছাড়া উৎপাদন অকল্পনীয়। ১৭শ শতাব্দীর ইংরেজ অর্থনীতিবিদ উইলিয়ম পেটির ভাষায়, 'শ্রম হল তার (বৈষয়িক সম্পদের) জনক আর ধারিত্রী হল জননী'।* বিশ্বজনীন শ্রমের সাধিত্র হওয়ায় জমি সেই ভূমিকায় কৃষিতে ও অন্যত্র কাজ করতে পারে একমাত্র তখনই যখন শ্রমের অন্য সাধিত্রগুলি লভ্য হয় এবং যখন মানুষের শ্রমশক্তি বিকাশের এক অপেক্ষাকৃত উঁচু স্তরে গিয়ে পৌঁছয়।

---

* Ibid., p. 50.

পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির উপরে ক্রিয়া করার জন্য শ্রমের সাধিত্রগুলি ব্যবহার করতে-করতে, লোকেরা নিজেরাই পরিবর্তিত হতে থাকে, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করে এবং সেটা আবার শ্রমের সাধিত্রগুলির উৎপাদনী প্রযুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষসাধনের এবং শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। মানুষ তার শ্রমের সাধিত্রগুলির বিকাশসাধন করতে গিয়ে আদিম একটা লাঠি বা পাথরের কুড়ুলের ব্যবহার থেকে আধুনিক রোবটের ব্যবহার পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে।

হাতিয়ার তৈরি মনুষ্যশ্রমের এক বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ। কোনো কোনো জাতের পশু প্রাকৃতিক হাতিয়ারগুলির (যেমন লাঠি বা পাথর) প্রাথমিক ব্যবহার করতে সক্ষম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বানর একটা গাছ থেকে ঘা-মেরে ফল পাড়ার জন্য লাঠি বা পাথর ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তারা আদিমতম কুঠার বা কাটারি তৈরি করতে অক্ষম। মনুষ্যশ্রম শুরু হয়েছিল এই আদিম হাতিয়ারগুলি তৈরি করা থেকেই। সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির, মুখ্যত হাতের ত্রুটিহীনতাসাধন। বস্তুত, হাত হল শ্রমের একটি উৎপাদ, তথা শ্রমের একটি যন্ত্র।

প্রকৃতির উপরে কাজ করতে গিয়ে এবং নিজেদের লক্ষ্য অনুযায়ী তাকে পরিবর্তিত করতে গিয়ে মানুষ শ্রমের সাধিত্রগুলিকে ত্রুটিহীন করে, প্রকৃতির নিয়মগুলি সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান অর্জন করে এবং তার উপরে অধিকতর কর্তৃত্ব লাভ করে। শ্রম-প্রক্রিয়ায়

মানুষ যে প্রাকৃতিক পদার্থগুলির উপরে কাজ করে, সেগুলিকে বলা হয় **শ্রম-প্রয়োগের বস্তু**। এগুলির মধ্যে থাকতে পারে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত উপকরণ (যেমন আকরিক ধাতু, যা খনি থেকে তোলা হচ্ছে, কিংবা একটি গাছ, যেটি কেটে ফেলা হচ্ছে), এবং ইতিমধ্যেই জীবন্ত মনুষ্যশ্রমের প্রভাবাধীন হয়েছে এমন উপকরণ (যেমন খনি থেকে নতুন তোলা আকরিক ধাতু, যা একটি ধাতু কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে কিংবা একটি নতুন কাটা গাছ, যেটিকে দিয়ে আসবাবপত্র বানানো হচ্ছে)। শেষোক্তগুলি কাঁচামাল হিসেবে পরিচিত। তাই, যে কোনো কাঁচামালই শ্রম-প্রয়োগের বস্তু, যদিও প্রত্যেক শ্রম-প্রয়োগের বস্তু মোটেই কাঁচামাল নয়। শ্রম-প্রয়োগের একই বস্তু যেতে পারে প্রক্রিয়াণের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, যেখানে মনুষ্যশ্রম তার উপরে প্রযুক্ত হয়। এইভাবে, খনি থেকে তোলা আকরিক ধাতু খনি-শ্রমিকদের শ্রমের উৎপাদ, কিন্তু একটা ধাতু কারখানায় সেই একই আকরিক ধাতুকে দেখা হয় কাঁচামাল হিসেবে। আর সেই কারখানায় উৎপন্ন ইস্পাত একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কাজ করবে কাঁচামাল হিসেবে। ভাষান্তরে, প্রাকৃতিক পদার্থগুলি শ্রম-প্রয়োগের বস্তু হয়ে ওঠে একমাত্র তখনই, যখন তার উপরে মনুষ্যশ্রম প্রযুক্ত হয়।

খনিজ সম্পদ, জল ও অরণ্য সহ জমি হল এক বিশ্বজনীন শ্রম-প্রয়োগের বস্তু। এর সমস্ত সম্পদই সমাজের হাতে প্রাকৃতিক অবস্থার সমষ্টি।

মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের চরিত্র ও মাত্রা

নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্তরের উপরে, সেগুলির প্রযুক্তিগত প্রয়োগের মাত্রার উপরে, এবং সমাজব্যবস্থার প্রকৃতির উপরে। বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি, বিশেষত চলমান বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লব শ্রম-প্রয়োগের বস্তু হিসেবে উৎপাদন-ক্ষেত্রের মধ্যে টেনে আনা প্রাকৃতিক উৎপাদগুলির পরিধিকে সম্প্রসারিত করে।

উৎপাদনের উপায়

শ্রম-প্রক্রিয়াকে যদি তার ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তা হলে শ্রমের সাধিত্রগুলি ও শ্রম-প্রয়োগের বস্তুগুলি হল **উৎপাদনের উপায়।** এখানে যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা এই যে একই জিনিস শ্রম-প্রয়োগের একটি বস্তু হিসেবে, কাঁচামাল অথবা শ্রমের এক সাধিত্র হিসেবে কাজ করতে পারে, সেটা নির্ভর করে শ্রম-প্রক্রিয়ায় তার স্থান কী তার উপরে, সেই প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকার উপরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের কাছে, যে সেলাই কলটি তৈরি করা হচ্ছে সেটি শ্রমের উৎপাদ আর পোশাক-প্রস্তুতকারক একটি কারখানার শ্রমিকদের কাছে, তা হল শ্রমের একটি সাধিত্র।

শ্রমের সাধিত্র ও উৎপাদগুলি অতীত শ্রমের মূর্তরূপ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি জীবন্ত শ্রমের প্রক্রিয়ায় জড়িত না হয়, ততক্ষণ সেগুলি থাকে এক জড় বস্তুপিণ্ড। যে যন্ত্র শ্রম-প্রক্রিয়ায় কাজ করে না সেটি নিতান্তই অকেজো: তাতে মর্চে ধরে, তা সেকেলে

হয়ে যায় এবং মেরামতের অভাবে দুর্দশায় পড়ে, ঠিক যেমন যে সুতো দিয়ে বস্ত্র তৈরি করা হয় না, তা নষ্ট হয়ে যায়। খোদ মানুষের শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের কথা বলতে গেলে, উৎপাদনের কোনো উপায় ছাড়া তা চলতে পারে না। তাই বৈষয়িক উৎপাদন একমাত্র সম্ভব শ্রমের সাধিত্র ও শ্রম-প্রয়োগের বস্তুতে মূর্ত অতীত শ্রম আর জীবন্ত শ্রমের এক অঙ্গাঙ্গী মিলনের ফলে।

মানুষের শ্রম, তার উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপ ও প্রকৃতির উপরে তার অভিঘাত ঘটে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে। শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়ায়, মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীগুলিতে।

অধ্যায় ২

দৃশ্য ও অদৃশ্য যোগসূত্র

বৈষয়িক মূল্য উৎপন্ন করতে গিয়ে মানুষ প্রকৃতির উপরে শুধু ক্রিয়াই করে না, পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধও হয়। ফলত, সামাজিক উৎপাদনের দুটি দিক আছে। প্রথমটি প্রকাশ করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং তা সমাজের **উৎপাদিকা শক্তি** বলে পরিচিত। দ্বিতীয়টি প্রকাশ করে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে সম্পর্ক, এবং তা **উৎপাদন-সম্পর্ক** নামে পরিচিত। এগুলি হল আদিম কমিউনের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক, ক্রীতদাস-মালিক আর ক্রীতদাস, সামন্ত-প্রভু আর ভূমিদাস, পুঁজিপতি আর মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং শোষণমুক্ত ও উৎপাদনের উপায়ের সহ-মালিক শ্রমজীবী জনগণের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক। সমাজের বিকাশের প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে মানুষ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির উপরে

ক্রিয়া করে একমাত্র নির্দিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামোর ভিতরেই।

উৎপাদিকা শক্তি

উৎপাদিকা শক্তিগুলির মধ্যে পড়ে বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায় তথা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানবলে যারা বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনের জন্য এই সমস্ত উৎপাদনের উপায় ব্যবহার করে সেই লোকেরা। স্বীয় উৎপাদনী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেরাই হল উৎপাদিকা শক্তিগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তি। মানুষ ছাড়া এমন কি সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতিও প্রাণহীন। মানুষই নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও নির্মাণ করে এবং সেগুলিকে উৎপাদনে ব্যবহার করে।

বস্তুগত উপাদানগুলি — উৎপাদনের উপায় — হল **সমাজের বস্তুগত ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি**। শ্রমের সাধিত্রগুলি, সর্বোপরি কারিগরি যন্ত্রগুলিই, সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির অভ্যন্তরে সবচেয়ে চলিষ্ণু ও রূপান্তরকারী উপাদান। বৈষয়িক উৎপাদনে যে প্রগতিশীল পরিবর্তনগুলি শেষ পর্যন্ত সমাজজীবনের অন্য সমস্ত পরিবর্তনকে নির্ধারণ করে, সেগুলি শুরু হয় শ্রমের সাধিত্র দিয়ে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তর দেখায়, মানুষ কত ভালোভাবে প্রকৃতির শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করেছে। প্রাচীনকালে, আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহার সেই পথে

একটা বিরাট বড় পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছিল, আর আমাদের যুগে মানুষ বস্তুর গঠনের রহস্যগুলির আরও গভীরে প্রবেশ করছে, পারমাণবিক শক্তিকে করায়ত্ত করছে, এবং মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলি নিরন্তর বৃদ্ধি ও বিকাশের এক দশায় থাকে। কৃৎকৌশলগত প্রগতি শ্রমের অন্তর্বস্তুকে পরিবর্তিত করে চলে, আর উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মানুষের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত সামর্থ্যের গুরুত্বও তদনুযায়ী পরিবর্তিত হয়; বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষমতার ভূমিকা বেড়ে যায়, আর শারীরিক শক্তির ভূমিকা কমে যায়। বিজ্ঞান বিকাশলাভ করে পরিণত হয় প্রত্যক্ষ এক উৎপাদনী শক্তিতে।

উৎপাদন-সম্পর্ক

এক নির্জন দ্বীপে বেঁচে থাকা নিঃসঙ্গ ভগ্নপোত ব্যক্তি, ড্যানিয়েল ডেফোর রবিনসন ক্রুসোর মতো নিজে থেকে লোকেরা বৈষয়িক মূল্য উৎপন্ন করে না। লোকে সর্বদাই বাস করে এসেছে গোষ্ঠীতে, জনসম্প্রদায়ে। বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদন অবাস্তব ব্যাপার, ঠিক যেমন একসঙ্গে বাস করে ও পরস্পরের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করে এমন লোকসমাজ ছাড়া একটি ভাষার অস্তিত্ব ও বিকাশ অবাস্তব। প্রাচীন গ্রীসের মহান চিন্তানায়ক আরিস্ততল তখনই উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষ এক সামাজিক জীব। উৎপাদনের অবস্থা যাই

হোক না কেন, তা সর্বদাই সামাজিক। বৈষয়িক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় লোকে বিষয়গতভাবে (তাদের ইচ্ছা ও চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে) যে সমস্ত অর্থনৈতিক যোগসূত্র ও সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, সেগুলি উৎপাদন- (বা অর্থনৈতিক) সম্পর্ক হিসেবে পরিচিত। প্রায়শই অপ্রত্যক্ষগোচর ও অদৃশ্য এই সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সামাজিক উৎপাদন ঘটে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ামক ভূমিকা পালন করে সামাজিক সম্পর্ক-প্রণালীতে, সেটাই এর ভিত্তি, এর বনিয়াদ। লোকের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক শেষাবধি নির্ভর করে অর্থনৈতিক সম্পর্কের চরিত্রের উপরে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও, উৎপাদনকর্মে জড়িত লোকেরা উৎপাদনের প্রযুক্তি ও শ্রম সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বহু সম্পর্কও স্থাপন করে। তাই, এই ধরনের সম্পর্ক কর্মশালার শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার চাহিদা অনুযায়ী, সেগুলির কাজকর্মের ব্যবস্থাপনায়, ইত্যাদি।

উৎপাদন-সম্পর্ক হল বৈষয়িক মূল্যের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত মানুষে-মানুষে এক অর্থনৈতিক সম্পর্ক-প্রণালী। উৎপাদন-সম্পর্ক শোষণমুক্ত মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পারিক সহায়তার সম্পর্ক হতে পারে, যেমন হয় সমাজতন্ত্রে; সে সম্পর্ক আধিপত্য করা ও অধীনে রাখার সম্পর্ক হতে পারে, যেমন হয় ক্রীতদাসপ্রথায়,

সামন্ততন্ত্রে ও পুঁজিবাদে; কিংবা তা না হলে, সে সম্পর্ক হতে পারে উৎপাদন-সম্পর্কের এক রূপ থেকে আরেক রূপে উত্তরণের সম্পর্ক। উৎপাদন-সম্পর্কের চরিত্র কী দিয়ে নির্ধারিত হয়?

উৎপাদন-সম্পর্কপ্রণালীতে নিয়ামক ভূমিকা হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে **মালিকানার রূপের।** বুর্জোয়া গবেষকরা সচরাচর সম্পত্তি-সম্পর্ককে পর্যবসিত করেন বস্তুনিচয়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে। কিন্তু সেটা খুবই অগভীর দৃষ্টিভঙ্গি, কেননা কোনো একজন ব্যক্তি যখন একটি জিনিসের বা বহু জিনিসের একটি সমষ্টির (যেমন একটা কারখানা) মালিক হয়, সে অবশ্যম্ভাবীরূপেই অন্যান্য লোকের (যেমন কারখানার শ্রমিকরা) সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। বস্তুনিচয়ের সঙ্গে ও বস্তুনিচয়ের মধ্যে সম্পর্কের পিছনে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র বৈষয়িক মূল্যে উৎপাদনে মানুষে-মানুষে সম্পর্ককে সনাক্ত করে, এই সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে নিয়ামক ভূমিকা থাকে উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার সম্পর্কের। সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্ক দেখায় উৎপাদনের উপায়ের মালিক কে এবং, ফলত, শ্রমের উৎপাদগুলি কে উপযোজন বা আত্মসাৎ করে: উৎপাদনের উপায়ের মালিক একক শ্রেণীগুলি, না সামগ্রিকভাবে সমাজ।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা সামাজিক উৎপাদের বণ্টন সংক্রান্ত সম্পর্কই শুধু নির্ধারণ করে না, বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর সামাজিক প্রতিষ্ঠাও নির্ধারণ করে। উৎপাদনের উপায় যেখানে

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, সেই পুঁজিবাদে শ্রমিকরা হল উৎপাদনের কোনো উপায় থেকে বঞ্চিত প্রলেতারীয়। তারা যে সমস্ত উৎপাদ উৎপন্ন করে, সেগুলির মালিক পুঁজিপতি। বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা মানুষের উপরে মানুষের শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের বিরোধীরা সর্বদাই অভিযোগ করেছেন যে তা সম্পত্তি-মালিকানাকেই প্রত্যাখ্যান করে। বাস্তবিকপক্ষে, প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক মতবাদ রূপে মার্কসবাদ সাধারণভাবে সম্পত্তি-মালিকানার বিরোধী নয়, বিরোধী তার ব্যক্তিগত-পুঁজিবাদী রূপের, যা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ে অচল হয়ে যায় এবং সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানার দ্বারা স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হয়।

সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে শ্রমজীবী জনগণ সার্বজনিকভাবে উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয় এবং সম্মিলিতভাবে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। সেই জন্যই এ রকম এক সমাজে শ্রমের উৎপাদগুলি তাদের, শুধু তাদেরই সম্পত্তি। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা তাদের ঐক্যবদ্ধ করে, তাদের অভিন্ন স্বার্থ প্রদান করে এবং শোষণমুক্ত জনগণের মধ্যে সাথীসুলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্কের জন্ম দেয়। এটা হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং সমাজতন্ত্রে জনগণের মধ্যে অন্য সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

অতএব, **সম্পত্তি-মালিকানা হল** লোকের দ্বারা

বৈষয়িক মূল্য (সর্বোপরি উৎপাদনের উপায়) উপযোজনের ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক রূপ। তা উৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থাকে, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক চরিত্রকে নির্ধারণ করে।

সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্ক সর্বদাই যুক্ত থাকে বস্তুসমূহের সঙ্গে, অর্থাৎ শ্রমের সাধিত্র ও শ্রম-প্রয়োগের বস্তুর সঙ্গে, এবং শ্রমের উৎপাদ, বা ফলগুলির সঙ্গেও। সেই সঙ্গে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা যখন সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্ককে একটা 'সামাজিক চুক্তি', 'দৈব অধিকার' বা যার দ্বারা তাঁরা বোঝান বুর্জোয়া সমাজের বিধান, সেই 'চিরন্তন প্রাকৃতিক বিধান'-ভিত্তিক বস্তুসমূহের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বলে গণ্য করেন, তখন তাঁরা ভুল করেন। সম্পত্তি-মালিকানা একটা ঐতিহাসিক ধারণা, তা কোনো না কোনো শ্রেণীর মৌলস্বার্থকে প্রভাবিত করে।

শ্রম বিভাজন

শ্রম-প্রক্রিয়ায় লোকে বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ছড়ানো থাকে। শ্রম বিভাজনের দুটি প্রধান ধরন থাকে: সমাজের অভ্যন্তরে (সামাজিক শ্রম বিভাজন) এবং উদ্যোগের অভ্যন্তরে (একক শ্রম বিভাজন)। প্রথমটির মধ্যে আছে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে (যেমন শিল্প ও কৃষি), তার শাখা ও উপ-শাখাগুলির মধ্যে (যেমন খনিকর্ম ও ম্যানুফ্যাকচারিং কিংবা ফসল ফলানো ও গবাদি পশু

পালন) শ্রম বিভাজন। একটি উদ্যোগের অভ্যন্তরে শ্রম বিভাজনের মধ্যে আছে শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকুশলীদের শ্রম-ক্রিয়াগুলির বিভাজন।

সামাজিক শ্রম বিভাজনের মাত্রা উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তরের একটি বড় সূচক। মানবসমাজের প্রারম্ভিক পর্যায়গুলিতে, উৎপাদিকা শক্তিগুলি যখন অত্যন্ত নিচু স্তরে ছিল সেই সময়ে, শ্রম বিভাজন আত্মপ্রকাশ করেছিল তার সরলতম রূপে: বয়স ও স্ত্রী-পুরুষভেদ অনুযায়ী প্রাকৃতিক শ্রম বিভাজন। পরে, তিনটি বড় ধরনের শ্রম বিভাজন হয় (ফসল তোলা থেকে গবাদি-পশু প্রজননের কাজের পৃথগ্ভবন, কৃষি থেকে হস্তশিল্পের ও সাধারণভাবে উৎপাদন থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পৃথগ্ভবন), এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ, শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার উদ্ভব ও বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাজনের পক্ষে তা অনেকখানি অবদান রেখেছিল।

আমাদের কালে বিপুল-পরিসর যন্ত্র উৎপাদনের অবস্থায় সামাজিক শ্রম বিভাজন শত শত শিল্প শাখা জুড়ে বিস্তৃত এক জটিল ও শাখায়িত ব্যবস্থা। শুধু গত কয়েক দশকেই, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লব এই ধরনের সব স্বাধীন শিল্প শাখার উদ্ভব ঘটিয়েছে, যেমন -- রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্যাস-শিল্প, যন্ত্রপাতি তৈরি, পারমাণবিক শক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং, সাংশ্লেষিক রসায়ন, সেমি-কণ্ডাক্ট উৎপাদক শিল্প, অটোমেশনের যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক যন্ত্রকৌশল, ইত্যাদি।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তরের বৈশিষ্ট্য-পরিচায়ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক শ্রম বিভাজন সমাজব্যবস্থার প্রকৃতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং যে সামাজিক সম্পর্কের অধীনে শ্রম অনুষ্ঠিত হয় তার একটি সূচক। পুঁজিবাদে সামাজিক শ্রম বিভাজন বিকশিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অসমভাবে বিকাশমান ক্ষেত্র ও শিল্পগুলির মধ্যে নিয়ত অসামঞ্জস্য থাকে, যার ফলে শ্রম ও সম্পদের অপচয় হয়। শ্রম বিভাজন গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-প্রক্রিয়া আরও বেশি সামাজিক হতে থাকে, আর শ্রমের ফলগুলির উপযোজন ব্যক্তিগত-পুঁজিবাদী থেকে যায়। সেটা আরও জটিল করে তোলে পুঁজিবাদের সমস্ত দ্বন্দ্বকে, মুখ্যত তার মূল দ্বন্দ্বকে: উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর তার ফলগুলির উপযোজনের ব্যক্তিগত-পুঁজিবাদী রূপের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে। সমাজতন্ত্রে সামাজিক শ্রম বিভাজন কার্যকর হয় সুষমভাবে, সমগ্র সমাজ ও তার সকল সদস্যের স্বার্থে। সমাজতন্ত্র যখন প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের গণ্ডী পেরিয়ে বিস্তৃত হয়েছিল, এবং এক বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল, তখন দেখা দিয়েছিল এক আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন, যা রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিহ্নিত করেছিল এক নতুন পর্যায়, সেই সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ সমানাধিকার, পারস্পরিক উপকার ও সাথীসুলভ পারস্পরিক সহায়তা।

মানবেতিহাস বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিরাট বিরাট বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছে, সেই বিপ্লবগুলির ফলে পৃথিবী ও তার নিয়মগুলি সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। চাকা ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বাতচক্র ও পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর হল মানব-প্রতিভার মহত্তম আবিষ্কারগুলির অন্যতম। উৎপাদনকর্মে প্রযুক্ত হয়ে এই আবিষ্কারগুলির প্রত্যেকটি — সেগুলির এক একটির মধ্যে কয়েক শতাব্দীর, এমন কি কয়েক সহস্রাব্দের ব্যবধান থাকতে পারে উৎপাদিকা শক্তিগুলির সামনের দিকে একটা বড় অগ্রগতি সূচিত করেছিল।

ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে বহু সামাজিক সংক্ষোভ আর বিপ্লবও, যেগুলি সমাজের প্রগতির পথ উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পুরনো দুনিয়ার বনিয়াদগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। বিপ্লবগুলিকে মার্কস অভিহিত করেছিলেন ইতিহাসের 'লোকোমোটিভ' বলে। পুরনো, অচল-সেকেলে ব্যবস্থাগুলির জোয়াল ছুঁড়ে ফেলতে মানবজাতিকে সাহায্য করে, বিপ্লবগুলি তার সামনে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে এবং সমাজবিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তি — শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে যেগুলি পরিবর্তন ঘটিয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সেই বিপ্লবগুলি আর সমাজবিপ্লবগুলি — এই দুয়ের

মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক উদ্ভূত হয় উৎপাদিকা শক্তির আর উৎপাদন-সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ মিথষ্ক্রিয়া থেকে, সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা থেকে।

মনে হতে পারে যে উৎপাদনের উপায়গুলি যার কাঠামোর মধ্যে বিকশিত হয় তা সামাজিক অবস্থা-নিরপেক্ষ। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি ধাতু-কাটার মেশিন-টুল সোভিয়েত ইউনিয়নে কাজ করে, আবার সোভিয়েত উইনিয়নে তৈরি ট্রাক বহু পুঁজিবাদী দেশে মালবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উৎপাদনের উপায় বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাতে একটা আবশ্যিক প্রভেদ আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মহাকাশ অনুসন্ধানের জন্য উদ্দিষ্ট শক্তিশালী প্রযুক্তিবিদ্যা শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে, বিজ্ঞান ও অর্থনীতির প্রয়োজনে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু মহাকাশ-যানগুলি ভীতিপ্রদর্শনমূলক অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে, মার্কিন শাসক চক্র তাদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের বাসনায় যেমন করতে চেষ্টা করছে।

উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে পরস্পরসংযোগটা আসে সামাজিক উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি থেকেই, নিম্নতর থেকে উচ্চতর রূপগুলিতে যার ক্রমাগত গতি ও বিকাশ ঘটে আভ্যন্তরিক কারণগুলির দরুন, বাহ্যিক কারণগুলির দরুন নয়। উৎপাদিকা শক্তিগুলি, মুখ্যত শ্রমের কারিগরি যন্ত্র ও খোদ মনুষ্যশ্রম হল সামাজিক উৎপাদনের সবচেয়ে

চলিষ্ণু ও বৈপ্লবিক উপাদান, এবং সেগুলির বিকাশ উৎপাদন-সম্পর্ককে নির্ধারিত করে। তাই, আদিম-সম্প্রদায়ধর্মী সম্পত্তি-মালিকানার ভিত্তিতে যে উৎপাদন-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল সেই যুগের আদিম হাতিয়ারগুলির সঙ্গে, যেগুলি দিয়ে মুখ্যত মাছ-ধরা আর শিকার করা হত। যে পুঁজিবাদ কৃষক ও হস্তশিল্পীদের তাদের উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত করার জন্য বলপ্রয়োগ করেছিল, এবং তাদের একত্রে জড়ো করেছিল কলে-কারখানায়, সেই পুঁজিবাদ ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়েছিল যন্ত্র আর বাষ্পীয় ইঞ্জিন সঙ্গে নিয়ে। উৎপাদনের উপায়ের উপরে একমাত্র সামাজিক মালিকানাই, সমাজতন্ত্রের সহজাত উৎপাদন-সম্পর্কই বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লবের অধিকতর অগ্রগতির পক্ষে বস্তুতই সহায়ক।

এ সব কথা বলার অর্থ অবশ্য এই নয় যে উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের এক অক্রিয় প্রতিফলনের চেয়ে বেশি কিছু নয়। বরং এর বিপরীত, এই উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলির উপরে, সেগুলির বৃদ্ধি, চরিত্র ও গতিমুখের উপরে এক প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে। সেই প্রভাব ইতিবাচকও হতে পারে, নেতিবাচকও হতে পারে, কেননা উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদনের বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, অথবা অগ্রসরমান উৎপাদনী শক্তিগুলির পথে প্রতিবন্ধক খাড়া করে তাতে বাধাও দিতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, উৎপাদিকা শক্তি আর উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত বাধে। উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলির

বিকাশের পিছনে পড়ে থাকতে পারে না এবং দীর্ঘকাল সেগুলির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকতে পারে না, কারণ সেরূপ অবস্থায় কোনো সামাজিক প্রগতি হতে পারে না। উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের চেয়ে যতই পিছিয়ে থাকুক না কেন, তাকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদিকা শক্তিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়। উৎপাদিকা শক্তিগুলির স্তর ও চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের সামঞ্জস্য একটা **সামূহিক অর্থনৈতিক নিয়ম,** গোটা মানবেতিহাস জুড়ে এই নিয়ম কাজ করে।

কিন্তু এক প্রস্ত উৎপাদন-সম্পর্ক দিয়ে আরেক প্রস্ত উৎপাদন-সম্পর্ককে প্রতিস্থাপিত করার জন্য একমাত্র উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশই যথেষ্ট নয়। পুরনো সমাজব্যবস্থা ও তার শাসক শ্রেণী নিজের ইচ্ছায় তাদের অবস্থানগুলি ত্যাগ করবে না। তাই, উৎপাদিকা শক্তিগুলির সমগ্র পূর্ববর্তী বিকাশের দ্বারা সৃষ্ট বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি ছাড়াও, অচল সেকেলে উৎপাদন-সম্পর্ককে প্রতিস্থাপিত করার জন্য দরকার হয় এক **সামাজিক শক্তি,** যা সেই প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম। বিপরীত সব শ্রেণী-সংবলিত শোষণভিত্তিক সমাজগুলিতে এক প্রস্ত উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিকল্প হিসেবে আরেক প্রস্ত উৎপাদন-সম্পর্ক স্থাপিত হয় সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। উৎপাদন-প্রক্রিয়া যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত, সেই ক্রীতদাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের চেয়ে পিছিয়ে থাকা উৎপাদন-সম্পর্ক তীব্র ও গভীর সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের জন্ম দেয়, এবং শ্রমজীবী জনগণ ও

শোষকদের মধ্যে এক প্রচন্ড শ্রেণী সংগ্রামের জন্ম দেয়।

মানুষের উপরে মানুষের শোষণভিত্তিক সমাজগুলি বিকশিত হয় দুটি রেখা ধরে: আরোহী ও অবরোহী। বিকাশের প্রারম্ভিক কালপর্বে, উৎপাদন-সম্পর্ক যখন উৎপাদিকা শক্তিগুলির চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, তখন সমাজ বিকশিত হয় এক আরোহী রেখা ধরে এবং পরে, যখন উৎপাদন-সম্পর্ক একটা প্রতিবন্ধকে পরিণত হয়ে উৎপাদিকা শক্তি ও সমাজপ্রগতির বিকাশে বাধা দেয়, তখন সমাজ অনুসরণ করে একটা অবরোহী রেখা, শেষ পর্যন্ত যার ফলে পুরনো সামাজিক সম্পর্কের ভাঙন ঘটে। এক সামাজবিপ্লব ঘটে, তা সমাজজীবনের সেকেলে রূপগুলিকে দূরীভূত করে এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির অধিকতর বিকাশের পথ খুলে দেয়।

কিন্তু, অতীতের সমস্ত বিপ্লবই মানুষের উপরে মানুষের শোষণকে বিলুপ্ত করে নি, শোষণের একটি রূপের জায়গায় প্রতিকল্প হিসেবে আরেকটি রূপকে স্থাপন করেছে মাত্র। ক্রীতদাস-পরিচালকদের চাবুক পরিত্যক্ত হয়েছিল শুধু সামন্ত প্রভুর চাবুক দিয়ে প্রতিস্থাপিত হওয়ার জন্য, সেই সামন্ত প্রভু তার জমি চাষ করাত ভূমিদাসদের দিয়ে। সামন্ত প্রভুর প্রতিকল্প হিসেবে এসেছিল 'আলোকপ্রাপ্ত' পুঁজিপতি, যে বলপ্রয়োগ করে মজুরি-শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করার আরও পরিশীলিত সব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল; জবরদস্তি কাজ না করলে তাদের ভাগ্যে ছিল বেকারি, অনাহার আর দারিদ্র্য।

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই মানুষের উপরে মানুষের শোষণের ভিত্তিটাকে উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা - ধ্বংস করে এবং উৎপাদনের উপায়ের উপরে কায়েম করে সামাজিক মালিকানা, তার দ্বারা সমাজের স্বার্থে ও তার প্রতিটি সদস্যের স্বার্থে উৎপাদিকা শক্তিগুলির নিঃসীম ও নিয়ত বিকাশের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তিগুলির বিকাশের সঙ্গে নিয়তই ত্রুটিহীন করা হচ্ছে এবং তা ক্রমে ক্রমে বিকাশলাভ করে পরিণত হয় যথার্থ কমিউনিস্ট উৎপাদন-সম্পর্কে, যা নিশ্চিত করবে শ্রেণীহীন এক সামাজিকভাবে সমধর্মী সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি, যে সমাজ তার পতাকায় উৎকীর্ণ করবে: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী'।

অর্থনৈতিক ভিত্তি ও অতিসৌধ

সমাজে উৎপাদন-সম্পর্ক থাকে একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার রূপে, যেটা বিকাশের প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে গঠন করে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বা তার **অর্থনৈতিক ভিত্তি**। সেই অর্থে, আমরা ক্রীতদাসমালিক সমাজ, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তির পার্থক্যনির্ণয় করি।

প্রতিটি সমাজব্যবস্থার নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকে, যেটা ছাড়া বৈষয়িক মূল্য উৎপন্ন করা যায় না

এবং সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলি বিকশিত হতে পারে না। সমস্ত উৎপাদন-সম্পর্কের একটা সাকল্য হিসেবে, অর্থনৈতিক ভিত্তিই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করে অন্য সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে, যেগুলি তার উপরে গড়ে ওঠে একটি অতিসৌধের রূপে। প্রত্যেক অর্থনৈতিক ভিত্তির থাকে নিজস্ব অতিসৌধ, যার অন্তর্ভুক্ত হল সমস্ত রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, নীতিবিদ্যাগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য অভিমত ও ভাব-ধারণা, এবং তদনুষঙ্গী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলি (রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, আইনগত, সাংস্কৃতিক, বিচারগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান)।

অর্থনৈতিক ভিত্তি-সঞ্জাত ও তার দ্বারা নির্ধারিত অতিসৌধটি তার স্বীয় অধিকারবলেই এক সক্রিয় শক্তি হয়ে ওঠে, যা ভিত্তিটিকে গঠিত ও শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। আমাদের কালে, অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে অতিসৌধের ভূমিকা বিশেষভাবেই প্রকট। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাজনৈতিক অতিসৌধ এক প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে, কারণ তা পুরনো, সেকেলে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ভিত্তিকে, শোষক শ্রেণীগুলিকে রক্ষা করে, অথচ ইতিহাস যেগুলির অনিবার্য অন্তিমকাল ঘোষণা করে দিয়েছে। এই দেশগুলিতে অতিসৌধ সমাজপ্রগতিকে মন্থরগতি করে তোলে এবং তা বিশ্বব্যাপী আধিপত্যকামী বৃহত্তম একচেটিয়া সংস্থাগুলির হাতে একটা হাতিয়ার। সোভিয়েত ইউনিয়নে ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে অতিসৌধ এক প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে,

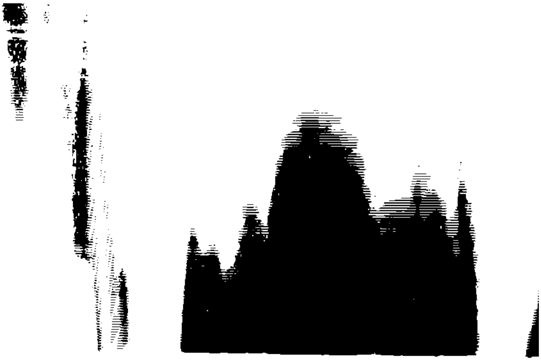

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে, জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরও উন্নত করতে ও তাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করতে সাহায্য করে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলি হল উৎপাদনের সবচেয়ে চলিষ্ণু ও বৈপ্লবিক উপাদান। উৎপাদিকা শক্তিগুলির গতি জনগণের মধ্যে উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে তদনুরূপ পরিবর্তন ঘটায়। ভিত্তিতে পরিবর্তনগুলি আবার তাদের দিক দিয়ে অতিসৌধে তদনুরূপে পরিবর্তন নিয়ে আসে। নির্দিষ্ট একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে আত্মপ্রকাশ করার পর অতিসৌধটি আবার তার দিক থেকে অর্থনৈতিক ভিত্তিটিকে শক্তিশালী করতে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে, এবং তাই উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের উপরে প্রতিদানমূলক প্রভাব বিস্তার করে সেই বিকাশকে মন্থরগতি করে অথবা ত্বরিত করে।

একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অর্থশাস্ত্র উৎপাদন-সম্পর্ককে অধ্যয়ন করে উৎপাদিকা শক্তি ও অতিসৌধের সঙ্গে তার জটিল মিথষ্ক্রিয়ায়। সেই মিথষ্ক্রিয়ার ব্যবস্থা-প্রণালীটি না বুঝলে উৎপাদন-সম্পর্কের আসল প্রকৃতি, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির আসল প্রকৃতি কখনোই বোঝা যাবে না। তাই, পুঁজিবাদের সহজাত উৎপাদিকা শক্তি আর উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার গভীর দ্বন্দ্বগুলি পরীক্ষা না করে, এবং অর্থনৈতিক বিকাশের উপরে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রভাববিস্তারের রূপ ও পদ্ধতিগুলি বিবেচনা না করে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যায় না।

উৎপাদন-প্রণালী ও শ্রেণীসমূহ

সমাজের বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের থাকে নিজস্ব উৎপাদিকা শক্তি ও তদনুষঙ্গী উৎপাদন-সম্পর্ক। ঐতিহাসিক বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে সামাজিক উৎপাদন **উৎপাদন-প্রণালী** বলে পরিচিত। এক বিশেষ উৎপাদন-প্রণালী কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়?

যে কোনো উৎপাদন-প্রণালীই **উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার** ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এই মালিকানাই তার সমস্ত প্রধান বিকাশের নিয়মকে নির্ধারণ করে। এ হল সম্পত্তি-মালিকানার সেই রূপ যা মানবিক উৎপাদন-সম্পর্ককে এক সুসংলগ্ন ব্যবস্থায় যুক্ত করে এবং উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের সংযোগের ধরনকে নির্ধারণ করে।

ইতিহাসে দেখা গেছে **পাঁচটি মূল উৎপাদন-প্রণালী,** সেগুলি অর্থশাস্ত্রের দ্বারা অধীত হয়: **আদিম-সম্প্রদায়ধর্মী, ক্রীতদাসভিত্তিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী** ও **কমিউনিস্ট**। সমাজপ্রগতির গতিধারায় এগুলি একের পর এক পরস্পরের স্থানগ্রহণ করেছে।

সাক্ষাৎ উৎপাদকের সঙ্গে উৎপাদনের উপায়ের সংযোগ ভিন্ন ভিন্নভাবে ঘটে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রণালীর অধীনে। বুর্জোয়া সমাজে, যেখানে ব্যক্তিগত-পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানাই সর্বেসর্বা, সেখানে উৎপাদকের সঙ্গে উৎপাদনের উপায় সংযুক্ত হয় এক বৈর, নিপীড়ক শক্তি হিসেবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন মজুরি-শ্রম শোষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং তার লক্ষ্য হল মুনাফা

আদায় করে নেওয়া। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার অধীনে, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে উৎপাদকের সংযোগের ধরন সারগতভাবে পৃথক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা নিশ্চিহ্ন করে সমাজতন্ত্র এরূপ এক সংযোগ কার্যকর করে এক নতুন ও উচ্চতর ভিত্তিতে, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে, যেখানে মানুষের উপরে মানুষের শোষণ বাতিল হয়ে যায়।

উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে উৎপাদকের সংযোগের ধরন সমাজের শ্রেণী গঠনবিন্যাসকে নির্ধারণ করে। **শ্রেণী** হল জনগণের বড় বড় গোষ্ঠী, যেগুলির পার্থক্য থাকে সামাজিক উৎপাদনে তাদের অধিকৃত স্থান, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সেগুলির সম্পর্ক, সামাজিক শ্রম সংগঠনে সেগুলির ভূমিকা, এবং ফলত, সামাজিক সম্পদের যে ভাগটা তারা পায় এবং যেভাবে তারা সেটা পায়, সেই সব দিক দিয়ে। বৈরমূলক সমাজগুলিতে, শোষক শ্রেণীগুলি হল সেইসব জনগোষ্ঠী যারা, উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা আর সামাজিক অর্থনীতিতে শ্রেণীগুলির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমের ফলগুলি উপযোজন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুঁজিবাদী সমাজে, উৎপাদনের উপায় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত, যার ফলে তারাই মজুরি-শ্রমিকদের শ্রমের ফলগুলি উপযোজন করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে শ্রমজীবী জনগণ উৎপাদনের উপায়ের সহ-মালিক এবং কাজ করে সমষ্টিগতভাবে, সেখানে অপরের শ্রম

উপযোজন করার, মানুষের উপরে মানুষের শোষণের কোনো স্থান নেই।

অতএব, বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব সামাজিক উৎপাদনের বিকাশে ঐতিহাসিক পর্যায়গুলির সঙ্গে যুক্ত। ক্রীতদাসভিত্তিক সমাজের প্রধান শ্রেণীগুলি ছিল ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসমালিক; সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান শ্রেণীগুলি ছিল ভূমিদাস ও সামন্ত প্রভু; বুর্জোয়া সমাজের প্রধান শ্রেণীগুলি হল মজুরি-শ্রমিক ও পুঁজিপতি; আর সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান শ্রেণীগুলি হল শ্রমিক শ্রেণী ও সমবায়ভুক্ত কৃষকসমাজ।

ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত উৎপাদন-প্রণালী ও তদনুষঙ্গী অতিসৌধই হল **সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ।** আদিম-সম্প্রদায়ধর্মী, ক্রীতদাসভিত্তিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট গঠনরূপগুলির মূলে নিহিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি বিশ্লেষণ করে অর্থশাস্ত্র নিম্নতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে সমাজের অগ্রগতির নিয়মশাসিত প্রক্রিয়াটিকে সনাক্ত করা সম্ভব করে তোলে।

অধ্যায় ৩

ভোগ ঘটতে পারার আগে

যে কোনো উৎপাদই উৎপন্ন হয় ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে। অন্যথায় শ্রম বিনিয়োগগুলি অকেজো ও অর্থহীন, সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে লুণ্ঠন করার সমতুল। ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলির ক্রিয়াকলাপ ঠিক এই ধরনেরই, তারা প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্রের এক প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, যা সমগ্র মানবজাতির জীবনকেই বিপন্ন করে। এই প্রতিযোগিতা হল পুঁজিবাদের জন্ম-দেওয়া এক বীভৎসতা, এবং তা কাণ্ডজ্ঞানের অতীত, অথচ উৎপাদনের স্বাভাবিক চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানুষের প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু সৃষ্ট উৎপাদটি সেই চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছবার আগে, সেটি বণ্টিত ও বিনিময় হতে হবে। মানবসমাজের আদিতম পর্যায়গুলিতে, উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ও সামাজিক শ্রম বিভাজন গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাদের শ্রমের উৎপাদগুলি বিনিময় করতে শুরু

করেছিল। সমষ্টিগত শ্রমের উৎপাদগুলি বণ্টন করাও দরকার হয়েছিল: প্রথমে সমানভাবে, যেমন একটি আদিম কমিউন বা উপজাতির কাঠামোর ভিতরে, তারপরে মোটেই সমানভাবে নয়, যে উৎপাদন-প্রণালীর অধীনে সেই বণ্টন ঘটেছিল তার নিয়ম অনুযায়ী। উৎপাদটি তখন উপযোজন করত তারাই যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক ছিল এবং অপর লোকের শ্রম শোষণ করত। এই রকমই ছিল ক্রীতদাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদে। একমাত্র সমাজতন্ত্রেই উৎপাদটি বণ্টিত হতে শুরু হল সামাজিক উৎপাদনে প্রত্যেক ব্যক্তির অবদান অনুসারে: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী'।

উৎপাদন ও ভোগ

বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনই সমাজের জীবনের উৎস। তা হতে হয় নিরন্তর, অর্থাৎ নিয়ত তা পুনর্নবায়িত হতে হয়। তা এমন কি কয়েকটি মাত্র দিনের জন্যও থেমে থাকতে পারে না, কেননা লোকে খাদ্য, বস্ত্র, জুতো, আবাসন, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য মূল্য উৎপাদন বন্ধ করতে পারে না, ঠিক যেমন সেগুলি ব্যবহার করাও লোকে বন্ধ করতে পারে না।

একটি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া হিসেবে না দেখে বরং নিয়ত পুনঃঘটমান ও পুনর্নবায়নের অবস্থায় বিবেচনা-করা বৈষয়িক উৎপাদন **পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া** হিসেবে পরিচিত। সাক্ষাৎ উৎপাদন ছাড়াও, সেই প্রক্রিয়ার

অন্তর্ভুক্ত হল বৈষয়িক মূল্যগুলির বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ, যেগুলি একটিমাত্র সমগ্রের নানা অংশ হিসেবে তার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত তার বিভিন্ন পর্ব। সামাজিক পুনরুৎপাদনের এই পর্বগুলিকে, সেগুলির পরস্পরসম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়ায় একটুখানি দেখা যাক।

উৎপাদন ও ভোগ হল যথাক্রমে পুনরুৎপাদনের প্রারম্ভিক ও চূড়ান্ত পর্ব। জানা আছে যে উৎপাদন একটা নির্দিষ্ট উৎপাদ উৎপন্ন করে, যেটি ভোগের জন্য উদ্দিষ্ট। ভোগ হতে পারে দুই ধরনের: উৎপাদনশীল ও ব্যক্তিগত। উৎপাদনশীল ভোগ বলতে বোঝায় এই যে পুরো-তৈরি উৎপাদটি অন্যান্য উৎপাদ উৎপন্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ একটি নতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সেটি ব্যবহৃত হয়ে যায়। তাই উৎপাদনশীল ভোগ নিজেই হল উৎপাদন-প্রক্রিয়া। ব্যক্তিগত ভোগ বলতে বোঝায় এই যে পুরো-তৈরি উৎপাদটি লোকের ব্যক্তিগত চাহিদা মেটাতে কাজে লাগে, অর্থাৎ লোকেদের নিজেদের দ্বারাই সেটি ব্যবহৃত হয়ে যায়, এবং সেটাই হয় যথার্থ ভোগ।

উৎপাদন ও ভোগ ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরসম্পর্কিত, কিন্তু সেই পরস্পরসম্পর্কে নিয়ামক ভূমিকা হল উৎপাদনের, যা ভোগের প্রারম্ভিক বিন্দু, আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। উৎপাদনই সৃষ্টি করে উৎপাদনশীল ও ব্যক্তিগত ভোগের সামগ্রীগুলি। ভোগের পরিমাণ ও কাঠামোকে তা নির্ধারণ করে, কেননা যা প্রথমে উৎপন্ন হয়েছে শুধু সেটাই ভোগ করা সম্ভব। উৎপাদন

উৎপাদগুলির নতুন চাহিদারও জন্ম দেয়, ভোগকে, বলা যেতে পারে, একটা প্রেরণা সঞ্চারিত করে এবং খোদ ভোগেরই ধরন নির্ধারণ করে। যেমন, কয়লা আর তেল গোড়ায় নিষ্কাশিত হয়েছিল একমাত্র জ্বালানি হিসেবে, কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি শিল্পে ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত নানা ধরনের রাসায়নিক সামগ্রী উৎপাদনের প্রারম্ভিক কাঁচামাল হয়ে উঠেছে। মোটরগাড়ির আবির্ভাব ও সেগুলি উৎপাদনের উন্নয়ন জন্ম দিয়েছে বহুবিধ উৎপাদ, বড় সড়ক, মেরামতি কৃত্যক, প্রভৃতির প্রয়োজনের। আবার, তার দিক দিয়ে, ভোগ হল উৎপাদনের স্বাভাবিক চূড়ান্ত লক্ষ্য, তার সমাপ্তি। একটি উৎপাদের ভোগ একটি নতুন চাহিদার জন্ম দেয়, এইভাবে উৎপাদনের বৃদ্ধি ও ত্রুটিহীনতাকে উদ্দীপিত করে। পুনরুৎপাদনের দুই মেরুপ্রান্তিক পর্বের ঘনিষ্ঠ পরস্পরসম্পর্ক লক্ষ করে মার্কস লিখেছেন: 'উৎপাদন ছাড়া উপভোগ হয় না, কিন্তু উপভোগ ছাড়াও উৎপাদন হয় না, কারণ সেক্ষেত্রে উৎপাদন হবে অযথা।'*

তবে, উৎপাদন ও ভোগের ঘনিষ্ঠ পরস্পরসম্পর্কের অর্থ এই নয় যে সেগুলির মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এ কথা সুবিদিত যে পুঁজিবাদী সমাজে, যেখানে দারিদ্র্য শ্রমজীবী জনসাধারণের ভোগকে সীমিত করে, সেখানে উৎপন্ন সামগ্রীগুলি বিপণন করা অসম্ভব হয়ে

---

* Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, p. 196.

ওঠার দরুন পুনরুৎপাদনের ধারায় পর্যায়ক্রমিক ছেদ পড়ে, এবং সমাজ গিয়ে পড়ে অতি-উৎপাদনের সংকটে। সেখানে উৎপাদন ও ভোগের পরস্পরসম্পর্ক ও পরস্পরনির্ভরশীলতা স্বতঃস্ফূর্ত, তা কাজ করে এক অন্ধ ও ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসেবে, যা শ্রমজীবী জনগণের উপরে প্রচুর দুঃখদুর্দশা ও কষ্টভোগ চাপিয়ে দেয়।

সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ও ভোগের পরস্পরসম্পর্ক একেবারে আলাদাভাবে প্রকাশ পায়। শ্রমজীবী জনগণের নিয়ত বর্ধিষ্ণু বৈষয়িক মান ও ক্রয়ক্ষমতা উৎপাদনের বিকাশকে উদ্দীপিত করে এবং অতি-উৎপাদনের সংকট, বেকারি ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সমাজের নিরাপত্তার নিশ্চিতি দেয়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে সমাজতন্ত্রে উৎপাদন আর ভোগের মধ্যে আদৌ কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এগুলি যখন ধরা পড়ে, তখন এই সমস্ত দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য এবং উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমানুপাতিকতা আনার জন্য সমাজ পরিকল্পিত ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা কার্যকর করতে সক্ষম হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্য হল জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পূর্ণতর পূরণ নিশ্চিত করা।

উৎপাদ বণ্টন

ভোগের মধ্যে যাওয়ার আগে, উৎপাদগুলি প্রথমে বণ্টিত হতে হয়। **বণ্টন** হল উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে এক অন্তর্বর্তী গ্রন্থি এবং দুটির সঙ্গেই তা বাঁধা।

উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্কের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকাটা হল উৎপাদনের, শুধু এই কারণেই নয় যে ইতিমধ্যে যে সমস্ত উৎপাদ উৎপন্ন হয়েছে সেগুলিই বণ্টন করা সম্ভব, বরং এই কারণেও যে বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সেগুলির বণ্টনের রূপ ও চরিত্র পুরোপুরি নির্ভর করে উৎপাদন কালে লোকের মধ্যেকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপরে, মুখ্যত উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার রূপটির উপরে।

উৎপাদনের উপায় যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে, সেই পুঁজিবাদে ফলস্বরূপ উৎপাদটিও তারই এবং সেটি বণ্টিত হয় পুঁজিপতির জন্য অধিকতর মুনাফা নিশ্চিত করা আর শ্রমিকদের মজুরি ন্যূনতম মাত্রায় কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে আপোসহীন বৈরভাব, সম্পদ ও দারিদ্র্যের মধ্যে তীব্র বৈপরীত্য — বুর্জোয়াসমাজ এই দিয়েই চিহ্নিত। সেখানে শ্রমজীবী জনগণ নিয়ত এক কঠিন সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হয় মজুরি-দাসত্বের বিরুদ্ধে, নিজেদের জীবনের অধিকারের জন্য। স্ত্রী-পুরুষভেদ, বয়স, বর্ণ ও জাতিসত্তার জন্য যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার, তাদের অবস্থা বিশেষভাবেই শোচনীয়।

উৎপাদনের উপায় যেখানে সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে থাকে, সেই সমাজতন্ত্রে পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। সেখানে কোনো পুঁজিপতি নেই বলে লোকে কাজ করে নিজেদের জন্য ও সমাজের জন্য। সেখানে

ভোগের সামগ্রীগুলি বণ্টিত হয় সামাজিক উৎপাদনে তাদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী, এবং জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়ে চলে।

তাই, বণ্টন উৎপাদন-নিরপেক্ষ নয়, যেটা কিছু কিছু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ দাবি করে থাকেন; তাঁরা মনে করেন যে ন্যায্যতর বণ্টন পুঁজিবাদের সমস্ত রোগ ও ক্ষত নিরাময় করতে পারে। পুঁজিবাদে ন্যায্যতর বণ্টন প্রবর্তন করা অসম্ভব, কারণ উৎপাদনের ধরন না বদলিয়ে বণ্টনের ধরন বদলানো যায় না।

উৎপাদনের উপরে বণ্টন যেমন নির্ভরশীল, তেমনি আবার বণ্টনেরও উৎপাদনের উপরে একটা প্রতিদানমূলক প্রভাব থাকে। বিভিন্ন শিল্প শাখা ও বৃত্তির মধ্যে উৎপাদনের উপায় ও কর্মীর বণ্টন খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়ারই একটি অংশ এবং তা উৎপাদনের অনুপাত ও ক্ষেত্রগত কাঠামোগুলিকে, সামাজিক শ্রম বিভাজনকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে, সমাজের সদস্যদের মধ্যে শ্রমের উৎপাদগুলির বণ্টন কাজের প্রতি তাদের মনোভাবকে, তাদের কাজের ফলাফলে তাদের বৈষয়িক স্বার্থকে প্রভাবিত করে, এবং তাই তা উৎপাদনের বিকাশকে ত্বরান্বিত অথবা মন্থরগতি করে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশসাধনে কাজ করার বৈষয়িক প্রণোদনার সক্রিয় উদ্দীপক ভূমিকায়, এবং কাজ অনুযায়ী বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতির সুসংগত রূপায়ণে তার ভালো উদাহরণ পাওয়া যায়।

বিনিময় হল এক দিকে, উৎপাদন ও তার দ্বারা নির্ধারিত বণ্টন, এবং অন্য দিকে, ভোগ — এই দুইয়ের মধ্যেকার যোগসূত্র। তা মুখ্যত প্রকাশ পায় একটিমাত্র উদ্যোগের কর্মীদের মধ্যে ক্রিয়াকলাপের এক বিনিময়ের রূপে। উদ্যোগটির অভ্যন্তরে, বিভিন্ন বৃত্তির শ্রমিকদের মধ্যে এবং শ্রমিক, ফোরম্যান, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্য কর্মীদের মধ্যেও একটা নির্দিষ্ট শ্রম বিভাজন থাকে। তারা সবাই একই উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে, যে প্রক্রিয়া চলাকালে পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মধ্য দিয়ে তারা নানা সুনির্দিষ্ট ধরনের কার্যকলাপ বিনিময় করে।

বিভিন্ন উদ্যোগ, শিল্প শাখা ও দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির মধ্যে বিনিময় ঘটে অন্যান্য অর্থনৈতিক রূপে। সামাজিক শ্রম বিভাজনের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের বিশেষীকৃত উদ্যোগগুলি পরস্পরকে শ্রমের সাধিত্র, কাঁচামাল ও অন্যান্য উৎপাদ সরবরাহ করে। একটি উদ্যোগে আরব্ধ একটি উৎপাদের উৎপাদন চালানো হয় ও সম্পূর্ণ হয় আরেকটি উদ্যোগে।

বিনিময়ের অর্থনৈতিক রূপ উৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থা দিয়ে, মুখ্যত উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানা দিয়ে নির্ধারিত হয়। বিনিময় পরিকল্পিত হতে পারে, স্বতঃস্ফূর্তও হতে পারে। তা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক প্রত্যক্ষ উৎপাদ বিনিময়ের রূপ গ্রহণ করতে পারে, অর্থাৎ, আদিম কমিউনে যেমন হত তেমনি

সমাজের কিছু সদস্যের দ্বারা উৎপন্ন উৎপাদগুলির সমাজের অন্য সদস্যদের হাতে হস্তান্তরের রূপ গ্রহণ করতে পারে। তা পণ্য বিনিময়ের রূপও গ্রহণ করতে পারে, যেটা কাজকর্মের বিনিময়ের ঐতিহাসিক রূপগুলির একটি মাত্র।

কাজকর্ম বিনিময়ের পণ্য রূপটি একটি ক্ষণস্থায়ী, ঐতিহাসিক ব্যাপার। পণ্যসামগ্রী বিনিময় প্রথম দেখা দিয়েছিল ৫,০০০ থেকে ৭,০০০ খ্রীঃ পূঃ-তে, এবং তা তার বিকাশের চূড়ায় পৌঁছেছে পুঁজিবাদে, যেখানে খোদ মানুষের শ্রমশক্তি, তথা উৎপাদনের উপায় ও ব্যক্তিগত ভোগের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। পণ্যের বিনিময়, বিপণন, সঞ্চলন পুঁজিবাদী সমাজে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে বেষ্টন করে। পণ্য উৎপাদন হয়ে উঠেছে সার্বিক এবং বিনিময়কে ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি আর ফাটকাবাজদের মুনাফা করার জন্য। সমাজতন্ত্রে শ্রমশক্তি একটি পণ্য নয়। পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রটি এখানে সীমিত, বাণিজ্যকে লাগানো হয়েছে জনগণের সেবায়, তা কাজ অনুযায়ী ভোগ্যপণ্য বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতি কার্যকর করতে, এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে।

সমাজের বিকাশের এক নির্দিষ্ট স্তরে, যখন উৎপাদিকা শক্তিগুলির এতদূর বৃদ্ধি ঘটবে যেখানে সেগুলি বৈষয়িক মূল্যের প্রাচুর্য নিশ্চিত করতে পারবে, যখন অতি সুসংগঠিত এক বণ্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, নতুন মানুষ গড়ে উঠবে এবং অন্যান্য

পূর্বশর্ত গঠিত হবে, তখন পণ্য বিনিময়ের আর প্রয়োজন থাকবে না।

উৎপাদন বস্তুটি, বিনিময়ের জিনিসটি, যোগায় বলে উৎপাদসমূহের বিনিময়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করলেও, বস্তুটিও উৎপাদনের উপরে এক জোরালো প্রতিদানমূলক প্রভাব বিস্তার করে। বাজারের সম্প্রসারণ বা সংকোচন উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে উদ্দীপিত অথবা সীমিত করে। উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের উপরে জোর দিয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন যে 'সেগুলি নিয়ত পরস্পরকে নির্ধারণ ও প্রভাবিত করে এতদূর পরিমাণে যে সেগুলিকে অভিহিত করা যেতে পারে অর্থনৈতিক বক্ররেখার ভুজ ও কোটি বলে'।*

পুনরুৎপাদন পর্বগুলির ঐক্য

বৈষয়িক মূল্যসমূহের উৎপাদন, সেগুলির বণ্টন, বিনিময় ও ভোগকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা গণ্য করেন পৃথক, স্বতন্ত্র পর্ব বলে, যেগুলি পুনরুৎপাদনের একটি পর্ব থেকে আরেকটি পর্বে, উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোগে গিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত উৎপাদটির একের পর এক গতির প্রেক্ষিতে শুধু বাহ্যিকভাবেই সম্পর্কিত। ভোগকে তাঁরা দেখেন

---

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 177.

উৎপাদন-ক্ষেত্রে সৃষ্ট উৎপাদটির শুধু ব্যবহার হয়ে যাওয়া হিসেবে। তাঁরা মনে করেন, খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার গতি নির্ধারিত হয় চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে। সেই বিশ্বাসবলে তাঁরা দাবি করেন যে উৎপাদন ও ভোগকে অর্থশাস্ত্রের বিষয় বলে মনে করা যায় না, এবং অর্থশাস্ত্রের কারবার শুধু বণ্টন আর বিনিময় নিয়ে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের এরূপ দাবির একটা শ্রেণী অর্থ আছে। পুনরুৎপাদনের পর্বগুলিকে পৃথক করে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের আপোসহীন দ্বন্দ্বগুলিকে অস্পষ্ট করে দিতে চান এবং বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের এক অসত্য চিত্র উপস্থিত করতে চান, কিন্তু, আমরা আগেই দেখেছি, উৎপাদন-প্রণালীই যে কোনো সমাজব্যবস্থার মূলে নিহিত থাকে। বৈষয়িক মূল্যগুলির উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগে মানুষের মধ্যে যে সমস্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে সে সবই, সেগুলির ঐক্য ও ঘনিষ্ঠ পরস্পরসম্পর্কে, গঠন করে উৎপাদন-সম্পর্কের ব্যবস্থা এবং সে সবই অর্থশাস্ত্রের বিষয়।

অধ্যায় ৪

আকস্মিক ঘটনাক্রমে নয়

প্রকৃতি ও সমাজের একটি বিশেষ ক্ষেত্র অধ্যয়ন করে, এমন যে কোনো বিজ্ঞানেরই লক্ষ্য হল সেগুলির গতির নিয়মগুলি সম্পর্কে একটা অবধারণা লাভ। প্রকৃতির নিয়মগুলির আবিষ্কার মানুষকে তাদের নিজেদের স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যোগায়। ভালো ফসল ফলাতে হলে জীববিদ্যার নিয়মগুলি জানা দরকার এবং চাষ-আবাদের অগ্রসর কৃৎকৌশল ব্যবহার করা দরকার। পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তাই অর্থনৈতিক নিয়মগুলি সম্পর্কে জ্ঞান উৎপাদিকা শক্তিগুলির ও উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশ নিশ্চিত করে, সমাজপ্রগতির সহায়ক মানুষের ব্যবহারিক কার্যকলাপের একটা ভিত্তি যোগায়।

প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে মানুষ প্রকৃতির নিয়মগুলি অবধারণ করতেই শুধু সক্ষম। বস্তুতপক্ষে, প্রকৃতি কঠোর নিয়মবদ্ধতায় চিহ্নিত, এবং নির্দিষ্ট অবস্থায় ফলগুলি সব সময়ে একই হবে। অন্য দিকে, সমাজের বিকাশ মানুষের ক্রিয়া দিয়ে তৈরি, সেই মানুষের প্রত্যেককে মনে হয় তার নিজের স্বার্থের দ্বারা চালিত। এ থেকে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সমস্ত সামাজিক ঘটনাই আপতিক ও যথেচ্ছ, আগে থেকে দূরদৃষ্টিতে কিছু দেখা যায় না।

কিন্তু এরকম একটা সিদ্ধান্ত খুবই ভ্রান্তিপূর্ণ। মানুষই ইতিহাস তৈরি করে বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও চালিকা শক্তি আবিষ্কার করা যায় না। আপাত আকস্মিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও ব্যাপারগুলিতে নির্দিষ্ট নিয়মবদ্ধতা নির্ণয় করা যায়।

মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের চালিকা শক্তি বুঝতে হলে, অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলির সারনির্যাস বোঝা দরকার। অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলির উপর-উপর বহিঃপ্রকাশ থেকে বিচার করতে শুরু করলে এরূপ বোধ লাভ করা যাবে না, কেননা সকলেই জানে যে একটি ঘটনা বর্ণনা করা আর তার সত্যিকার অর্থ বোঝা মোটেই এক জিনিস নয়। ভাসা-ভাসা একটা বর্ণনা সত্যের একটা আভাসের চেয়ে বেশি কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, কেননা প্রথম নজরে যেটা দেখা যায়,

সেটা প্রায়শই মোহজনিত ভ্রান্তি। এ কথা বিশেষভাবে সত্যি জটিল অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলি সম্পর্কে, সেগুলিকে সতর্ক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের অধীনে আনা দরকার। বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথটি অতি জটিল, তার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য ও অধ্যবসায় প্রয়োজন।

আগেকার সমস্ত অর্থনৈতিক মতবাদ থেকে এবং আজকের দিনের বুর্জোয়া অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি থেকে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র পৃথক এইখানে যে তা অর্থনৈতিক জীবনের অন্তঃসারের মধ্যে সত্যিকার বিজ্ঞানসম্মত অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক, এবং তা এর গতির বুনিয়াদি সমরূপতাগুলিকে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব করে তোলে। সমাজের বিকাশকে এখানে দেখা হয় বিষয়গত অর্থনৈতিক নিয়ম-শাসিত এক স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে। তাই, **অর্থনৈতিক নিয়মগুলি** কী এবং কীভাবে সেগুলি ক্রিয়া করে?

সমস্ত সামাজিক ব্যাপারই, একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তো দূরের কথা, পরস্পরসম্পর্কিত ও পরস্পরনির্ভরশীল, সামাজিক পুনরুৎপাদনের পর্ব হিসেবে উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের পরস্পরসম্পর্ক পরীক্ষা করতে গিয়ে যেটা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি। খোদ শ্রম-প্রক্রিয়ার এই সব সরলতম উপাদানকেও একটির থেকে অপরটিকে পৃথক করা উচিত নয়: শ্রম-প্রয়োগের বস্তু, শ্রমের সাধিত্র, এবং মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয়, অর্থাৎ শ্রম।

কিন্তু এই মিথস্ক্রিয়া প্রথম নজরে মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় না, বিশেষত মানবিক সম্পর্ক যখন

এক বস্তুগত বহিরাবরণ দিয়ে ঢাকা। দক্ষিণ আফ্রিকায় খনি থেকে সোনা তোলার কাজ আর, ধরুন, একজন ব্রিটিশ শ্রমিকের মজুরির মধ্যে, কিংবা একটি উদ্যোগে একটি কৃৎকৌশলগত নবোদ্ভাবনা আর একেবারে ভিন্ন ভিন্ন শাখার উদ্যোগগুলিতে তৈরি উৎপাদগুলির দামের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? মনে হয় কোনোই সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে, এবং প্রায়শই সে সম্পর্ক অতি সারগত।

অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলির অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার অর্থ সেগুলির একেবারে মর্মবস্তুতে গিয়ে পৌঁছনো, গভীরে-নিহিত কোন কোন ধরনের শক্তি অর্থনীতিকে চালিত করে তা প্রতিষ্ঠা করা। আর অর্থনৈতিক নিয়মগুলি তারই প্রতিফলন ঘটায়। উৎপাদন-সম্পর্কব্যবস্থার ভিতরে যে আভ্যন্তরিক বিষয়মুখ কারণগত সম্পর্ক ও পরস্পরসম্পর্কের এক নিয়ত অস্তিত্ব রয়েছে, সেগুলি তা প্রকাশ করে। অর্থনৈতিক নিয়মগুলি হল উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশের নিয়ম, এবং সেগুলি উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের নিয়ন্তা। উৎপাদন-সম্পর্কের সারমর্ম প্রকাশিত হয় অর্থনৈতিক নিয়মগুলির গোটা ব্যবস্থা-প্রণালী দিয়ে, সেগুলির সামগ্রিকতা দিয়ে। অর্থনৈতিক নিয়মগুলির আবিষ্কারই ইতিহাস সম্পর্কে বস্তুবাদী উপলব্ধিকে এক দৃঢ় বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপরে দাঁড় করিয়েছে।

অর্থনৈতিক নিয়মগুলির বিশদ ব্যাখ্যান কোনো এক বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপকে উৎপাদন-

সম্পর্কের এক সুসংলগ্ন ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করতে সক্ষম করে তোলে। অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলির অন্তঃসার প্রকাশ করার মধ্যে, এই নিয়মগুলি প্রকাশ করে সবচেয়ে স্থিতিশীল, পুনঃসংঘটনশীল ও অপরিহার্য সম্পর্কগুলিকে।

অন্তর্বস্তুর দিক থেকে অর্থনৈতিক নিয়মগুলি পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক ব্যাপারের চেয়ে বাস্তবের আরও যথাযথ ও গভীর একটা প্রতিচ্ছবি দেয়। যেমন, একটি পণ্যের দাম দামের সাধারণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো ধারণা দেয় না। একমাত্র দাম গঠনের নিয়মগুলি অধ্যয়ন করলেই সেই ব্যবস্থাটি বোঝা যেতে পারে, এই দাম গঠন নির্ভর করে বহু সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ের উপরে, যার মধ্যে আছে পণ্যসামগ্রী ও অর্থের গতি নিয়ন্তা নিয়মগুলির ক্রিয়া।

অর্থনৈতিক নিয়মগুলি, প্রকৃতির নিয়মগুলির মতোই, মানুষের ইচ্ছা ও চৈতন্য-নিরপেক্ষভাবে ক্রিয়া করে, অর্থাৎ, সেগুলি বিষয়মুখ। কিন্তু লোকে সেগুলি অবধারণা করতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের ক্রিয়াকলাপে। এ কথা সত্যি, মার্কসবাদের সমালোচকরা যুক্তি দেন যে আমাদের আয়ত্তের বাইরে ক্রিয়াশীল কোনো বিষয়মুখ নিয়ম যদি থাকেই, তবে সেগুলির বহিঃপ্রকাশের জন্য আমাদের স্রেফ অপেক্ষা করে থাকা উচিত। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আর সমাজবিকাশের নিয়মগুলির ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি সারগত পার্থক্য আছে।

বস্তুতই, বিজ্ঞান যদি প্রতিপাদন করে থাকে যে

সূর্য গ্রহণ একটা বিশেষ সময়ে ঘটবে, তা হলে একমাত্র করণীয় কাজ হল সূর্য ও চন্দ্রের গতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত করা, কিন্তু খোদ গ্রহণটাকে কেউ প্রত্যাহার করে নিতে পারে না। সমাজবিকাশের নিয়মগুলি ক্রিয়া করে একেবারে ভিন্নভাবে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে এক বৈপ্লবিক উত্তরণের ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা শুধু এটাই পূর্বানুমান করে নেয় না যে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি সৃষ্ট হতে হবে, বরং এও পূর্বানুমান করে যে সেই ঐতিহাসিক কীর্তি সম্পন্ন করতে সক্ষম এক বলশালী সামাজিক শক্তি সংগঠিত হতে হবে।

অর্থনৈতিক নিয়মগুলি উদ্ভূত হয় ও ক্রিয়া করে এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে। তাই পুঁজিবাদী সমাজ চিহ্নিত হয় বিষয়গতভাবে ক্রিয়াশীল প্রতিযোগিতা, উৎপাদনের নৈরাজ্য, পুঁজি সঞ্চয়ন ও শ্রমজীবী জনগণের ক্রমাবনত অবস্থার নিয়মগুলি দিয়ে, অবশ্যম্ভাবী অর্থনৈতিক সংকট, বেকারি ও ব্যাপক দারিদ্র্য দিয়ে। অর্থনীতিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সাহায্যে এই নিয়মগুলি রুদ্ধ করা বা কাটিয়ে ওঠা যায় না।

অর্থনৈতিক নিয়মগুলিকে মানুষ যথেচ্ছভাবে বলবৎ, সংশোধন বা বাতিল করতে পারে না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে এই নিয়মগুলিকে তারা কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না। অর্থনৈতিক নিয়মগুলি জন্মায় নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থায় এবং সেই অবস্থা লোপ পেলে সেই নিয়মগুলি মিলিয়ে যায়। অর্থনৈতিক

নিয়মগুলির অবধারণার পরে লোকে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্ক বদলানোর জন্য সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। তাদের বলিষ্ঠ উৎপাদনশীল ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক দেখা দেয় তার নতুন অর্থনৈতিক নিয়ম নিয়ে। ফলত, অর্থনৈতিক নিয়মগুলি চিরন্তন বা অমোঘ নয়, বরং, প্রকৃতির নিয়মগুলির বিপরীতে, ঐতিহাসিকভাবে ক্ষণস্থায়ী, সেগুলি যে সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্রিয়া করে সেগুলি যেমন ক্ষণস্থায়ী, ঠিক সেই রকমই। তাই, নতুন, সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক দিয়ে পুরনো বুর্জোয়া সম্পর্কের বৈপ্লবিক প্রতিস্থাপনের ফলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নিয়মগুলি আর ক্রিয়া করে না, সেখানে দেখা দিয়েছে নতুন অর্থনৈতিক নিয়ম, সমাজতন্ত্রের নিয়মগুলি। সুতরাং, সমাজের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক নিয়মগুলি আত্মপ্রকাশ করে ও পরিবর্তিত হয়। সমাজের বিকাশের সঙ্গে যা সম্পর্কিত নয়, সেই প্রকৃতির নিয়ম থেকে এখানেই তার প্রভেদ।

বিষয়মুখ অর্থনৈতিক নিয়মগুলিকে রাষ্ট্রের গৃহীত আইনগুলির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। আইন দেশের নাগরিকদের আচরণের রীতি স্থির করে দেয়: কোনটা আইনি আর কোনটা বেআইনি। রাষ্ট্র একটি আইন বদলাতে অথবা বাতিল করতে পারে, কিন্তু কোনো রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠা বা বাতিল করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পণ্যের দামের

গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কিন্তু তার মূলে যা রয়েছে সেটা কেউই কাটিয়ে উঠতে পারে না, তা হল: অর্থ ও পণ্যের বিষয়মুখ তুলনীয়তা। অর্থের নামিক মূল্য পরিবর্তন করা, নতুন ধরনের মুদ্রা বা ব্যাংকনোট চালু করা সম্ভব, কিন্তু খোদ অর্থকে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়।

প্রকৃতির নিয়মগুলির বৈপরীত্যে, অর্থনৈতিক নিয়মগুলি মানুষের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সব উৎপাদন-সম্পর্ককে প্রকাশ করে এবং সেই সমস্ত সম্পর্কের বাইরে ক্রিয়া করতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মগুলির আবিষ্কার ও ব্যবহারের বৈপরীত্যে অর্থনৈতিক নিয়মগুলির আবিষ্কার ও ব্যবহার জনগণের মৌল স্বার্থকে, মুখ্যত তাদের অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থকে প্রভাবিত করে।

মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের নিয়মাবদ্ধতাগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রকাশ করেছে এবং দেখিয়েছে যে পুঁজিবাদের পতন আর সমাজতন্ত্রের জয় ঐতিহাসিকভাবে অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসক শ্রেণী আর তাদের স্বার্থ প্রকাশকরা এমন একটা 'বিজ্ঞান' চায় যা তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং বিষয়মুখ অর্থনৈতিক নিয়মগুলিকে অস্বীকার করে সেগুলিকে মানুষের ইচ্ছা, বিচারবুদ্ধি ও মনস্তত্ত্বের ফল বলে গণ্য করবে, আর পক্ষান্তরে যাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আমাদের কালের সেই অগ্রবাহিনী, শ্রমিক শ্রেণী, অর্থনৈতিক নিয়মগুলির বিজ্ঞানসম্মত অবধারণা ও ব্যবহারে আগ্রহী।

প্রত্যেক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের আছে নিজস্ব **সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়ম,** যেগুলি কেবল তারই কাঠামোর ভিতরে ক্রিয়া করে, মুখ্যত তার **মূল অর্থনৈতিক নিয়ম,** যা সেই বিশেষ উৎপাদন-প্রণালীর সবচেয়ে সারবান গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যক্ত করে এবং যা তার গতির নিয়ম। অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়ম উৎপাদন-সম্পর্কের বিভিন্ন সারগত দিককে প্রকাশ করে, সেই নির্দিষ্ট গঠনরূপটির বিকাশে বিভিন্ন ব্যাপার ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। মূল অর্থনৈতিক নিয়ম নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রণালীর লক্ষ্য ও তা অর্জনের উপায়কে ব্যক্ত করে। তা অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়মের সঙ্গে যুক্ত ও সেগুলির সঙ্গে তার মিথষ্ক্রিয়া ঘটে, এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপটির ভিতরে ক্রিয়াশীল সমগ্র অর্থনৈতিক নিয়ম-প্রণালীতে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়মগুলির কোনোটিকেই মূল নিয়মের প্রেক্ষিতের বাইরে বোঝা যায় না, ঠিক যেমন খোদ মূল নিয়মটির ক্রিয়া অন্যান্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম থেকে বিচ্ছিন্ন রূপে অনুধাবন করা যায় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুঁজিবাদে আছে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়মগুলির গোটা একটা প্রণালী, যা পুঁজিবাদী শোষণের সম্পর্ক প্রকাশ করে। সর্বপ্রথমে রয়েছে পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম — উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিয়ম, যা প্রকাশ করে পুঁজির দ্বারা মজুরি-শ্রম

শোষণের সারমর্মকে, এবং এ ছাড়াও আছে প্রতিযোগিতা ও উৎপাদনের নৈরাজ্যের নিয়ম, পঁুজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম, ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে, সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়মটি প্রকাশ করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য ও তা অর্জনের উপায়কে: সামাজিক উৎপাদনের নিয়ত বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধনের মধ্য দিয়ে সমাজের সকল সদস্যের সামগ্রিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং অবাধ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করা। সমাজতন্ত্রের অন্যান্য নিয়মের মধ্যে আছে জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত ও সুষম বিকাশের নিয়ম, কাজ অনুযায়ী বণ্টনের নিয়ম, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়নের নিয়ম, এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের অভিব্যক্তিসূচক অন্যান্য অর্থনৈতিক নিয়ম।

কিন্তু সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়মগুলির পাশাপাশি থাকে সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়মগুলিও, যেগুলি ক্রিয়া করে প্রত্যেক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের মধ্যে। এগুলির মধ্যে আছে সেই নিয়মটি যেটি আমরা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করেছি, — উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তর ও চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের সামঞ্জস্যের সেই নিয়মটি, যা সমাজপ্রগতির বিষয়মুখ ভিত্তিটিকে দেখায়; শ্রমের ব্যয়সংকোচের নিয়ম, মানুষের বেড়ে-চলা প্রয়োজনের নিয়ম, ইত্যাদি। সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়মগুলি সমস্ত উৎপাদন-প্রণালীর সহজাত সম্পর্ক ও ব্যাপারগুলিকে প্রকাশ করে, এবং সেগুলির ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ও

ধারাবাহিকতা দেখায়, যদিও সাধারণ নিয়মগুলির ক্রিয়ার ক্ষেত্র ও রূপ প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপে লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে সেই গঠনরূপের উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট অবস্থার প্রভাবাধীনে।

সব শেষে, আছে এমন কতকগুলি অর্থনৈতিক নিয়ম যেগুলি ক্রিয়া করে একসারি গঠনরূপে, যেমন মূল্যের নিয়ম, যা পণ্য-অর্থ সম্পর্কবিশিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক।

অর্থশাস্ত্র সুনির্দিষ্ট ও সাধারণ উভয় প্রকার অর্থনৈতিক নিয়মই অধ্যয়ন করে এবং সেগুলির মিথষ্ক্রিয়া পরীক্ষা করে। এঙ্গেলস বলেছেন, 'তাকে অবশ্যই প্রথমে অনুসন্ধান করতে হবে উৎপাদন ও বিনিময়ের ক্রমবিকাশে প্রতিটি আলাদা-আলাদা পর্যায়ের বিশেষ নিয়মগুলি, এবং এই অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করার পরই কেবল তা সেই কয়েকটি রীতিমত সাধারণ নিয়ম প্রতিপাদন করতে সক্ষম হবে, যেগুলি উৎপাদন ও সাধারণভাবে বিনিময়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধ।'*

অর্থনৈতিক বর্গসমূহ

অর্থশাস্ত্র শুধু অর্থনৈতিক নিয়মগুলি নিয়েই বিবেচনা করে না, বহুবিস্তৃত **অর্থনৈতিক বর্গগুলি** নিয়েও বিবেচনা করে; এই বর্গগুলির প্রত্যেকটি উৎপাদন-সম্পর্কের একটি বিশেষ দিককে প্রকাশ করে।

---

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, p. 178.

এবং প্রতিযোগিতা আর নৈরাজ্যের জন্ম দেয়, সেই পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক নিয়মগুলি ক্রিয়া করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, একটা অন্ধ ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসেবে। সেগুলি ক্রিয়া করে নিয়ত ব্যাহতি আর অপূর্ণতার মধ্যে, একমাত্র প্রধান প্রবণতা হিসেবে, অসংখ্য ওঠা-পড়া আর বিচ্যুতির মধ্যগ হিসেবে। আর উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, লোকে অর্থনৈতিক নিয়মগুলি অধ্যয়ন ও ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে, এই নিয়মগুলির ক্রিয়ার চরিত্রের নীতিগত পরিবর্তন ঘটে। ঝড়ঝঞ্ঝার সময়ে একটা বজ্রপাতে বিদ্যুৎশক্তির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা আর একটি বৈদ্যুতিক বাতির নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎশক্তির মধ্যে, কিংবা একটা দাবানল আর ধাতুগলনে ব্যবহৃত আগুনের মধ্যে যে তফাৎ, এখানে পার্থক্যটা তারই মতো।

দ্বিতীয়ত, এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই যে সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মনীতির ভিত্তি হল বিষয়মুখ অর্থনৈতিক নিয়মগুলির বিজ্ঞানসম্মত অবধারণা ও ব্যবহার। অর্থনৈতিক বিকাশের উপরে রাজনৈতিক অতিসৌধের অভিঘাত তা বহুগুণ বাড়ায়। পুঁজিবাদে, অর্থনৈতিক নিয়মগুলিকেও কিছুটা পরিমাণে ব্যবহার করা যায়। যেমন, পুঁজিপতিরা যখন মজুরি-শ্রম শোষণ নিবিড় করা ও নিজেদের আয় বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন করে এবং উৎপাদনী ইঞ্জিনিয়ারিং উন্নত করে, তখন তারা ব্যবহার করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের

নিয়ম ও পংজিবাদের অন্যান্য অর্থনৈতিক নিয়মের ক্রিয়া। কিন্তু প্রতিযোগিতা, উৎপাদনের নৈরাজ্য বা অর্থনৈতিক সংকটগুলি দূরীকরণের জন্য সেগুলি কিছুই করতে পারে না। পংজিবাদী অর্থনীতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক নিয়মগুলির শিকার হয়েই থাকে, এবং তার আপোসহীন দ্বন্দ্বগুলি গভীর ও জটিল হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রের ক্ষমতার সঙ্গে একচেটিয়া সংস্থাগুলির ক্ষমতা যেখানে সম্মিলিত হয়, সেই রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পংজিবাদে, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বেড়েছে। সেই হস্তক্ষেপের প্রকৃতি ও সীমা আমরা পরে আরও বিশদে আলোচনা করব। এখন শুধু এইটুকু বলা যাক যে, উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা-হেতু ও সেই মালিকানার দ্বারা নির্ধারিত পংজিবাদের অর্থনৈতিক নিয়মগুলির প্রকৃতি-হেতু এই ধরনের হস্তক্ষেপ নিয়ামক গুরুত্ব অর্জন করে নি, করতেও পারে না। তা কার্যকর করা হয় মুষ্টিমেয় বৃহত্তম একচেটিয়া সংস্থাগুলির স্বার্থে, এবং কোনোক্রমেই তা পরিকল্পিত নয়।

তৃতীয়ত, পংজিবাদের বিপরীতে, সমাজতন্ত্রে এমন কোনো আপোসহীন বৈরমূলক দ্বন্দ্ব বা শ্রেণী নেই, যা অর্থনৈতিক নিয়মগুলির অবধারণা ও সচেতন ব্যবহারে বাধা দেয়। স্বভাবতই, সমাজতান্ত্রিক সমাজেও অসুবিধা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, কিন্তু সেগুলি সচেতনভাবে কাটিয়ে ওঠা হয়। সেই প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত একটি নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হল উৎপাদন-সম্পর্ক

আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার রূপ ও পদ্ধতিগুলি ত্রুটিহীন করার জন্য, জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক নিয়মগুলির সুষম প্রয়োগ।

সুতরাং, অর্থনৈতিক নিয়মগুলির বিষয়মুখ চরিত্র এটা বোঝায় না যে সেগুলি স্বতই ক্রিয়া করে। ব্যবহারিক মানবিক ক্রিয়াকলাপ চলাকালে এই নিয়মগুলি বাস্তবায়িত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা ও মানুষের উপরে মানুষের শোষণভিত্তিক সমাজগুলিতে মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অর্থনৈতিক ফলগুলি অর্জিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রে সমাজের সদস্যেরা কাজ করে পরিকল্পিতভাবে, আগে থেকে সূত্রায়িত লক্ষ্য অনুসারে। একমাত্র সমাজতন্ত্রেই অর্থনৈতিক নিয়মগুলি প্রণালীবদ্ধ ও সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয় সমাজ আর তার সদস্যদের স্বার্থে।

অধ্যায় ৫

অণুবীক্ষণ আর বিকারক ছাড়াই

অন্য যে কোনো বিজ্ঞানের মতোই, অর্থশাস্ত্রের অনুসন্ধেয় হল বহুবিধ ঘটনা ও ব্যাপার। অর্থনৈতিক জীবন, ছোট একটি গ্রামে হলেও, বহুবিচিত্র, তার সঙ্গে মিশে থাকে মানবিক মিথষ্ক্রিয়ার জটিল নকশা। গোটা এক একটা দেশের অর্থনীতি বা সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির কথা বলতে গেলে, এক নজরে তা অবশ্যই সমীক্ষা করা যায় না। সংখ্যাতীত তথ্যারাজির মধ্য থেকে বিজ্ঞান তুলে নেয় সবচেয়ে সারমূলক তথ্যটি, যেটি অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ম নির্ধারণ করে, তাই সঠিক তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত টানা সম্ভব করে তোলে। অর্থশাস্ত্রের হাতে গবেষণার পদ্ধতিগুলি কী? সেটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রস্থান-বিন্দুগুলি, গবেষণার সাধিত্রগুলি, এবং যে সমস্ত নীতির ভিত্তিতে তথ্যগুলি নির্বাচিত, প্রণালীবদ্ধ, প্রক্রিয়ণ ও বিশ্লেষণ করা হয় সেই নীতিগুলি

নির্ভর করে পদ্ধতিটার বাছাইয়ের উপরে। গবেষক যে ফলগুলি পায় তাও নির্ভর করে পদ্ধতির উপরে। একমাত্র সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করেই অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলিকে সেগুলির সামগ্রিকতায় ও পরস্পরসম্পর্কে বিবেচনা করা সম্ভব, এবং অর্থনৈতিক জীবন শুধু ব্যাখ্যা করাই নয়, সমাজপ্রগতির স্বার্থে তাকে পরিবর্তন করার উপায় নির্ণয় করাও সম্ভব।

অবধারণার সর্বজনীন পদ্ধতি

অর্থশাস্ত্রের অধীত সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপগুলির প্রত্যেকটিই এক জটিল ও পরস্পরাবিরোধী চিত্র উপস্থিত করে। কোনো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার না করে তার বিশুদ্ধ বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশগুলি বর্ণনা করার চেষ্টা করলে বহুবিধ ও নিঃসম্পর্কিত অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলির একটা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পিণ্ড পাওয়া যাবে। বাস্তবিকপক্ষে, এই ব্যাপারগুলির মধ্যে একটা নিয়ম-শাসিত আভ্যন্তরিক সম্পর্ক আছে।

সমাজে, প্রকৃতিতে যেমন ঠিক সেই রকমই, ব্যাপারসমূহের অন্তঃসার ও বাহ্যিক রূপটি প্রায়শই মেলে না, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের কথা ধরুন। প্রথম নজরে মনে হয় সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে, আর হাজার হাজার বছর ধরে লোকে সেটাই মনে করত। একমাত্র, ১৬শ শতাব্দীতেই, বিজ্ঞান যখন একটা নির্দিষ্ট স্তরে গিয়ে

পৌঁছেছিল, পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস সেই ব্যাপারটির সত্যকার চরিত্র আবিষ্কার করেছিলেন, মহাবিশ্ব সম্পর্কে পৃথিবী-কেন্দ্রিক ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণ করে পৃথিবীর এক বিজ্ঞানসম্মত সৌর-কেন্দ্রিক মততন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাহ্যিক চেহারার সঙ্গে তার অন্তঃসারেরও মিল ঘটে না। বহুবিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলির মূলে যেতে হলে, বাহ্যিক চেহারার তলায় সেগুলির আভ্যন্তরিক অন্তঃসার নির্ণয় করতে হলে এবং সেগুলির বিকাশের নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে হলে, গবেষণার একটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবশ্যই থাকা দরকার। গবেষণার একটা পদ্ধতি কী?

পদ্ধতি হল বাস্তবকে অধ্যয়ন করার দৃষ্টিভঙ্গি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক ব্যাপারসমূহের অবধারণার প্রণালী। তা হল বিজ্ঞানসম্মত চিন্তনের এক প্রস্থ নিয়ম, বিষয়গত পৃথিবীর সমরূপতাগুলি প্রতিফলিত করার উপায়।

ডায়ালেকটিকাল বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হল পৃথিবী বিষয়ক অবধারণার সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। তা বস্তুবাদী, কেননা পারিপার্শ্বিক পৃথিবীতে তা বস্তুর মুখ্য প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। তা দ্বান্দ্বিক, কেননা পৃথিবীতে বস্তুসমূহ ও ব্যাপারসমূহের সর্বজনীন পরস্পরসম্পর্ককে তা স্বীকার করে, এবং গতি ও বিকাশকে গণ্য করে বিপরীতের ঐক্য ও

অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো অর্থশাস্ত্রেও গবেষণার আগে সঞ্চিত হয় তথ্যরাজি। তথ্যরাজির এক সরল অবলোকন থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে অতি অগভীর ধারণা পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক অবধারণায় সেটাই হল প্রথম, অভিজ্ঞতাগত পর্যায়, যা এই সম্পর্ক সম্বন্ধে লোককে অতি ভাসা-ভাসা ধারণা দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দেখতে পাওয়া যাবে যে সামগ্রী ক্রীত ও বিক্রীত হয় অর্থের বিনিময়ে, একটি উৎপাদের দাম যত বেশি, সেটা কিনতে তত বেশি অর্থ লাগবে, ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহের অবধারণায় সেই প্রারম্ভিক, অভিজ্ঞতাগত পর্যায় থেকে পরবর্তী, আরও গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল পর্যায়ে উত্তরণের জন্য দরকার হয় অন্তত দুটি শর্ত: প্রথম, বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যগত জ্ঞান সঞ্চিত হতে হবে এবং, দ্বিতীয়, গবেষণার এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বিশদ করতে হবে। অর্থশাস্ত্রে, বৈজ্ঞানিক বিমূর্তনের পদ্ধতিটি হল তাই।

'বিমূর্তন' কথাটির আক্ষরিক অর্থ বিষয়নিরপেক্ষ বা পৃথক হওয়া। দৈনন্দিন জীবনে বিমূর্ত বলতে লোকে সাধারণত সেইটা বোঝায় যেটা বাস্তবের সঙ্গে সংস্পর্শরহিত, যার অস্তিত্ব শুধু চিন্তায়, কল্পনায়; আর মূর্ত বলতে বোঝায় তাকে, বাস্তবে যার অস্তিত্ব রয়েছে। বিমূর্ত ও মূর্ত সম্বন্ধে, এবং তাদের পরস্পরসম্পর্ক সম্বন্ধে এরূপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক বিমূর্তনের পদ্ধতিটা হল যা কিছু গৌণ ও অকিঞ্চিৎকর তা থেকে, অধীত অর্থনৈতিক সম্পর্ক

বোঝাকে যা দুরূহ করে তোলে তা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া। সেই প্রক্রিয়ায়, গবেষক অধীত অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির প্রধান, আবশ্যিকতম ও বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণগুলিকে আলাদা করে বেছে নেয়।

বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্তনের কাজটা এক বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের সমস্ত মূর্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিহার করা নয়, কিংবা 'সাধারণভাবে সমাজকে' পরীক্ষা করা নয় -- বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ আর সমাজতত্ত্ববিদদের যেটা করার ঝোঁক আছে। গবেষণার এরূপ এক 'পদ্ধতি' থেকে শুধু ফাঁকা কথা আর মামুলি বক্তব্য ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না, এবং তার ফলে দার্শনিক পন্ডিতি দেখা দিতে বাধ্য, তা থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সত্যকার কোনো জ্ঞান পাওয়া যাবে না।

বিমূর্তন বিজ্ঞানসম্মত হতে হলে, বাস্তবের সঙ্গে, প্রধান অন্তর্বস্তুর সঙ্গে সংস্পর্শ হারানো চলবে না। সেই জন্য, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের বৈরমূলক অন্তঃসারটিকে গণ্য না করে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যখন অর্থনৈতিক সম্পর্ক, পরিমেল, শিল্প, প্রভৃতির সমষ্টি-মডেল ও ব্যষ্টি-মডেল ফাঁদেন, তখন সেই বিমূর্তন মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহের বাহ্যিক চেহারা থেকে সেগুলির অন্তঃসারের দিকে, পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির অন্তরালের প্রক্রিয়াগুলির দিকে যেতে গিয়ে সত্যিকার বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্তন মূর্ত বাস্তব থেকে কোনোমতেই বিচ্যুত

হয় না, বরং তার সম্বন্ধে এক গভীরতর, পূর্ণতর ও ফলত আরও সত্য উপলব্ধি দেয়।

বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্তনগুলি কল্পনার উদ্ভাবন নয়, কেননা বিমূর্ততম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিরও উৎস রয়েছে বাস্তব জগতে, অর্থনৈতিক তথ্য ও ব্যাপারগুলিতে। বিজ্ঞান একটা গাছের মতো, যার শিকড়গুলি সর্বদাই পৃথিবীর মাটিতে, এমন কি যখন তার শীর্ষদেশ আকাশে অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠে যায়, তখনও। বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্তনগুলি হল প্রকৃত অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির চৈতন্যে এক প্রতিফলন। সেটাই সেগুলিকে করে তোলে বস্তুবাদী, এবং গবেষককে সক্ষম করে তোলে সরল উপলব্ধি থেকে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার পর্যায়ে উঠতে, উৎপাদন-সম্পর্ক সম্বন্ধে এক গভীরতর বোধ লাভ করতে এবং অর্থনৈতিক বর্গনিচয় ও নিয়মগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে।

সুতরাং, মূর্ত থেকে বিমূর্ততে আরোহণে কতকগুলি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত থাকে: প্রথম, সমগ্র তথ্যগত উপকরণপুঞ্জ থেকে গবেষক বেছে নেয় যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট লক্ষণসূচক, বাদ দেয় সেটাকে যা আপাতিক ও গৌণ, যা গবেষণায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে; দ্বিতীয়, সে বিভিন্ন তথ্য বা তথ্যগুচ্ছের মধ্যে পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্কগুলি উদ্ঘাটন করে; এবং তৃতীয়, সমগ্র পারস্পরিক সম্পর্ক-সমষ্টি থেকে সে বেছে নেয় আবশ্যিকতম, সবচেয়ে স্থিতিশীল ও পুনঃসংঘটনশীল কার্যকারণ সম্পর্কগুলি। স্পষ্টতই, তত্ত্বগত গবেষণার প্রক্রিয়াটি চলে ব্যাপারসমূহের

বাহ্যিক চেহারা থেকে সেগুলির আভ্যন্তরিক অন্তঃসারের দিকে, মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে।

কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে এ শুধু প্রারম্ভিক পর্যায়। বিমূর্তন একবার উৎপাদন-সম্পর্কের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদ্ঘাটিত করার পর, গতিটিকে বিপরীতগামী করে অন্তঃসার থেকে বাহ্যিক চেহারার দিকে যাওয়া যায়। সেই প্রক্রিয়ায়, গবেষক সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের যে মূর্ত ব্যাপারসমূহ থেকে নিজেকে বিমূর্ত করে নিয়েছিল, সেই ব্যাপারসমূহে প্রত্যাবর্তন করে, অর্থাৎ বিমূর্ত থেকে মূর্তেতে আরোহণ করে। সেটা গবেষণার প্রারম্ভিক বিন্দুতে নিছক এক সরল প্রত্যাবর্তন নয়। অর্থনৈতিক সম্পর্কের অন্তঃসার ইতিমধ্যেই উদ্ঘাটিত হয়েছে বলে, এখন সেই বাহ্যিক রূপটি (বহিরাবরণ) বর্ণনা করা সম্ভব হয়, যার মধ্যে এই সম্পর্ক আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক ব্যাপারসমূহের উপরিভাগে।

মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে ও বিমূর্ত থেকে মূর্তের দিকে অনুসন্ধানের সেই দ্বিবিধ গতির ফলে অধীত অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি উপস্থিত হয় সমস্ত পূর্ণতা ও বৈচিত্র্যে, সেগুলির অন্তঃসারের ঐক্যে এবং মূর্ত বাস্তবের মধ্যে সেগুলির বহিঃপ্রকাশের বৈচিত্র্যে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসূচক সেই দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গিকে মার্কস কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর অমর 'পুঁজি' গ্রন্থে পুঁজিবাদী উৎপাদন নিয়ে অনুসন্ধান করার কাজে। পুঁজিবাদী বাস্তব সম্বন্ধে তথ্যগত উপকরণের বিপুল সম্ভার বিশ্লেষণ

করার সময়ে মার্কস আরোহণ করেছিলেন মূর্ত থেকে বিমূর্তে, সমস্ত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্ক-প্রণালীর ভিতর থেকে বেছে নিয়েছিলেন সরলতম, সবচেয়ে প্রথাগত ও ব্যাপক সেই সম্পর্কটি যেটি অন্য সমস্ত ও আরও জটিল সম্পর্কের পূর্বগামী ছিল এবং যেটি সেই সম্পর্কগুলির এক প্রস্থান-বিন্দু ছিল: পণ্য বিনিময়। সেই সম্পর্কটিকে তিনি অভিহিত করেছেন বুর্জোয়া সমাজের সরলতম 'অর্থনৈতিক কোষ-রূপ' বলে।*

মার্কস সেই 'অর্থনৈতিক কোষ-রূপের' গভীরে অধ্যয়ন করে দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদের সমস্ত দ্বন্দ্ব তার মধ্যে রয়েছে ভ্রূণ রূপে। প্রথম নজরে যে পণ্যকে মানুষের কোনো চাহিদা মেটানোর জিনিস ছাড়া এবং অর্থ বা আরেকটি জিনিসের বদলে বিনিময়ে একটি জিনিস ছাড়া আর বেশি কিছু বলে মনে হয় না, সেই পণ্য সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মার্কস উৎপাদন ও পণ্য বিনিময়ের বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন অর্থের আবির্ভাব পর্যন্ত। সরল থেকে জটিলে আরোহণ করে তিনি যে অবস্থায় অর্থ পুঁজিতে পরিণত হয় সেই ঐতিহাসিক অবস্থাগুলি পরীক্ষা করেছেন, পুঁজিবাদী শোষণের সারমর্ম উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং সূত্রায়িত করেছেন পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম: উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিয়ম। শ্রমিক শ্রেণী আর বুর্জোয়া শ্রেণীর

* Ibid., p. 19.

মধ্যে আপোসহীন শ্রেণী বৈরগুলির বাস্তব ভিত্তি তিনি এইভাবেই প্রকাশ করেছেন। তিনি এ কথাও বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করেছেন যে পুঁজিবাদী বিকাশ এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈষয়িক ও বিষয়ীগত পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি করতে এবং পুঁজিবাদের পতনের দিকে যেতে বাধ্য।

'পুঁজি'-র তিনটি খণ্ডের প্রত্যেকটি, তারি প্রত্যেকটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ হল পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের অন্তঃসার সম্বন্ধে, সেই সম্পর্কের ঐতিহাসিকভাবে ক্ষণস্থায়ী চরিত্র সম্বন্ধে অবধারণার ক্ষেত্রে সরল থেকে জটিলে, নিম্নতর থেকে উচ্চতরতে আরোহণের এক একটি পর্যায়। মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থাটার চারিত্রবৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন এবং পুঁজিবাদকে সর্বপ্রকারে পরীক্ষা করেছেন একটা জীবন্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ হিসেবে।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ

বৈষয়িক মূল্যের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ মানুষের মধ্যে বহুবিধ যে সম্পর্ক গড়ে তোলে, সেগুলি উৎপাদন-সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্পর্কগুলি পরীক্ষা করার জন্য সর্বপ্রথমেই দরকার সেগুলি সরল উপাদানসমূহে বিভক্ত করা, এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটিকে বিশদে সমীক্ষা করা, এবং সমগ্র উৎপাদন-সম্পর্ক-সমাহারের ভিতরে তার স্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করা। একটি সমগ্রকে পৃথক পৃথক উপাদানে ব্যবচ্ছেদ

বা বিভক্ত করা এবং এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটিকে সমগ্রের অংশ হিসেবে অধ্যয়ন করাই **বিশ্লেষণ** নামে পরিচিত। সেই পদ্ধতি রসায়নশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় বস্তুসমূহের গঠনবিন্যাস জানার জন্য এবং উদ্ভিদবিদ্যায় ব্যবহৃত হয় একটি পাতার গঠনকাঠামো জানার জন্য। পদার্থবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণকে ব্যবহার করেন পদার্থকে প্রাথমিক কণিকাসমূহে বিভক্ত করার জন্য, সেগুলির গতি তাঁরা অনুসরণ করেন পাওয়ার অ্যাক্সিলরেটরের সাহায্যে। অর্থশাস্ত্রেও বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের পৃথক পৃথক দিক আলাদা করে বেছে নেওয়া ও পরীক্ষা করার জন্য।

বিশ্লেষণের পর্যায়টি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, অর্থাৎ, অর্থনৈতিক ব্যাপারকে সেগুলির বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করা এবং সেগুলির সারমর্ম পরীক্ষা করা হয়ে গেলে, গবেষক সম্পন্ন করে বিপরীতগামী প্রক্রিয়া, যা **সংশ্লেষণ** বলে পরিচিত। এটা হল বিশ্লেষিত উপাদানগুলিকে একত্র করে এক অখণ্ড সমগ্রে পরিণত করা। বিমূর্ত থেকে মূর্ততে আরোহণ করে গবেষক অর্থনৈতিক ব্যাপারটিকে পুনরুৎপন্ন করে তত্ত্বে, তার সমস্ত উপাদানের ঐক্যে ও পরস্পরসম্পর্কে।

সুতরাং, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ হল মানবিক উৎপাদন-সম্পর্ক অবধারণার দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এক অঙ্গাঙ্গী ঐক্য। অর্থনৈতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন আরম্ভ হয় বিশ্লেষণ দিয়ে আর শেষ হয় সংশ্লেষণ দিয়ে। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ অর্থশাস্ত্রীর হাতে এক কার্যকর হাতিয়ার, যা অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহকে বিভিন্ন অঙ্গীয়

অংশে বিভক্ত করা, সেগুলির সারমর্ম অনুসন্ধান ও উদ্‌ঘাটন করাকেই যে সম্ভব করে তোলে শুধু তাই নয়, উৎপাদন-সম্পর্কের সমস্ত দিকের মধ্যে আভ্যন্তরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, এবং খোদ অঙ্গীয় অংশগুলির ও নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রণালীর অধীনে গোটা উৎপাদন-সম্পর্কপ্রণালী উভয়েরই অর্থনৈতিক বর্গসমূহ ও বিকাশের নিয়ম উপলব্ধি করাও সম্ভব করে তোলে।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সমস্ত দিক ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরসম্পর্কিত ও গতিশীল বলে, যে কোনো অর্থনৈতিক নিয়ম বা বর্গের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের জন্য অন্যান্য অর্থনৈতিক নিয়ম ও বর্গের সঙ্গে তার মিথষ্ক্রিয়া ও বিকাশের মধ্যে তাকে বিবেচনা করা দরকার হয়। যেমন, অর্থ কী তা বোঝার জন্য এটুকু জানাই যথেষ্ট নয় যে অর্থ পণ্যসামগ্রীর বদলে বিনিময় হয়। অর্থ কখন ও কীভাবে ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল, আজকের সমাজে তা কী ভূমিকা পালন করে, এবং তার ভবিষ্যৎ কী, সেটাও জানা দরকার।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতির নিহিতার্থ হল বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্তনের পদ্ধতি, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের পদ্ধতি এবং অন্য আরও যেসব বিশেষ পদ্ধতি ঐক্যে ও ঘনিষ্ঠ পরস্পরসম্পর্কে সেগুলির অঙ্গীয় অংশ, সেই সব পদ্ধতির ব্যবহার।

যুক্তিগত ও ঐতিহাসিক

অর্থশাস্ত্র উৎপাদন-সম্পর্ককে অধ্যয়ন করে সেগুলির বিকাশের ও পরিবর্তনের মধ্যে। প্রকৃতিতে

যেমন, তেমন সমাজেও বিকাশ এগিয়ে চলে সরল থেকে জটিলের দিকে, নিম্নতর থেকে উচ্চতরের দিকে। বিকাশের যে চালিকা শক্তি সমাজের নিম্নতর পর্যায়গুলি থেকে উচ্চতর পর্যায়গুলিতে উত্তরণ ঘটায়, তা হল বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম, একটি উৎপাদন-প্রণালীর আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব।

উৎপাদন-সম্পর্ক অধ্যয়নে **যুক্তিগত** (তত্ত্বগত) **পদ্ধতির** ব্যবহার খুবই ন্যায়সংগত, কেননা বিমূর্ত থেকে মূর্ততে আরোহণ মানবজাতির ঊর্ধ্বমুখী বিকাশের প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটায়। তার নিহিতার্থ হল **ঐতিহাসিক ও যুক্তিগত-র** এক ঐক্য, কেননা তত্ত্বগত গবেষণা এখানে সমাজবিকাশের প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার এক প্রতিফলন।

কিন্তু সেই যুক্তিগত প্রতিফলন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একটা অবিকল প্রতিরূপ নয়। ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগুলির বৈপরীত্যে, অর্থশাস্ত্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বিশদে, বিভিন্ন দেশ তার সুনির্দিষ্ট সমস্ত রকমফের সহ বিবেচনা করে না। অর্থশাস্ত্রে ব্যবহৃত যুক্তিগত পদ্ধতি মোটের উপরে অনুসরণ করে প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সাধারণ রূপরেখাগুলি। সেই সঙ্গে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক, তাকে উদ্ঘাটিত করে তার মূর্ত রূপ ও আপতিক ব্যাঘাতগুলি থেকে মুক্তভাবে। অর্থশাস্ত্র শুধু সেই সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যাপার নিয়েই বিবেচনা করে, যেগুলি নির্দিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্ক প্রণালীতে সহজাত। এর ফলে সমাজের বিকাশকে এক বিমূর্ত ও

তত্ত্বগতভাবে সুসংগত রূপে উপস্থিত করা, এবং তার অর্থনৈতিক নিয়ম ও বর্গগুলি উদ্ঘাটন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়।

গবেষণার পদ্ধতি উপস্থাপনার পদ্ধতি থেকে ভিন্নরূপ হওয়া উচিত। অর্থশাস্ত্রে উপস্থাপনার দুটি পদ্ধতি আছে: বিশ্লেষণমূলক ও ঐতিহাসিক। উপস্থাপনার বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির বেলায় অর্থনৈতিক বর্গগুলি (পণ্য, অর্থ, উদ্বৃত্ত-মূল্য, মুনাফা, প্রভৃতি) পরীক্ষিত হয় সেগুলি যে যুক্তিগত পরম্পরায় থাকে এবং এক উন্নত সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপে একটি অপরটি থেকে উদ্ভূত হয়, সেই যুক্তিগত পরম্পরায়।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির বেলায়, অর্থনৈতিক ব্যাপার ও বর্গগুলি পরীক্ষিত হয় যে ঐতিহাসিক পরম্পরায় সেগুলি সমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই ঐতিহাসিক পরম্পরায়।

মার্কসের 'পুঁজি' সমেত, অর্থশাস্ত্র বিষয়ক বহু রচনায় বিষয়োপকরণটি উপস্থিত করা হয় বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি, উভয়কেই ব্যবহার করে। 'পুঁজিতে' বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিটিরই প্রাধান্য, যে বৈজ্ঞানিক রচনায় একটি বুনিয়াদি তত্ত্বগত গবেষণার ফলাফল সর্বপ্রথম উপস্থিত করা হচ্ছে, সেই রচনায় এটাই স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক উপাত্তসমূহ ও অসংখ্য ঐতিহাসিক অতীত-দর্শনের ব্যাপারে বলা যায়, মার্কস সেগুলি ব্যবহার করেছিলেন বিভিন্ন তত্ত্বগত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করা ও উদাহরণ দেওয়ার জন্য। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে 'পুঁজি' দেয়

পুঁজিবাদের একটা ইতিহাস আর সেই ইতিহাসের সারসংক্ষেপ যাতে বিধৃত সেই মতবাদগুলির এক বিশ্লেষণ।

পরিমাণ ও গুণ

অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহের **গুণগত ও পরিমাণগত** দিক আছে, সেগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ও পরস্পরনির্ভর, সেগুলির মধ্যে দ্বান্দ্বিক ঐক্য আছে। গুণগত দিকটিই প্রধান দিক, তা পরিমাণগত দিকটিকে নির্ধারিণ করে, আর পরিমাণগত পরিবর্তনগুলির ফলে আগে হোক বা পরে হোক, অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে গুণগতভাবে নতুন নতুন ব্যাপারের আবির্ভাব ঘটে।

পুঁজিবাদ দিয়ে সামন্ততন্ত্রের প্রতিস্থাপনায় সমাজের এক নতুন গুণগত অবস্থায় উত্তরণ ঘটেছিল, উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের আরও বেশি সুযোগ তা উন্মুক্ত করেছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল, যখন এই শক্তিগুলি শ্রমের ফল উপযোজনের পুঁজিবাদী রূপটির সঙ্গে বেমানান হয়ে পড়েছিল, সেই রূপটির সঙ্গে এক আপোসহীন বিরোধ শুরু হয়েছিল। তার মানে এই যে পুঁজিবাদী সমাজ উৎক্রমিত হয়েছিল এক নতুন গুণগত অবস্থায়, যখন সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পূর্বশর্তগুলি গড়ে উঠেছিল।

অর্থশাস্ত্র উৎপাদন-সম্পর্ককে শুধু গুণগত কোণ থেকেই নয়, সেই সম্পর্কের পরিমাণগত নির্ধারকের দিক দিয়েও অধ্যয়ন করে। যেমন, পুঁজিবাদী শোষণের সারমর্ম উদ্‌ঘাটন করার ক্ষেত্রে, শুধু উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াটা দেখানোই নয়, পুঁজিপতি ক্ষতিপূরণ না দিয়ে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করছে তার হার ও মোট পরিমাণও নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ পুঁজির দ্বারা মজুরি-শ্রম শোষণের মাত্রাটা দেখানোও গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহের পরিমাণগত দিকটিকে অর্থশাস্ত্র পরীক্ষা করে দেখে **গাণিতিক** ও **পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির** সাহায্যে। রসায়নশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই, অর্থনীতি-বিজ্ঞান আরও বেশি করে গণিতকে ব্যবহার করছে। গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি তাকে সক্ষম করে অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহের রাজনৈতিক-অন্তর্বস্তুর আরও গভীরে প্রবেশ করতে, সেগুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও ভালো ধারণা পেতে এবং সিদ্ধ ও যথাযথ সুপারিশগুলি প্রণয়ন করতে। সে সমস্তই তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলিকে কর্মে প্রয়োগ করতে সাহায্য করে।

কিন্তু গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ বাস্তব অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির এক সঠিক চিত্র উপস্থিত করার কাজে লাগে একমাত্র তখনই যখন তা এই সমস্ত সম্পর্কের এক বিজ্ঞানসম্মত গুণগত বিশ্লেষণভিত্তিক হয়। মার্কস ও লেনিনের রচনাগুলি উৎপাদন-সম্পর্ক

বিষয়ে সুগভীর অধ্যয়নের জন্য গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহারের আদর্শস্বরূপ।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করেন অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহের গুণগত অন্তর্বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, অথবা এমন কি তা অগ্রাহ্য করে, অর্থনৈতিক তত্ত্বের জায়গায় তাঁরা প্রতিকল্প হিসেবে স্থাপন করেন নিছক গাণিতিক হিসাব-নিকাশ ও সূত্রাবলী। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রকাশিত বহু অর্থনৈতিক রচনা ও বিধিগ্রন্থ সারণি, নকশা আর তালিকায় ভর্তি থাকে, সেগুলিতে প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষের ব্যবহার। তাই, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা প্রায়শই ব্যবহার করেন তথাকথিত 'পক্ষপাতের বক্ররেখা', যেগুলির দ্বারা তাঁরা মূল্য গঠনের উদ্দেশ্যে যোগান ও চাহিদার মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্কের প্রতিফলন ঘটাতে চান, অথচ পণ্যসামগ্রীর গতি-নিয়ামক প্রকৃত নিয়মগুলি, বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রতিফলনকারী নিয়মগুলি, গণ্য করা হয় না।

গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, তাকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেখা উচিত নয়। সেগুলি বেশির ভাগই ফলিত, ব্যবহারিক তাৎপর্যসম্পন্ন, অর্থনৈতিক তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি অনুধাবনে এক সহায়ক হাতিয়ার হিসেবে সেগুলি ব্যবহৃত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই পদ্ধতিগুলি সফলভাবে ব্যবহার করা হয় জাতীয়-অর্থনৈতিক অনুপাতসমূহ নির্ধারণের জন্য, সর্বমোট

উৎপাদ ও জাতীয় আয়ের উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহারে গাঠনিক পরিবর্তনগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য, অর্থনৈতিক বৃদ্ধিহার নির্ধারণ এবং জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য পরিমাণগত দিকের মূল্যায়ন করার জন্য।

কিন্তু পরিমাণগত সূচকগুলি মানুষে-মানুষে অর্থনৈতিক সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্কের সমগ্র বৈচিত্র্য প্রকাশ করতে পারে না। এঙ্গেলস বলেছেন, অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি ভৌত পরিমাপে প্রকাশ করা যায় না।* পরিমাণগত সমরূপতা পরীক্ষায় গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি একটা বড় ভূমিকা পালন করলেও, অর্থশাস্ত্রে তা কখনও প্রাধান্যশালী হতে পারে না। এখানে অধিকারবলেই প্রাধান্য থাকে বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্তনের ক্ষমতার, যা অর্থনৈতিক সম্পর্কের গুণগত অন্তর্বস্তুকে উন্মোচিত করে।

সামাজিক কর্মপ্রয়োগ

সমাজের অর্থনৈতিক জীবন সমেত বিষয়গত পৃথিবীর অবধারণা অগ্রসর হয় জীবন্ত অনুধ্যান থেকে বিমূর্ত চিন্তনে এবং তার পরে কর্মপ্রয়োগে।

দৈনন্দিন জীবনেও তাই ঘটে, যখন, ধরুন, একজন

---

* দ্রষ্টব্য: 'Engels an Marx in Ventnor, 19. Dez. 1882', in: Marx/Engels, *Werke*, Bd. 35, Dietz Verlag, Berlin, 1967, p. 134.

সম্ভাব্য ক্রেতা একটি পোশাক প্রথমে পরীক্ষা করে ও পরে দেখে, তার পর একটা সিদ্ধান্ত নেয়, এবং সব শেষে ক্রিয়া করে: হয় সেটি কেনে, না হয় কেনে না। কিন্তু আমরা যেন সব কিছু অতিসরল করে না ফেলি, কেননা বৈজ্ঞানিক অবধারণায় সব কিছু আরও অনেক জটিল। ব্যাপারসমূহের প্রবঞ্চনাকর বাহ্যিক চেহারার তলায় সেগুলির সত্যকার অন্তঃসার নির্ণয় করার প্রয়াস পায় যে অর্থশাস্ত্র, তার বেলায় তো কথাটা আরও বেশি প্রযোজ্য। জীবন্ত অনুধ্যান এখানে উপর-উপর অর্থনৈতিক রূপগুলি শুধু প্রভেদনির্ণয় করতে পারে, পক্ষান্তরে একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত চিন্তনই অবধারণায় আবশ্যকীয় পর্যায়ে ওঠা, অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির একেবারে মর্মে প্রবেশ করা, সেগুলির বিকাশের বর্গ ও নিয়মগুলি বোঝা এবং কর্মপ্রয়োগের জন্য সিদ্ধান্তসমূহ সূত্রবদ্ধ করা সম্ভব করে তোলে। কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি অবধারণার প্রক্রিয়া সেখানেই শেষ হয়ে যায় না।

অবধারণায় চূড়ান্ত পর্যায় হল **সামাজিক কর্মপ্রয়োগ,** যা বৈজ্ঞানিক চিন্তনের দ্বারা বিশদীকৃত সিদ্ধান্ত ও সামান্যীকরণসমূহকে প্রতিপন্ন বা বাতিল করে। অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কৃত অর্থনৈতিক নিয়ম ও বর্গগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয় করা, উৎপাদন-সম্পর্কের সারমর্ম সম্বন্ধে ধ্যানধারণা ও সেগুলির বিকাশের নিয়মগুলি বাস্তব অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা স্থির করা সম্ভব করে তোলে। বৈজ্ঞানিক চিন্তন থেকে কর্মপ্রয়োগে

উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহ বিষয়ক জ্ঞান এক উচ্চতর স্তরে গিয়ে পেঁছয়, পরীক্ষিত হয় এবং নতুন নতুন উপাদানে সমৃদ্ধ হয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সামাজিক কর্মপ্রয়োগের ঐক্য ও ঘনিষ্ঠ পরস্পরসম্পর্ক মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলির বৈধতা নিশ্চিত করে পুরনো সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর এবং এক নতুন, কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণে এক হাতিয়ার হিসেবে।

পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অবস্থায়, অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার উৎকর্ষসাধনের উপায়, উচ্চতর শ্রম উৎপাদনশীলতার পদ্ধতি ও প্রণোদনাগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তা ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তাবিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকরতা যাচাই করে দেখার জন্য দেশের এক বা একাধিক উদ্যোগে সাধারণত পাইলট প্রকল্প চালু করা হয় এবং শুধু তার পরেই স্থির করা হয় সেই অভিজ্ঞতাটা জাতীয় স্তরে ব্যবহার করা হবে কি না। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন উদ্যোগে চলতি বিপুল পরিসর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেই দিক দিয়ে ইঙ্গিতসূচক। এর উদ্দেশ্য হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার এক আধুনিক ব্যবস্থার উপাদানগুলি যাচাই করে দেখা এবং ত্রুটিহীন করা।

অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলির ব্যাপকতর

ব্যবহার বৈজ্ঞানিক বিমূর্তনের ভূমিকাকে খাটো করে না, কেননা একটা অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর আগে সাধারণত থাকে তত্ত্বগত গবেষণা, তা সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি চলতে থাকে, এবং ব্যবহৃত হয় তার ফলাফল নির্ণয় ও বিশ্লেষণে। অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার দিক দিকে সম্ভব করে তোলে তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলিকে কর্মপ্রয়োগে পরীক্ষা করে দেখতে এবং প্রকল্পিত ব্যবস্থাগুলি উপযুক্ত ও কার্যকর কি না তা স্থির করতে।

উৎপাদন-সম্পর্ক অধ্যয়নে সর্বাত্মক ডায়ালেকটিক বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের নিজস্ব সুনির্দিষ্টতা আছে, তা নির্ভর করে সমীক্ষাধীন উৎপাদন-প্রণালীর উপরে: পুঁজিবাদী অথবা কমিউনিস্ট। যার ভিত্তি হল সংঘক্রিয়াবাদী নীতি ও যার অর্থনৈতিক নিয়মগুলি এক প্রণালীবদ্ধ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকে একটিমাত্র সমগ্র হিসেবে অধ্যয়ন করার সময়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা ও মজুরি-শ্রম শোষণভিত্তিক স্বতঃস্ফূর্ত পুঁজিবাদী উৎপাদন অধ্যয়নে ব্যবহৃত একই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। অধিকন্তু, যার উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মনীতির মূল বিজ্ঞানসম্মত নীতি বিশদ করা, সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার নীতিগুলি বিশদ করা, সেই সমাজতন্ত্রের অর্থশাস্ত্রের উচিত তার তত্ত্বগত গবেষণাকে এমন সব সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও ব্যবহারিক সুপারিশ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, যার গুণগত ও পরিমাণগত, দুটি দিকই আছে। সমাজতন্ত্রের

অর্থশাস্ত্রের বিকাশ গবেষণার পদ্ধতিতত্ত্বের ত্রুটিহীনতাসাধনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে। সেটা একটা অখন্ড, পরস্পরসম্পর্কিত প্রক্রিয়া যা সমাজতন্ত্রের অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপনকারী ও তার গবেষণা পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির প্রদর্শক লেনিনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

অধ্যায় ৬

ভাবধারণার বিপুল ক্ষমতা

অর্থনৈতিক মতবাদগুলির ইতিহাস হল ভাবধারণার এক অন্তহীন সংগ্রাম, বৈরমূলক শ্রেণীগুলির আকাঙ্ক্ষা-প্রয়াস ও স্বার্থ-প্রণোদিত বিপরীত অভিমতের সংগ্রাম। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহ অধ্যয়নের ধারা ও অর্জিত ফলাফলও মূলগতভাবে পৃথক ছিল। শাসক শোষক শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শবিদরা তাঁদের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি বিশদ করেছিলেন এই অনুমিতির ভিত্তিতে যে কোনো না কোনো এক ধরনের শোষণভিত্তিক বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি চিরন্তন ও অমোঘ। সমস্ত মানবিক ক্রিয়াকলাপই ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত — এই মর্মে ধর্মীয় আপ্তবাক্যগুলির সাহায্যে এই ধরনের অভিমতের আলম্ব যোগানো হত। যে সমস্ত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের কারণকে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে, তার জন্মগত অনুভূতি ও মানসিকতার সঙ্গে

যুক্ত করেছিলেন, তাঁদের গোড়ার দিককার অবস্থানও এই রকমই ছিল।

বস্তুতপক্ষে, এই ধরনের অভিমত পুরনো পাণ্ডুলিপিগুলির বিবর্ণ পৃষ্ঠাগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়, অর্থনীতি বিষয়ে বর্তমানের বহু পশ্চিমি বিধিগ্রন্থতেও তা দেখতে পাওয়া যায়; এই বিধিগ্রন্থগুলির প্রচার ও প্রসার বহু পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশে ঘটানো হচ্ছে। এই সমস্ত বিধিগ্রন্থেই যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা এই যে সেগুলির অন্তর্বস্তু যত পৃথকই হোক না কেন, সবগুলিই প্রচার ও প্রতিপাদন করে একই চিন্তা: পুঁজিবাদের পক্ষ সমর্থন, তার গোটা গড়নটার এবং তার 'চিরন্তন সত্য ও ন্যায়বিচারের' পক্ষ সমর্থন।

এটা আরও একবার দেখায় যে অর্থশাস্ত্র সর্বদাই একটি শ্রেণীভিত্তিক ও ভাবাদর্শগত বিজ্ঞান ছিল এবং থাকবে। বেশির ভাগ বুর্জোয়া গবেষক অবশ্য সে বিষয়ে কিছু না বলাই শ্রেয় মনে করেন। একমাত্র মার্কসবাদই খোলাখুলিভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে পৃথিবীকে ঘোষণা করেছে যে তা হল আমাদের কালের সবচেয়ে অগ্রসর ও বিপ্লবী শ্রেণী — প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক মতবাদ, আর মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র হল নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার ভাবাদর্শগত অস্ত্র।

মার্কসবাদের আত্মপ্রকাশ অর্থশাস্ত্রে এক বিপ্লব এনেছে, অর্থশাস্ত্রকে দাঁড় করিয়েছে সত্যিকার এক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপরে। তা একটা বিপ্লব ছিল শুধু উৎপাদন-সম্পর্ক, অর্থনৈতিক নিয়ম ও বর্গগুলির

সারমর্ম সম্বন্ধে এক বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধির ক্ষেত্রেই নয়, গবেষণার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও। সমাজের সামাজিক প্রগতিতে সামাজিক কর্মপ্রয়োগের নিয়ামক ভূমিকাকে স্বীকার করে সামাজিক কর্মপ্রয়োগের সমস্যাকে তা নতুনভাবে ব্যাখ্যা রেছে। ব্যাপক জনসাধারণের হৃদয় জয় করে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ভাবধারণা হয়ে উঠেছে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে বৃহত্তম বৈষয়িক শক্তি।

অর্থশাস্ত্রে বিপ্লব

প্রগতিশীল মানবচিন্তার দ্বারা সূত্রায়িত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গিয়ে মার্কস বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে বিপুল অবদান রেখেছেন। দার্শনিক, অর্থশাস্ত্রবিশারদ, ইতিহাসবেত্তা ও সমাজতত্ত্ববিদদের এ কথা বলার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই প্রতিভাদীপ্ত চিন্তানায়ক তাঁদের বিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছেন। সমস্ত সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশে তাঁর অবদানকে বিন্দুমাত্র খাটো না করেও এ কথা বলা উচিত যে তাঁর প্রধান প্রয়াস ছিল অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে। 'পুঁজির' স্রষ্টা মার্কসের অকৃত্রিম বন্ধু ও সহযোগী ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস সব সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন। এঙ্গেলস এমন কয়েকটি অসামান্য রচনা লিখেছিলেন যেগুলি মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের আত্মপ্রকাশে সাহায্য করেছিল, যেমন — 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা', 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' ইত্যাদি। 'পুঁজি' লেখার

কাজে এবং সেটি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করতে তিনি মার্কসকে অমূল্য সহায়তা দিয়েছিলেন।

মার্কসবাদের অন্যান্য অঙ্গ-উপাদানের মতোই, মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র মানবেতিহাসের কোনো অগম পথে গজিয়ে ওঠে নি, বরং লেনিন যে কথা জোর দিয়ে বলেছেন, আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯শ শতাব্দীতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বগুলির এক প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ ধারাবাহিকতা হিসেবে, যে-কৃতিত্বগুলির পরিচায়ক ছিল জার্মান দর্শন, ইংলন্ডের অর্থশাস্ত্র ও ফরাসী সমাজতন্ত্র।*

দার্শনিক ভিত্তি

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের অর্থনৈতিক গবেষণাকর্মে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অবস্থানসমূহ থেকে সমালোচনাত্মকভাবে পুনঃরচনা করেছিলেন এবং সৃষ্টিশীলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন **জার্মান ক্লাসিকাল বুর্জোয়া দর্শনের** মহত্তম কৃতিত্বগুলি: গিওর্গ হেগেলের ডায়ালেকটিকস বা দ্বন্দ্বতত্ত্ব এবং লুডভিগ ফয়েরবাখের বস্তুবাদ।

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে মানবসমাজের বিকাশ পর্যন্ত

---

* V. I. Lenin, 'The Three Sources and Three Component Parts of Marxism', *Collected Works,* Vol. 19, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 23.

বিস্তৃত করাটা মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের অভ্যুদয়ের পক্ষে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস সমালোচনা করেছিলেন ফয়েরবাখের ভাববাদী ও ধর্মীয় অভিমতকে, যিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিমতে ছিলেন বস্তুবাদী, কিন্তু সামাজিক বিকাশের ইতিহাসকে দেখেছিলেন ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি মনে করতেন যে মানবসমাজের বিকাশে বিভিন্ন কালপর্ব একটি থেকে অপরটি পৃথক ছিল শুধু ধর্মের দিকে দিয়ে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতারা ফয়েরবাখের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিশুদ্ধ অনুধ্যানমূলক চরিত্রও উদ্ঘাটন করেছিলেন। তাঁদের পক্ষে একটা আবশ্যিক বিষয় ছিল এটা দেখানো যে পৃথিবীর এক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়, তা বদলানো দরকার। আর সেই প্রতিজ্ঞাটি উজ্জ্বল অভিব্যক্তি লাভ করেছে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রে, যার বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তগুলি পৃথিবীর এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথকে আলোকোদ্ভাসিত করে।

মার্কস ও এঙ্গেলস হেগেলের ভাববাদী ডায়ালেকটিকসকে 'মাথা উপরে পা নিচে রেখে সোজা করে দাঁড় করিয়ে' তার এক সমালোচনাত্মক, বস্তুবাদী পুনর্মূল্যায়নও করেছেন। হেগেলের বিপরীতে তাঁরা ডায়ালেকটিকসকে প্রয়োগ করেছেন এক 'পরম আত্মা' বা 'পরম ভাবের' বিকাশের ক্ষেত্রে নয়, বরং বিষয়গত পৃথিবীর বিকাশের ক্ষেত্রে। মার্কস লিখেছেন যে তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হেগেলীয় পদ্ধতি থেকে শুধু আলাদাই

নয়, বরং তার সাক্ষাৎ বিপরীত।* মার্কসের বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশের কোনো গন্ডীকে, কোনো চিরন্তন বা অমোঘকে স্বীকার করে না, এবং যা নতুন ও আরও প্রগতিশীল তাই দিয়ে পুরনোকে প্রতিস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে। অর্থশাস্ত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা বোঝায় এই যে, কোনো অর্থনৈতিক নিয়ম বা বর্গকেই অমোঘ-অপরিবর্তনীয় বলে গণ্য করা যায় না, বরং চির বিকাশমান অর্থনৈতিক জীবন অনুসারে অন্তহীন গতিতে তাকে বিবেচনা করা উচিত। সেই গতির উৎস কোনো বাহ্যিক, অতিপ্রাকৃত শক্তির মধ্যে নিহিত নেই, রয়েছে প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক ব্যাপারে ও সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সহজাত বিপরীতগুলির ঐক্য ও সংগ্রামের মধ্যে।

পৃথিবীর বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে সামাজিক ব্যাপারসমূহের বিশ্লেষণ সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সৃষ্টিশীলভাবে মিলিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজ-বিষয়ক দীর্ঘকাল যাবৎ মেনে নেওয়া ভাববাদী ধারণাগুলি খণ্ডন করেন এবং মানবজাতির সামাজিক বিকাশের সত্যকার ইতিহাস দেখান বৈষয়িক মূল্যের উৎপাদক শ্রমজীবী জনসাধারণের নিয়ামক ভূমিকা প্রদর্শন করে।

দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতির একটি চারিত্রবৈশিষ্ট্য হল তার বৈপ্লবিক সমালোচনাত্মক মনোভাব। তাই,

---

* Karl Marx, *Capital,* Vol. I, p. 29.

পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক অধ্যয়ন করতে গিয়ে অর্থশাস্ত্র এই সমস্ত সম্পর্ক তথা তদনুষঙ্গী বুর্জোয়া অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে এক সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, পুঁজিবাদের পক্ষ-সমর্থক হিসেবে সেই তত্ত্বগুলির সেবামূলক ভূমিকা দেখিয়ে দেয়। 'পুঁজিতে' এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের অন্যান্য রচনায় দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতির প্রতিপাদন ও সুদক্ষ ব্যবহার হল সেই বিপ্লবের অংশ, যে বিপ্লব তাঁরা সংঘটিত করেছেন অর্থশাস্ত্রে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের কর্মাদর্শ ও শিক্ষার মহান উত্তরাধিকারী লেনিন মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রকে বিকশিত করে নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় এক নতুন স্তরে উন্নীত করেন। মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে তিনি পুঁজিবাদকে তার সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে, সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, এবং সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণকর্মের সমরূপতাগুলি সন্ধান করার ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করেছেন প্রতিভাদীপ্তভাবে। মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের বিকাশে এক নতুন পর্যায়ের সূচক, লেনিনের রচনাগুলি ছিল মার্কসের 'পুঁজির' সাক্ষাৎ ক্রমানুবর্তন।

সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ভাবধারণা

যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল বৈপ্লবিক উপায়ে পুঁজিবাদের উচ্ছেদসাধন ও সমাজতান্ত্রিক ধারায় সমাজের রূপান্তরণ,

সেই শ্রমিক শ্রেণীর অর্থশাস্ত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস আগেকার সমাজতান্ত্রিক মতবাদগুলির এক সমালোচনাত্মক সমীক্ষা করেন।

১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের **মহান ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা** — আঁরি সাঁ-সিমোঁ, শার্ল ফুরিয়ে ও রবার্ট ওয়েন — তাঁদের রচনায় মানুষের উপরে মানুষের কোনোরূপ শোষণবিহীন বা অন্য কোনোরূপ সামাজিক অসাম্যহীন, এক নতুন ধরনের সমাজের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পুঁজিবাদের কবর-খনক ও এক নতুন সমাজের স্থপতি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা তাঁরা বুঝতে পারেন নি, সাধারণভাবে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিশেষভাবে বিপ্লবী কার্যকলাপকে তাঁরা বাতিল করেছিলেন। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের তাঁদের অভিমতের জন্য সমালোচনা করলেও মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদের কুফলগুলি সম্পর্কে তাঁদের তীব্র সমালোচনার এবং তাঁরাই যে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রকে দেখেছিলেন এমন একটা নতুন ও ন্যায়সাংগত ব্যবস্থা হিসেবে, যে ব্যবস্থা ধনী আর দরিদ্র, শোষক ও শোষিতে বিভক্ত নয়, সেই বিষয়টির উচ্চ মূল্যায়ন করেছিলেন। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম সম্বন্ধে, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সমকক্ষতা অর্জনের প্রয়াস, শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য দূরীকরণ, প্রভৃতি সম্বন্ধে মহান ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের চমৎকার অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

সমাজ বিষয়ক অভিমতে ইতিহাসবাদ

যাঁরা তাঁদের শ্রেণী-সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমাজের ইতিহাসকে জনগণের ইতিহাস হিসেবে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই ১৯শ শতকীয় **ফরাসী ইতিহাসবেত্তা** অগ্যুস্তেঁ তিয়েরি, অগ্যুস্ত মিনিয়ে ও ফ্রাঁসোয়া গিজো সম্বন্ধে মার্কস উচ্চ মত পোষণ করেন। তাঁরা তাঁদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন শ্রেণীসমূহ ও সম্প্রদায়সমূহের প্রকৃত অবস্থানের দিকে, তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের ভূমিকা ও সমাজবিকাশে সম্পত্তি-মালিকানা সম্পর্কের ভূমিকার দিকে। সেই সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণীর মহান শিক্ষকদ্বয় ফরাসী ইতিহাসবেত্তাদের সমালোচনা করেন বুর্জোয়া ভাবাদর্শবাদী হিসেবে, যাঁরা শ্রেণীসমূহের উৎসগুলির এক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি, বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীবৈরগুলি ঝাপসা করে দিয়েছিলেন, এবং তাকে দেখেছিলেন মানবজাতির এক স্বাভাবিক ও চিরন্তন অবস্থা হিসেবে।

মার্কসের 'পুঁজিতে' আছে মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ার, গ্রীস ও রোমের, ভারত ও চীনের, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলন্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্যগত উপকরণের এক বিপুল সম্পদ। ঐতিহাসিক ও যুক্তিগত — এই দুইয়ের ঐক্যের নীতি সম্বন্ধে মার্কস এক বিপুল তথ্যগত উপকরণ বিশ্লেষণ করে একটা ব্যাপক ঐতিহাসিক

পশ্চাৎপটে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি নিয়ে অনুসন্ধান করেন। মার্কসের বৈপ্লবিক তত্ত্ব যে সত্য এবং, ফলত, সর্বশক্তিমান, তার অন্যতম প্রধান কারণ নিহিত রয়েছে তার ঐতিহাসিক সিদ্ধতার মধ্যে।

মহান ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী ও ফরাসী ইতিহাসবেত্তাদের রচনাগুলি সমালোচনাত্মকভাবে অধ্যয়ন করার পর মার্কস সূত্রবদ্ধ করেন নীতিগতভাবে তিনটি নতুন প্রতিজ্ঞা: ১) শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব সামাজিক উৎপাদনের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রূপগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত, ২) শ্রেণী সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী ফল হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র, এবং, ৩) খোদ একনায়কতন্ত্রই শ্রেণীগুলির বিলুপ্তি ও এক শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করে। সমাজবিকাশের ও শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস মার্কসের বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেছে।

পরবর্তীকালে লেনিন প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের রূপ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও পুঁজিবাদের পতন সম্বন্ধে, এবং কমিউনিজমে উত্তরণের সমরূপগুলি সম্বন্ধে বহু মার্কসীয় প্রতিজ্ঞাকে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা অনুসারে বিবর্ধিত করেন। লেনিনের সাক্ষাৎ নেতৃত্বাধীনে, মার্কসীয় মতবাদ সর্বপ্রথম কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হয় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্ম চলাকালে। মার্কস ও এঙ্গেলস যেখানে সমাজতন্ত্রকে একটা ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে পরিণত করেছিলেন, লেনিন সেখানে সেই বিজ্ঞানকে

আরও বিকশিত করেছিলেন এবং তার বৈপ্লবিক ভাবধারণাগুলি সামাজিক কর্মপ্রয়োগে রূপায়িত করার জন্য কাজ করেছিলেন।

অর্থনৈতিক গবেষণার ইতিহাস

মার্কস তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিকশিত করার কাজে ব্যবহার করেছিলেন ক্লাসিকাল **বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের** মহৎ রচয়িতাদের রচনাগুলি, এই বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র তার সর্বোচ্চ শিখরে পেঁছেছিল ইংলন্ডে ১৮শ শতাব্দীর শেষ ও ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর রচনায়। ক্লাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রকে লেনিন অভিহিত করেছেন মার্কসবাদের অন্যতম উৎস বলে। প্রাক-মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের অভ্যুদয় ও বিকাশে প্রধান প্রধান পর্যায়ের দিকে এবারে যাওয়া যাক।

অর্থশাস্ত্র ১৭শ শতাব্দীতে একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে বিস্তৃত হওয়ার বহু আগেই অর্থনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করার আদিতম প্রচেষ্টা হয়েছিল। লোকে জমি চাষ করত, গবাদি পশু পালন করত, হস্তশিল্পে নিযুক্ত থাকত, বাজারে জিনিস কেনা-বেচা করত, অন্যান্য লোকের সঙ্গে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ হত। এমন কি একটি ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ইউনিট পরিচালনার ক্ষেত্রেও জানা দরকার ছিল কী করে আরও উৎপাদনশীলভাবে কাজ করতে হবে, উৎপন্ন উৎপাদগুলি কীভাবে মুনাফায়

বিক্রি করতে হবে, সংক্ষেপে, উৎপাদনকে কী করে আরও অর্থনীতিসম্মতভাবে চালাতে হবে। প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক, হিন্দু ও অন্যান্য জাতির কাছে তখনই এই সব অর্থনৈতিক বর্গগুলি জানা ছিল, যেমন — পণ্য, বিনিময়, অর্থ, দাম, ঋণের সুদ, বাণিজ্যিক মুনাফা, ইত্যাদি।

সে সবই প্রতিফলিত হয়েছিল নির্দেশবাণী আর উপদেশে, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক রচনায়। অর্থনীতি সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক ভাবধারণা ও উপাত্ত পাওয়া যায় প্রাচীন মিশরীয় পাপিরাসের পুঁথিগুলিতে, ব্যাবিলোনিয়ার শাসক হাম্মুরাবির সংবিধিতে; প্রাচীন ভারতের বেদগ্রন্থগুলিতে; প্রাচীন গ্রীক কবি হোমারের 'ওডিসি' ও অন্যান্য রচনায়; জেনোফন, প্লাটো, আরিস্ততল ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের লেখায়, ইত্যাদিতে।

প্রথমে, অর্থনৈতিক চিন্তা ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিল সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানের অন্য রূপগুলির সঙ্গে। বেশির ভাগ তথ্যই ছিল প্রাচীন জাতিগুলির দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবন সংক্রান্ত, আর যথার্থ অর্থনৈতিক চিন্তা, যার নিহিতার্থ হল অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহের অধ্যয়ন ও তত্ত্বগত সামান্যীকরণ, তা তখনও ছিল ভ্রূণাবস্থায়। অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস আরম্ভ হয় জেনোফন, প্লাটো ও বিশেষত আরিস্ততলের রচনা থেকে, যাঁরা প্রাচীন গ্রীক সমাজের (যা ছিল আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার ক্ষীয়মাণতা ও ক্রীতদাসপ্রথার অভ্যুদয়ের পর্যায়ে) অর্থনীতি সম্বন্ধে এক তত্ত্বগত উপলব্ধির

দিকে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন, এবং মূল্য, পণ্য বিনিময়, ও পুঁজির আদিতম রূপ — ব্যবসায়িক (বণিকের) ও চোটার পুঁজি সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন। অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশে প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানীদের অবদানের উচ্চ প্রশংসা করে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে সেই ক্ষেত্রে তাঁরা অন্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো একই রকম প্রতিভা ও মৌলিকতা দেখান। এই কারণে, তাঁদের অভিমত, ইতিহাসগতভাবে, আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগত যাত্রাবিন্দু।*

পুঁজিবাদের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ, বাজারের সম্প্রসারণ, সামন্ততান্ত্রিক খণ্ড-বিক্ষিপ্ততা থেকে কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রগুলির দিকে অগ্রগতির ঘটায় একক অর্থনৈতিক ইউনিটগুলির পরিবর্তে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনার জন্য এক নিয়ম-সংহিতা প্রণয়ন করা দরকার হয়ে উঠেছিল। তার ফলে আত্মপ্রকাশ করেছিল অর্থশাস্ত্র, যা অভিব্যক্ত করেছিল জায়মান বুর্জোয়াদের স্বার্থ।

বুর্জোয়া কাঠামোগুলি প্রথমে আকৃতি লাভ করেছিল উৎপাদনে নয়, বরং বাণিজ্যে ও অর্থ-সংক্রান্ত কাজ-কারবারে, যার জন্য প্রথম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদটির নাম ছিল **মার্কেণ্টাইলিজম** [যে মতবাদ অনুসারে অর্থই একমাত্র সম্পদ। — অনুঃ] এবং তা প্রকাশ করেছিল বণিকের পুঁজির স্বার্থ। অর্থনৈতিক

---

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, p. 271.

চিন্তার সেই ধারাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এবং ইতালি, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও শেষ পর্যন্ত রাশিয়াতেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। এর প্রধান প্রতিনিধিরা ছিলেন ইংলন্ডে উইলিয়াম স্ট্যাফোর্ড ও টমাস মেন, ইতালিতে আন্তোনিও সেরা, ফ্রান্সে আঁতোয়াঁ দ্য মংক্রেতিয়েঁ, রাশিয়ায় আ. ল. অরদিন-নাশ্চোকিন ও ই. ত. পসোশকভ।

মার্কেণ্টাইলিস্টরা মনে করতেন যে অর্থনীতির পক্ষে বাণিজ্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বর্ণ ও অর্থই সম্পদের প্রধান রূপ। তাই রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মনীতিতে তাঁদের সুপারিশগুলি সেই রকমই ছিল। তাঁরা বণিকদের স্বার্থে অর্থনীতিতে জোরালো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন এবং এই নীতি উপস্থিত করেছিলেন: একটা সক্রিয় বহির্বাণিজ্য উদ্বৃত্তের প্রয়াসে সস্তায় কেনা এবং বেশি দামে বিক্রি করা। সেই লক্ষ্য নিয়ে মার্কেণ্টাইলিস্টরা সোনার রপ্তানি রোধ করে সামগ্রীর প্রতিদানে সোনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে রাষ্ট্রের উচিত একটা সংরক্ষণমূলক কর্মনীতি অনুসরণ করা: যে জাতীয় শিল্প রপ্তানির জন্য কাজ করছে তার বিকাশে উৎসাহ যোগানো, এবং সেই সঙ্গে, যে সব সামগ্রীর দাম সোনায় মেটাতে হবে সেই সব সামগ্রীর আমদানি সীমিত করা। মার্কেণ্টাইলিস্ট তত্ত্বগুলি যদিও সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় অগভীর ব্যাপারসমূহের বর্ণনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল,

তব্ও সেগ্লিই ছিল ব্র্জোয়া ভাবধারণার প্রথম তত্ত্বগত সামান্যীকরণ।

'পলিটিকাল ইকনমি' বা অর্থশাস্ত্র কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসী মার্কেণ্টাইলিস্ট আঁতোয়াঁ দ্য মঁক্রেতিয়েঁ তাঁর 'অর্থশাস্ত্র বিষয়ে রচনা' (১৬১৫) গ্রন্থে, তাতে রাষ্ট্রিক অর্থনীতি পরিচালনা ও দেশের সম্পদ বিবর্ধনের উপায় সম্বন্ধে স্পারিশ ছিল। 'পলিটিকাল ইকনমি' কথাটির উৎপত্তি হল গ্রীক শব্দ *politikos* — রাষ্ট্রিক, সামাজিক; *oikos* — গ্হস্থালি বা তার ব্যবস্থাপনা; এবং *nomos* — নিয়ম বা আইন; এবং তাই তার অর্থ ছিল 'রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম'।

কিন্তু এই নামটি পাওয়ার পরেও অর্থশাস্ত্র তৎক্ষণাৎ তার উপযুক্ত বিষয়বস্তুকে প্রোপ্রি নির্ণয় করে নি। প্রারম্ভিকভাবে তার বিবেচ্য ছিল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক কর্মনীতির কতকগ্লি বিষয়, যেমন — বৈদেশিক বাণিজ্য, অর্থ বাজারে ছাড়া, করাধান, ইত্যাদি। সুপ্রাচীন 'গ্হস্থালির' বিপরীতে, মার্কেণ্টাইল কালপর্বে অর্থশাস্ত্র কার্যত ছিল রাষ্ট্রিক বিষয়সম্হ ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে এক নিয়ম-সংহিতা।

পরে ব্র্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বিকাশ ঘটান **ফিজিওক্র্যাটরা:** ফ্রাঁসোয়া কেনে, আন রবেয়ার জাক তিউর্গো ও অন্যান্যরা। মার্কেণ্টাইলিস্টদের বিপরীতে, অর্থনৈতিক গবেষণায় জোরটাকে তাঁরা সঞ্চলনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যান উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং তাই পংজিবাদী উৎপাদনের এক বিশ্লেষণের ভিত্তিভূমি স্থাপন করেন, যদিও উৎপাদনের ক্ষেত্রটিকে তাঁরা সীমিত করেন

কৃষির মধ্যে, আর শিল্পকে ভ্রান্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন অর্থনীতির অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রটির মধ্যে।

১৭শ শতাব্দী থেকে ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত কালপর্বটি চিহ্নিত ছিল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের এক আরোহণরত বিকাশ দিয়ে। মুখ্যত তার কারণ ছিল ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী উৎপাদন, বাণিজ্য ও ব্যাংকিংয়ের চাহিদা। এই অবস্থায় দরকার ছিল একক অর্থনৈতিক ইউনিটগুলির পরিবর্তে বরং গোটা এক একটা দেশের পরিসরে অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহ ও বিকাশের সমরূপতাগুলি বিশ্লেষণ করা, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্কের নীতি নির্ধারণ করা এবং রাষ্ট্রের নতুন ভূমিকা নির্ণয় করা, যে রাষ্ট্র বুর্জোয়াদের সম্পদ শুধু রক্ষাই করত না, তার বিবর্ধনে সাহায্যও করত।

সেই কালপর্বে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন উইলিয়ম পেটি (ইংলণ্ড) ও পিয়ের বোয়াগিলবের (ফ্রান্স), তাঁরাই সর্বপ্রথম সূত্রবদ্ধ করেন মূল্যের শ্রম তত্ত্ব। তাঁরা ছিলেন **ক্লাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের** প্রতিষ্ঠাতা, যে অর্থশাস্ত্র তার সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে পৌঁছেছিল স্কটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ আর ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর রচনায়।

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের ক্লাসিকাল ধারার প্রতিনিধিরা বুর্জোয়াদের স্বার্থ ব্যক্ত করেছিলেন এমন এক ঐতিহাসিক কালপর্বে, যখন তারা ছিল উদীয়মান একটি শ্রেণী এবং সংগ্রাম চালাচ্ছিল সামন্ততন্ত্রের

বাণিজ্য, একটি দেশের ভিতরে সামগ্রী সঞ্চলনে শুল্ক, প্রভৃতি তুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাহসিকতাপূর্ণ ব্যবহারিক সুপারিশও করেছিলেন। এই সমস্ত সুপারিশই কার্যত ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও গিল্‌ড নিয়মকানুন তুলে দেওয়ার এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বিনিময়ের বিকাশের অবাধ সুযোগ দেওয়ার দাবি। বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়া শ্রেণী এই সুপারিশগুলিকে বিপুল উৎসাহে স্বাগত জানিয়েছিল ও সমর্থন করেছিল।

কিন্তু সংকীর্ণ বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির দরুন, অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো পুঁজিবাদকে দেখেছিলেন মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ একমাত্র যুক্তিসংগত, ত্রুটিহীন ও চিরন্তন সমাজ-ব্যবস্থা হিসেবে। তার ঐতিহাসিকভাবে অচিরস্থায়ী চরিত্র, শ্রেণী সংগ্রামের সামাজিক শিকড় ও পরিপ্রেক্ষিতগুলি উপলব্ধি করার স্তরে তাঁরা উঠতে পারেন নি।

মার্কস ও এঙ্গেলসই বিকশিত করেন এক সত্যকার বিজ্ঞানসম্মত প্রলেতারীয় অর্থশাস্ত্র, অর্থনীতি-বিজ্ঞানে যা বিপ্লব ঘটিয়েছে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতারা অর্থনৈতিক তত্ত্বের বড় বড় সমস্যার নিষ্পত্তি করেছেন নতুনভাবে, প্রাগ্রসর ও সহজাতভাবে বিপ্লবী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের অবস্থান থেকে, এবং অর্থশাস্ত্রের বিষয়টির এক বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যেখানে ব্যাপারসমূহকে ভাসাভাসাভাবে দেখেছিলেন এবং বস্তুনিচয়ের গতি ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি, সেখানে মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পদ্ধতি

ব্যবহার করেছেন সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের মূলে নিহিত মানুষের মধ্যেকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন ও পরীক্ষা করার জন্য।

বহু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও ইতিহাস-রচয়িতা মার্কসকে রিকার্ডোর সাধারণ শিষ্য বা অনুগামীদের মধ্যে তথা ফয়েরবাখ ও হেগেল, ফুরিয়ে, ওয়েন ও সাঁ-সিমোঁর অনুগামীদের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করে সত্যকে বিকৃত করেন। কিন্তু মার্কস ছিলেন একজন প্রতিভাদীপ্ত শিষ্য, যিনি তাঁর গুরুদের ছাপিয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছেন এবং মানবজাতিকে এক নতুন ঐতিহাসিক যুগে, কমিউনিজমে নিয়ে যাওয়ার পথের নির্দেশ দিয়েছেন। ক্লাসিকাল ধারার প্রতিনিধিদের তুলনায় মার্কস অর্থশাস্ত্রে সারগতভাবে যেসব নতুন উপাদান প্রবর্তন করেছেন সেই সবগুলির এমন কি সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দিতেও দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। স্মিথ ও রিকার্ডো তাঁদের বুর্জোয়া মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ হাতড়াতে-হাতড়াতে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সারমর্ম সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত প্রতিজ্ঞার শুধু রূপরেখাই উপস্থিত করেছিলেন। তাঁদের প্রতিজ্ঞাগুলি 'প্রতিভাদীপ্ত আন্দাজের' চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, পক্ষান্তরে মার্কস সেগুলিকে সর্বপ্রকারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিপাদন ও বিশদ করেছিলেন।

এঙ্গেলস বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন মার্কসের দুটি মহত্তম আবিষ্কারের উপরে, যা তাঁকে সক্ষম করে তুলেছিল মার্কসবাদ নামে যা পরিচিত হয়েছে সেই তত্ত্ব বিকশিত করতে, অর্থশাস্ত্রকে একটি বিজ্ঞানে পরিণত

করতে এবং তাকে শ্রমিক শ্রেণীর সেবায় নিয়োগ করতে: প্রথম, ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি ও দ্বিতীয়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বকে লেনিন অভিহিত করেছিলেন মার্কসবাদের ভিত্তিমূল বলে। আর সেটাই স্বাভাবিক, কেননা উদ্বৃত্ত-মূল্য আবিষ্কার ও তার বহিঃপ্রকাশের বাহ্যিক রূপগুলি নির্বিশেষে (তা মুনাফা, সুদ, জমির খাজনা, প্রভৃতির রূপ ধারণ করতে পারে) তার অন্তঃসার অনুসন্ধানই মার্কসকে সক্ষম করে তুলেছিল পুঁজিবাদের বুনিয়াদি অর্থনৈতিক নিয়ম, উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিয়ম উদ্‌ঘাটিত করতে, যে নিয়ম প্রকাশ করে পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্যকে ও তা অর্জন করার উপায়কে। সেটা উন্মোচিত করেছিল প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার আপোসহীন শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব — যা পুঁজিবাদী শোষণের ব্যবস্থাপ্রণালী দেখিয়ে দিয়েছিল — একটা বুনিয়াদি ভেদরেখা টেনেছিল মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্ব আর বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের মাঝখানে, যে মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বে এই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ রয়েছে যে নতুন সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের দ্বারা পুঁজিবাদ প্রতিস্থাপিত হতে বাধ্য; আর যে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল পুঁজিবাদের যাথার্থ্য প্রতিপাদন ও তাকে স্থায়ী করে রাখা।

'পুঁজিবাদের আত্মপ্রকাশ, বিকাশ ও পতনের অর্থনৈতিক নিয়মগুলি মার্কস আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান যে পুঁজিবাদের বিকাশ ও শ্রেণী সংগ্রামের

সমগ্র ধারাটি এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈষয়িক ও বিষয়ীগত পূর্বশর্তগুলিকে প্রস্তুত করেছে। বৃহদায়তন যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ও বুর্জোয়া শ্রেণীর কবর-খনক শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি ও উন্নয়নশীল সংগঠন এরূপ এক বিপ্লবকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। সুতরাং, পুঁজিবাদের পতন ও সমাজতন্ত্রের জয়লাভের ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতাকে মার্কস প্রতিপাদন করেন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে। পুঁজিবাদের কবর-খনক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্থপতি হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে প্রলেতারিয়েতের ভূমিকা আবিষ্কারই মার্কসের মতবাদের মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর মস্তকে এযাবৎ নিক্ষিপ্ত ভয়ংকরতম ক্ষেপণাস্ত্র

'পুঁজি' ছিল মার্কসের প্রধান রচনা, তা সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে অভিমতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং অর্থশাস্ত্রকে এক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপরে স্থাপন করেছিল। দার্শনিক ও ঐতিহাসিক রচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, 'পুঁজি' মুখ্যত অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদনের দিকে, পুঁজিবাদী বিকাশের অর্থনৈতিক নিয়ম — উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিয়ম আবিষ্কারের দিকে নিয়োজিত।

সত্যকার সেই বিশ্বকোষসুলভ রচনায় মার্কস এক জীবন্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ হিসেবে পুঁজিবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান, তার অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি, তার দুই বিপরীত প্রধান শ্রেণী

প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে বৈরভাব সমেত, পুঁজিপতিদের স্বার্থকে যা সুরক্ষিত করে তার সেই বুর্জোয়া রাজনৈতিক অতিসৌধ সমেত, মুক্তি ও সমতা সম্বন্ধে বুর্জোয়া ধ্যানধারণা সমেত, তার বুর্জোয়া পরিবার, দৈনন্দিন ও অন্যান্য দিক সমেত।

'পুঁজিকে' তাঁর জীবনের প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য করে মার্কস এটির উপরে অধ্যবসায়সহকারে কাজ করেন প্রায় ৪০ বছর ধরে, ১৮৪০-এর দশক থেকে শুরু করে ১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। প্রথম খণ্ডটি ১৮৬৭ সালে মার্কস নিজেই প্রকাশ করেছিলেন, অন্য খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, 'পুঁজি' লেখা ও প্রকাশনার কাজে এঙ্গেলস মার্কসকে প্রচুর সহায়তা করেছিলেন। মার্কসের মৃত্যুর পর, পরবর্তী দুটি খণ্ড সম্পূর্ণ করে প্রকাশনার জন্য তৈরি করতে এঙ্গেলসের ১১ বছরের গুরুতর কাজ দরকার হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে, এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। সেই বিরাট প্রচেষ্টার উচ্চ মূল্যায়ন করে লেনিন লিখেছেন যে 'পুঁজির' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড 'দুজন মানুষের রচনা: মার্কস ও এঙ্গেলসের'।*

১৮৯৫ সালে এঙ্গেলস মারা যান, তাই চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত করে যেতে পারেন নি। 'পুঁজির' সেই খণ্ডটি ১৯০৫-১৯১০ সালে সর্বপ্রথম

---

* V. I. Lenin, 'Frederick Engels', *Collected Works*, Vol. 2, 1977, pp. 25-26.

প্রকাশ করেছিলেন কার্ল কাউটস্কি, যিনি ইচ্ছামতো মূল পাঠকে 'পুনঃরচনা' করেছিলেন, মার্কসবাদের কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞাকে সংশোধন-পরিমার্জন করেছিলেন। সেই জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট ১৯৫৪ থেকে ১৯৬১ সাল এই কালপর্বে 'পুঁজির' চতুর্থ খণ্ড (তিনটি গ্রন্থে) প্রকাশ করে মার্কসের পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত তত্ত্বগত উত্তরাধিকারকে সযত্নে রক্ষা করে।

'পুঁজির' প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদনের এক বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে পুঁজির সঞ্চলন এবং তৃতীয় খণ্ডে আছে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনের এক বিশ্লেষণ, এবং চতুর্থ খণ্ডটি ('উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বসমূহ') হল মার্কসের মহৎ রচনার ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক ও ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক অংশ। 'পুঁজির' উপশিরোনাম ছিল 'পুঁজিবাদী উৎপাদনের এক সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ' এবং সেটা তার অন্তর্বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মেলে। পুঁজিবাদের গতির নিয়ম বিবৃত করার সঙ্গে সঙ্গে তাতে আছে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের এক সমালোচনাত্মক বিচার। তা খুব ভালোভাবেই মিলে গিয়েছিল মার্কসের কর্তব্যকর্মের সঙ্গে: বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতকে একটা তত্ত্বগত অস্ত্র যোগানো। এঙ্গেলস যথার্থভাবেই 'পুঁজিকে'

অভিহিত করেছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর মস্তকে এযাবৎ নিক্ষিপ্ত ভয়ংকরতম ক্ষেপণাস্ত্র বলে।

প্রথম যে বিদেশী ভাষায় 'পুঁজি' অনূদিত হয়েছিল (১৮৭২ সালে) তা ছিল রুশ ভাষা। মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্ব রাশিয়ায় উর্বর জমির উপরে পড়েছিল, দ্রুত শিকড় চালিয়ে দিয়েছিল গভীরে এবং অংকুরিত হয়ে পরিণত হয়েছিল পত্রসমৃদ্ধ মহীরুহে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু

অর্থশাস্ত্রকে একটা বিজ্ঞানে পরিবর্তিত করার নিহিতার্থ ছিল তার বিষয়ের এক যথাযথ সংজ্ঞার্থনির্ণয়। উপরে যা বলা হয়েছে তা থেকে সেই বিষয় সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়, এবং তার অন্তর্বস্তু সম্বন্ধে এক গভীরতর উপলব্ধি লাভে তা সাহায্য করবে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্রের বিষয়টির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক দিকগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হল।

প্রথম, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্র উৎপাদনের কৃৎকৌশলগত দিকটি অধ্যয়ন করার (যা প্রাকৃতিক ও কৃৎকৌশলগত বিজ্ঞানগুলির বিষয়) বদলে বরং উৎপাদনের সামাজিক দিকটি অধ্যয়ন করে। তদবস্থ বৈষয়িক উৎপাদনকে তা পরীক্ষা করে না, বরং পরীক্ষা করে উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেদের মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্ক, উৎপাদনের সামাজিক ব্যবস্থা, তৎসহ

বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের সম্পর্ক, অর্থাৎ বৈষয়িক মূল্য পুনরুৎপাদনের সমস্ত পর্যায়ে সম্পর্কগুলি।

দ্বিতীয়, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্র উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়ায় উৎপাদন-সম্পর্কগুলি অধ্যয়ন করে। উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে তা কৃৎকৌশলগত দিক থেকে অধ্যয়ন করে না, করে উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সেগুলির ঐক্য ও মিথষ্ক্রিয়ায়, অর্থাৎ উৎপাদন-প্রণালীতে সেগুলির স্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই, এমনিতে একটি যন্ত্র হল শ্রমের সাধিত্র, সেটা স্বতই কোনো অর্থনৈতিক বর্গ নয়। কিন্তু যখন তাকে একটা সম্পত্তি-মালিকানার বস্তু হিসেবে দেখা হয়, তখন উৎপাদনে তার ব্যবহার মানুষে-মানুষে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যে সম্পর্কগুলিকে অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। ফলত, উৎপাদন-সম্পর্ক অধীত হয় উৎপাদিকা শক্তিগুলির সঙ্গে ঐক্যে, শেষোক্তের বিকাশের অর্থনৈতিক রূপ হিসেবে।

তৃতীয়, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্র উৎপাদন-সম্পর্ক, বা সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি অধ্যয়ন করে শুধু উৎপাদিকা শক্তিগুলির মিথষ্ক্রিয়াতেই নয়, বরং সেই ভিত্তির উপরে দাঁড়ানো অতিসৌধের সঙ্গেও। অতিসৌধটি অর্থনৈতিক ভিত্তির দ্বারা নির্ধারিত হলেও, অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে তা পরিবর্তী প্রভাব বিস্তার করে, তার বিকাশকে ত্বরান্বিত বা মন্থর করে। যেমন, আজকের দিনের রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ শ্রমজীবী জনগণের উপরে শোষণ নিবিড় করার উদ্দেশ্যে, শ্রম ও

পঁুজির মধ্যে দ্বন্দ্বগুলি কিছুটা প্রশমিত করা ও পঁুজিবাদী ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। স্বভাবতই, সেই হস্তক্ষেপের সারমর্ম ও রূপগুলি সম্বন্ধে একটা প্রগাঢ় উপলব্ধি ছাড়া আজকের দিনের পঁুজিবাদী সমাজের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে বহু গভীর-প্রসারী ব্যাপারই ব্যাখ্যা করা যায় না।

এবং চতুর্থ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্র একটা ঐতিহাসিক বিজ্ঞান, যার বিবেচ্য হল নিয়ত বিকাশমান সমাজ। উৎপাদনের একটি রূপ থেকে আরেকটি রূপে সমাজের উত্তরণের নিয়মগুলি তা বিশদে ব্যাখ্যা করে। পঁুজিবাদের এবং মানুষের উপরে মানুষের শোষণভিত্তিক অন্যান্য বৈরমূলক সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক পরীক্ষিত হয় সেগুলির অভ্যুদয়, বিকাশ ও পতনের দিক দিয়ে।

ইতিহাসে জ্ঞাত পাঁচটি উৎপাদন-প্রণালীকে অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সামাজিক উৎপাদনের নিম্নতর পর্যায়গুলি থেকে উচ্চতর পর্যায়গুলিতে বিকাশকে বিশ্লেষণ করে, এবং শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থাগুলির অভ্যুদয়, বিকাশ ও পতনকে দেখায়। সমগ্র ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা কীভাবে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জয়ের পথ প্রশস্ত করে, তা দেখায়। সমাজবিকাশের প্রগতিশীল ধারা রুদ্ধ বা বিপরীতগামী করার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

অর্থশাস্ত্র প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল **পঁুজিবাদের অর্থশাস্ত্র** হিসেবে, অর্থাৎ, **শব্দটির সংকীর্ণ অর্থে**। তা

খুবই স্বাভাবিক, কেননা ইউরোপে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রতিষ্ঠার সময়ে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের এক স্বতন্ত্র অঙ্গ হিসেবে তা শাখাবিস্তার করেছিল। তার ফলে উদ্ভূত হয়েছিল এই ভ্রান্ত অভিমত যে অর্থশাস্ত্র এমন এক বিজ্ঞান যার উপজীব্য বিষয়টা পুঁজিবাদের মধ্যে, বিশেষত পুঁজিবাদী পণ্য সম্পর্কের মধ্যে ইতিহাসগতভাবে সীমিবদ্ধ। সমাজতন্ত্রে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু কিছু ভুল চিন্তাও সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হয়েছিল। যেমন, বলা হয়েছিল যে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অবস্থায়, যখন উৎপাদন-সম্পর্কগুলি 'পরিষ্কার ও স্বচ্ছ' হয়ে উঠবে, তখন অর্থশাস্ত্র আর দরকার হবে না, এবং তাকে প্রতিস্থাপিত করা যাবে আরেকটি বিজ্ঞান দিয়ে, উৎপাদিকা শক্তিগুলির যুক্তিসহ সংগঠনের মতো। এরূপ এক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ দাঁড়ায় কার্যত সমাজতন্ত্রে বিষয়গত অর্থনৈতিক নিয়মগুলিকে অস্বীকার করা। আর অর্থনৈতিক নিয়মগুলিকে যদি উপেক্ষা করা হয়, তা হলে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের উপজীব্য বিষয়টাই হারিয়ে যায়।

অর্থশাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়ের ঐতিহাসিক কাঠামো ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে গঠন করে **ব্যাপক অর্থে অর্থশাস্ত্র,** যা আদিম-সম্প্রদায়গত থেকে কমিউনিস্ট পর্যন্ত সমস্ত উৎপাদন-প্রণালীকে বেষ্টন করে। এঙ্গেলস একে অভিহিত করেছেন 'সেই সমস্ত অবস্থা ও রূপের বিজ্ঞান, যে অবস্থায় ও রূপে বিভিন্ন মানব-সমাজ উৎপন্ন ও বিনিময় করেছে এবং এই ভিত্তিতে তাদের উৎপাদগুলি

বণ্টন করেছে'।* ব্যাপক অর্থে অর্থশাস্ত্রের অভ্যুদয় মুখ্যত মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। 'পুঁজি' পুঁজিবাদের সুগভীর অধ্যয়নের দিকে কেন্দ্রীভূত হলেও, মার্কস বর্ণনা করেছেন অর্থনীতির প্রাক্-পুঁজিবাদী রূপগুলিও — সামন্ততন্ত্র, ক্রীতদাসপ্রথা ও আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থা, এবং সেগুলির অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও প্রভেদগুলির উপরে জোর দিয়েছেন। সম্মিলিত উৎপাদকদের ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজে অর্থনৈতিক সম্পর্কের অন্তঃসার সম্বন্ধেও তিনি বিজ্ঞানসম্মত পূর্বাভাস করেছিলেন। 'পুঁজি' শুধু পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালীর এক বুনিয়াদি অধ্যয়নই নয়, বরং, কার্যত, রীতিমত এক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্বকোষ, যাতে আছে এমন সব মৌলিক প্রতিজ্ঞা, যেগুলি সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের চারিত্র্য নির্ণয় করে।

ব্যাপকতম অর্থে অর্থশাস্ত্রের গঠন ও বিকাশে লেনিন এক বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তাঁর 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' ও অন্যান্য রচনায় আছে বিরাট উপকরণ-সম্ভার, যাতে রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাসপ্রথার অর্থনীতির, ক্ষুদ্র-পণ্য উৎপাদনের অর্থনীতি, ও রাশিয়ায় এবং অন্যান্য দেশে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রক্রিয়ার চারিত্র্য নির্ণয় করা হয়েছে প্রগাঢ়ভাবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালীকে সর্বপ্রকারে পরীক্ষা করা ছাড়াও, লেনিন পুঁজিবাদের

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, p. 181.

সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের একটি তত্ত্ব বিকশিত করেন। লেনিনের আরেকটি ঐতিহাসিক কৃতিত্ব এই যে তিনি কমিউনিস্ট উৎপাদন-প্রণালীর অর্থশাস্ত্রের মূলনীতিগুলি বিশদ করেছেন।

ব্যাপক অর্থে অর্থশাস্ত্র এক সুসংলগ্ন বিজ্ঞান, তার উপজীব্য বিষয় ও পদ্ধতি সুসংলগ্ন। কোনো এক উৎপাদন-প্রণালীর উৎপাদন-সম্পর্ক, অর্থনৈতিক বর্গসমূহ ও নিয়মগুলি সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তগুলি সেই উৎপাদন-প্রণালীবিশিষ্ট যে কোনো ঐতিহাসিক কালপর্বে ও যে কোনো দেশে প্রযোজ্য। সুতরাং, ধরুন, ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির জন্য, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্যমুক্ত দেশগুলির জন্য, কিংবা ইউরোপ, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জন্য কোনো বিশেষ অর্থশাস্ত্র থাকতে পারে না।

সেই বিষয়টার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া উচিত এই জন্য যে মার্কসবাদের বহু ইদানীন্তন 'খণ্ডনকারী' তাকে এমন একটা মতবাদ হিসেবে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন, যে মতবাদ শুধু পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, পৃথিবীর যেসব বিরাট অঞ্চলে পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিকাশের এরূপ উচ্চ মাত্রায় উপনীত হয় নি সেখানকার বিকাশের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলি তাতে প্রতিফলিত হয় না। এই ধরনের অভিযোগ মার্কসবাদের অর্থনৈতিক তত্ত্ব সমেত মার্কসবাদেরই ইচ্ছাকৃত বিকৃতি, কেননা সেই তত্ত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার ভিত্তিতে ঘটমান বিষয়গত

প্রক্রিয়াগুলির সারমর্ম প্রদর্শন করে, এবং পুঁজিবাদের গঠনের সময় থেকে, তার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বক্ষণ তার চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদী পর্যায় পর্যন্ত পুঁজিবাদের সমরূপতাগুলিকে তুলে ধরে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ কখনোই এই সম্ভাবনা অস্বীকার করে নি যে অনুকূল ঐতিহাসিক অবস্থায় কোনো কোনো দেশ পুঁজিবাদী বিকাশের পর্বটিকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে কিংবা এমন কি তার পাশ কাটিয়ে যেতে পারে। অনেকগুলি দেশের ইতিহাস এই সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করেছে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিতর্কাতীত আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিকতাও প্রতিপাদন করেছে।

অতএব, **মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্রের উপজীব্য বিষয় হল উৎপাদন-সম্পর্কব্যবস্থার ঐতিহাসিক পারম্পর্য, অর্থাৎ, মানুষে-মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক পারম্পর্য। যে অর্থনৈতিক নিয়মগুলি সমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজে বৈষয়িক মূল্যগুলির উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগকে নির্ধারণ করে, অর্থশাস্ত্র সেগুলিকে অধ্যয়ন করে।** সামাজিক উৎপাদনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি, যা সমস্ত রাজনৈতিক, দার্শনিক, ভাবাদর্শগত, ব্যবহারশাস্ত্রগত, নান্দনিক ও অন্যান্য অভিমত ও মতপ্রত্যয়ের ভিত্তি তা অধ্যয়ন করে। সেই জন্যই অর্থশাস্ত্র পদ্ধতিতত্ত্বগত ভিত্তি যোগায় অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিজ্ঞানকে (ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক কর্মনীতি, পরিসংখ্যান, সুনি-

র্দিষ্ট অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু, ব্যবহারশাস্ত্র, ইত্যাদি), যার প্রত্যেকটির আছে নিজেস্ব গবেষণার বিষয়। অর্থশাস্ত্রের টানা তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতেই এই সমস্ত বিজ্ঞান জাতীয় অর্থনীতিতে ও তার বিভিন্ন শাখায় ঘটমান অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহ, অর্থনৈতিক নিয়মগুলির মূর্ত বহিঃপ্রকাশসমূহ অধ্যয়ন করে, এবং ব্যবহারিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি বিশদ করে।

মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ ও তার প্রগাঢ়তম, সর্বাঙ্গীণ ও বিশদ প্রতিপাদন ও ব্যবহারই মার্কসবাদের প্রধান অন্তর্বস্তু। সেটা আসে ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি থেকে, গবেষণার বিষয়টির খোদ চরিত্র থেকেই।

বুর্জোয়া গবেষকদের দৃষ্টিতে অর্থশাস্ত্রের বিষয়

ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্রবিদরা, বিশেষত অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো, অর্থশাস্ত্রকে অর্থনৈতিক কর্মনীতি থেকে পৃথক করেছিলেন এবং বৈষয়িক মূল্যসমূহের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের বিকাশের আভ্যন্তরিক, 'প্রাকৃতিক' নিয়মগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তখনও অর্থশাস্ত্রকে দেখেছিলেন 'সম্পদের' বিজ্ঞান হিসেবে। তাই, অ্যাডাম স্মিথের প্রধান রচনাটির নাম 'Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'. 'বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের যেটা বৈশিষ্ট্যসূচক, 'সম্পদ' সম্বন্ধে এই রকম একটা সাধারণ, অনৈতিহাসিক ধারণা অর্থহীন, কেননা তা কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার

প্রতিফলন ঘটায় না এবং গবেষণাকে সীমাবদ্ধ করে গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তে বরং পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রটির মধ্যে।

'সম্পদ' সম্বন্ধে অনৈতিহাসিক ধারণা, পুঁজিবাদের চিরন্তনতার অনুমিতি থেকে যা উদ্ভূত, তা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের খুব ভালোই কাজে লাগে। বুর্জোয়া সমাজের বিপরীত মেরুগুলিতে সম্পদ ও দারিদ্র্যের কেন্দ্রীভবনকে অস্পষ্ট করে দিতে তা সাহায্য করে, পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ও শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে 'সম্পদের' ধারণাটি বিশ্লেষণ করলে সম্পদের অন্তর্বস্তু ও তার বিবর্ধনের উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা দেখতে পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন আদিম মানুষের কাছে সম্পদ বলতে বোঝাত একটা পাথরের সাধিত্র, যেটাকে সে খাদ্য যোগাড় করার জন্য ব্যবহার করতে পারত। দাস-মালিকের কাছে সম্পদ বলতে বোঝাত বিরাট সংখ্যক ক্রীতদাস। বুর্জোয়া সম্পদকে কল্পনা করে সংভার আর শেয়ার হিসেবে, যা থেকে বিপুল ডিভিডেন্ড পাওয়া যায় এবং যা তাকে তেল বা ইস্পাত উদ্যোগগুলির মালিক হওয়ার অধিকার দেয়। সামরিক-শিল্প সমাহারের প্রতিনিধি, আজকের দিনের অস্ত্র প্রস্তুতকারকের কাছে সম্পদের মানে হল এমন অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল মজুত উৎপন্ন করার সম্ভাবনা, যেগুলি মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারে। তার বিপরীতে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পদের প্রকৃত পরিমাপ হল মানুষ স্বয়ং, তার প্রতিভা, শ্রমশীলতা, সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরণা ও নৈতিক বিশুদ্ধতা।

পুঁজিবাদের বিকাশ ও তার দ্বন্দ্বগুলি জটিল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রকে স্থূল ও বিকৃত করা হয় এবং তার বিষয় সম্পর্কে অভিমতই তদনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। যেমন, অথাকথিত ঐতিহাসিক ধারার প্রতিনিধিরা (ভিলহেল্ম রশার, ব্রুনো হিলডেব্রান্ড, কার্ল ক্লাইস, প্রমুখেরা) মনে করতেন যে অর্থশাস্ত্র হল 'জাতীয় অর্থনীতির' বিজ্ঞান এবং এর উদ্দেশ্য হল জাতীয় অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রূপগুলি বর্ণনা করা, তার বিভিন্ন শাখার কল-কব্জা আর প্রযুক্তি অধ্যয়ন করা। ভাষান্তরে, ভাসা-ভাসা অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহের বর্ণনাকেই উৎপাদন-সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক নিয়ম অধ্যয়নের প্রতিকল্প হিসেবে স্থাপন করা হয়েছিল।

'প্রান্তিক উপযোগিতার' তত্ত্ব যাঁরা সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, সেই অস্ট্রীয় ধারার প্রতিনিধিরা (ইউজেন বোম-বাওয়ের্ক, কার্ল মেঙ্গের, উইলিয়ম জেভনস ও অন্যান্যরা) অর্থশাস্ত্রের বিষয়টা দেখেছিলেন বস্তুসমূহের প্রতি লোকের মনোভাবের মধ্যে, এই বস্তুগুলির উপযোগিতার বিষয়ীগত মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়নের মধ্যে। ভাষান্তরে, গবেষণা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল মানুষে-মানুষে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তে অর্থনৈতিক কারকটির মানসিকতার উপরে।

কিন্তু মানুসের মানসিকতা চৈতন্যের একটি রূপ বলে নিজেই নির্ধারিত হয় সমাজে জীবনের বৈষয়িক অবস্থা দিয়ে, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে। অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলি বোঝার মূল চাবিকাঠিটা মানুষের

মানসিকতার মধ্যে নেই, রয়েছে বিষয়গত অর্থনৈতিক নিয়মগুলির বিজ্ঞানসম্মত অবধারণার মধ্যে।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যেকার আভ্যন্তরিক সম্পর্ককে বিদীর্ণ করতে চান এটা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যে বণ্টনের ক্ষেত্রটির নিয়মন ঘটিয়ে বুর্জোয়া আর শ্রমিকদের শ্রেণী স্বার্থের 'সামঞ্জস্যবিধান' করা সম্ভব পুঁজিবাদী উৎপাদনের বনিয়াদ পরিবর্তিত না করেই। সেই উদ্দেশ্যে, বহু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ অর্থশাস্ত্রকে গণ্য করেন এমন এক বিজ্ঞান হিসেবে যা জনগণের ক্রিয়াকলাপ অধ্যয়ন করে, যে ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য হল তাদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈষয়িক মূল্যগুলি অর্জন করা। তাই, অর্থশাস্ত্রের কেম্ব্রিজ ধারার প্রতিষ্ঠাতা আলফ্রেড মার্শাল ও অন্যান্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ মানুষে-মানুষে উৎপাদন-সম্পর্ককে একটি বস্তু ও তার উপযোগিতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রতিকল্প হিসেবে স্থাপন করেন, এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে গণ্য করেন মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ভোক্তার উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে।

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে সামাজিক ধারাটা তার প্রধান বিষয়কে খুঁজে পায় অর্থনীতির সামাজিক রূপের মধ্যে, যার অর্থ হল মানুষে-মানুষে ব্যবহারশাস্ত্রগত ও নীতিশাস্ত্রগত সম্পর্ক। কিন্তু এই সম্পর্কগুলি অতিসৌধের অন্তর্গত, অর্থনৈতিক ভিত্তির নয়। সেগুলি হল উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা মানুষে-

মানুষে বস্তুগত, বিষয়গত অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভাবাদর্শগত প্রতিফলন মাত্র।

আজকের দিনের বহু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ কার্যত অর্থশাস্ত্রকে প্রতিস্থাপিত করেছেন অর্থনৈতিক কর্মনীতি দিয়ে। নিয়মন-কৃত অর্থনীতির আধুনিক বুর্জোয়া ধারার প্রতিষ্ঠাতা, জন মেনার্ড কেইনস অর্থশাস্ত্রকে দেখেন 'পুঁজিবাদকে আপৎকালীন সাহায্য' দেওয়ার 'এক প্রস্তু উপায় ও সাধিত্র' হিসেবে, অর্থনৈতিক কর্মনীতিগত ব্যবস্থাবলী রূপায়ণের 'কলা' হিসেবে।

চলমান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অবস্থায় যা বিকাশলাভ করে চলেছে, আজকের দিনের সেই বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে প্রযুক্তিগত ধারাটিরও বৈশিষ্ট্যসূচক হল অর্থশাস্ত্রের বিষয় সম্বন্ধে এক অবৈজ্ঞানিক উপলব্ধি। প্রযুক্তিগত ধ্যানধারণার তাত্ত্বিকরা অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও নিয়মগুলিকে গণ্য করেন বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতির নিছক প্রতিফলন বলে। প্রযুক্তিকে তাঁরা দেখেন এক আত্ম-বিবর্ধমান সত্তা হিসেবে, যার গতিবিধি আজকের পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি সৃষ্টি করে। তাঁরা বলেন, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতি যেহেতু এত দ্রুত, সেই হেতু পুঁজিবাদের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন বিকাশের সুযোগ, পুঁজিবাদ রূপান্তরিত হচ্ছে আরও ত্রুটিহীন এক সমাজে, কোনোরূপ শ্রেণী দ্বন্দ্ববিহীন এক সমাজে। এ থেকেই এসেছে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের

'সমকেন্দ্রতা'-র (পরস্পরের আরও কাছাকাছি আসার) তত্ত্ব, তাদের মধ্যেকার প্রভেদগুলিকে বাতিল করা হয় এই বলে যে সেগুলি অপরিহার্য নয়, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত অভিমতে পার্থক্যই তার একমাত্র কারণ, সেগুলি সহজেই কাটিয়ে ওঠা যায়।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য উদ্দিষ্ট আধুনিক অর্থশাস্ত্র বিষয়ক পাঠ্যবই ও বিধিগ্রন্থে সাধারণত সমাজতত্ত্ব, আইন, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও অন্যান্য বিজ্ঞানের উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থশাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়টির এই ধরনের 'সম্প্রসারণ' সেকেলে অচল বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক অধ্যয়ন করা থেকে অর্থনীতি বিজ্ঞানকে কার্যত বিপথচালিত করে।

অধিকন্তু, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এখন 'অর্থশাস্ত্র' কথাটিই পুরোপুরি বর্জন করতে চান, তার বদলে বিজ্ঞানটিকে 'অর্থনীতি' (ইংরেজি ভাষায় — *economics)* নামে অভিহিত করা পছন্দ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুপরিচিত মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল এ. স্যামুয়েলসন-লিখিত একটি বিধিগ্রন্থের নামও তাই। 'অর্থনীতি তত্ত্ব কী' শীর্ষক একটি অনুচ্ছেদে লেখক বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়ের কয়েকটি বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞার্থের তালিকা দিয়েছেন।

'১. অর্থনীতি তত্ত্ব হল সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সমীক্ষা, যেগুলির সঙ্গে জড়িত অর্থ সহ বা অর্থ ছাড়া মানুষের মধ্যে বিনিময়মূলক লেনদেন।

'২. অর্থনীতি তত্ত্ব হল মানুষ কীভাবে দুর্লভ বা

সীমিত উৎপাদনী সহায়-সম্পদ (জমি, শ্রম, যন্ত্রপাতির মতো উৎপাদনী সামগ্রী ও কৃৎকৌশলগত জ্ঞান) ব্যবহার করে যাতে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী (যেমন গম, গোমাংস, ও ওভারকোট; কনসার্ট, রাস্তা, বোমারু বিমান ও প্রমোদতরণী) উৎপন্ন করতে এবং সমাজের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে তাদের ভোগের জন্য বণ্টন করতে পছন্দ করে, তার সমীক্ষা।

'৩. অর্থনীতি তত্ত্ব হল জীবনের সাধারণ কাজকর্মে, জীবিকা উপার্জন ও উপভোগের মধ্যে মানুষের সমীক্ষা।

'৪. অর্থনীতি তত্ত্ব হল মানবজাতি কীভাবে তার ভোগ ও উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করার কাজে প্রবৃত্ত হয়, তার সমীক্ষা।

'৫. অর্থনীতি তত্ত্ব হল সম্পদের সমীক্ষা।'*

আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থশাস্ত্র একটা বিনিময়ের বিজ্ঞান বলে মার্কেণ্টাইলীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে, এবং সম্পদের বিজ্ঞান বলে অ্যাডাম স্মিথের অভিমতের সঙ্গে এই সংজ্ঞার্থগুলির অনেক মিল আছে। সেগুলিতেও প্রতিফলিত হয় আজকের দিনের সেই অর্থনীতিবিদদের অভিমত যাঁরা মনে করেন যে অর্থনীতি বিজ্ঞান ব্যবসায়ীদের উৎপাদন ও শ্রম, উৎপাদসমূহের বিপণন, আর্থিক ও ক্রেডিট সংক্রান্ত বিষয়, প্রভৃতি সংগঠিত করার উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ দেয়।

---

* Paul A. Samuelson, *Economics*, McGraw-Hill Book Company, Tokyo, 1973, p. 3.

স্যামুয়েলসন অর্থনীতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর নিজের সংজ্ঞার্থটিও দিয়েছেন: 'অর্থনীতি হল মানুষ ও সমাজ কীভাবে, অর্থ ব্যবহার করে অথবা না করে, যে সমস্ত দুর্লভ উৎপাদনী সহায়-সম্পদের বিকল্প ব্যবহার থাকতে পারত সেগুলি নিয়োগ করতে, বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করতে ও এখন বা ভবিষ্যতে ভোগের জন্য সমাজে বিভিন্ন মানুষ ও গোষ্ঠীর মধ্যে সেগুলি বণ্টন করতে শেষ পর্যন্ত পছন্দ করে নেয়, তার সমীক্ষা।'* অতএব, অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটিকে — মানুষে-মানুষে উৎপাদন-সম্পর্ক -- স্যামুয়েলসন বাদ দেন এবং অগ্রাধিকার দেন 'দুর্লভ উৎপাদনী সহায়-সম্পদের' সমস্যাটিকে, অর্থাৎ নানান বস্তু ও বিষয়ীগত মূল্যায়নকে।

স্যামুয়েলসনের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে নতুন কিছু নেই, ঠিক যেমন নেই আমাদের কালের অন্যান্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে। অর্থনীতি বিজ্ঞানকে তিনি সামাজিক সম্পর্ক অধ্যয়নের দিক থেকে ভিন্নপথচালিত করতে চেষ্টা করেন, তাকে অর্থনৈতিক জীবনের এক বিশ্বজনীন বিজ্ঞানে ও জরুরি মানবিক চাহিদা পূরণের উপায়ে পরিণত করে বুর্জোয়াদের পক্ষে তাকে আপদমুক্ত করতে চেষ্টা করেন।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের প্রণীত বিধিগ্রন্থগুলি

* Ibid., p. 5.

অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী। তাঁদের কেউ কেউ অবাধ বাজার আর অবাধ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওকালতি করেন, বিদ্যমান বা প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা বর্ণনা করার জন্য নানা ধরনের বক্ররেখা ভেবে বার করেন। এই বক্ররেখাগুলির মূলকেন্দ্র হল অর্থনৈতিক কারকটি, যে এক ধরনের সামগ্রী বা কৃত্যক অথবা-অন্য ধরনের সামগ্রী বা কৃত্যক পছন্দ করে, এবং এই পছন্দগুলির পরস্পরগ্রন্থনকে ব্যবহার করা হয় বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে।

অন্য লেখকরা মনে করেন যে এই ধরনের একটা অর্থনৈতিক ইউনিটের দিন বহুকাল আগে বিগত হয়েছে, অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলি, এবং তাই বাজারের নিয়মন ঘটানো যেতে পারে রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে। তদনুযায়ী, তাঁরা এমন সব তত্ত্ব সূত্রবদ্ধ করেন, যেগুলি চেষ্টা করে মুনাফা, সুদ আর পুঁজির গতিবিধিকে কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করতে। চিন্তাটা এই যে অর্থনীতির মধ্যে আরও অর্থ প্রবিষ্ট করিয়ে কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব এবং বেকারি কমানো, কিংবা এমন কি পুরোপুরি দূর করাও সম্ভব। তবে এ কথা সত্যি যে এই সমস্ত তত্ত্বের প্রণেতারা ব্যাখ্যা করতে পারেন না কেন ১৯৭০-এর দশকের শেষে ও ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছিল বেকারির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে হাত মিলিয়ে।

অর্থশাস্ত্রের উপজীব্য বিষয় সম্বন্ধে বুর্জোয়া গবেষকদের দেওয়া সংজ্ঞার্থগুলি যত বহুবিধই হোক

না কেন, সব কটিরই কতকগুলি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের প্রকৃতিটাই তার হেতু; বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল পুঁজিপতিদের সেবা করা এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। সব কটিরই লক্ষ্য হল অর্থশাস্ত্রকে ভাসা-ভাসা ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা, এবং সমসাময়িক পুঁজিবাদী সমাজে বিকাশমান প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলি পরীক্ষা ও আবিষ্কার করা থেকে তাকে নিবৃত্ত করা। তাঁরা তাঁদের গবেষণা কর্মের জোরটাকে সরিয়ে নিয়ে যান উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বণ্টন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে, এগুলিকে একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করেন এবং বৈষয়িক উৎপাদন ও বিনিময়ের প্রক্রিয়াগুলির প্রযুক্তিগত দিকটির উপরে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন, যদিও সেই দিকটি কৃৎকৌশলগত ও প্রাকৃতিক জ্ঞানের বিষয় বলেই সুবিদিত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে বুর্জোয়া গবেষকরা পুঁজিবাদী সমাজকে গণ্য করেন স্বাভাবিক, চিরন্তন ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে সবচেয়ে মানানসই বলে।

বুর্জোয়া অবস্থান থেকে

অর্থশাস্ত্রের উপজীব্য বিষয় সম্বন্ধে অভিমত নির্ধারিত হয় রচয়িতাদের শ্রেণী অবস্থান দিয়ে, কেননা অর্থশাস্ত্র মানবিক সম্পর্কের এমন একটি ক্ষেত্র অধ্যয়ন করে, যা বহুবিধ শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর মৌলিক

অর্থনৈতিক স্বার্থকে প্রভাবিত করে, এই শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির অবস্থানগত মর্যাদা এক এক সমাজে এক এক রকম। মানুষের উপরে মানুষের শোষণভিত্তিক বৈরমূলক সমাজগুলিতে কিছু লোক শোষিত হয়, অন্য কিছু লোক তাদের শ্রমের ফলগুলি উপযোজন করে, আবার অন্য কিছু লোক অধিকার করে থাকে এক মধ্যবর্তী, অস্থিতিশীল অবস্থান। স্বভাবতই, কোনো এক বা অপর সমাজব্যবস্থার মূল্যায়নে বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর পার্থক্য থাকে, কখনও কখনও তারা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মজুরি-শ্রমিক পুঁজিবাদী শোষণকে পাশবিক ও অন্যায় বলে গণ্য করে, এবং শোষণহীন অন্য ও ন্যায্যতর সমাজব্যবস্থার উত্তরণে সে আগ্রহী, পক্ষান্তরে বুর্জোয়া আগ্রহী মজুরি-শ্রম শোষণে, কেননা তা তাকে প্রচুর মুনাফা পেতে ও বিলাসময় জীবন যাপন করতে সক্ষম করে তোলে। পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর সদস্যদের পক্ষে, যেমন কৃষক ও হস্তশিল্পীদের পক্ষে, ব্যাপারটা আলাদা; নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হয়, তারা সর্বস্বান্ত হওয়ার ভয়ে সর্বদাই ভীত, এবং ব্যাঙ্ক, ভূস্বামী ও বড় উদ্যোগপতিদের উপরে প্রচণ্ডভাবে নির্ভরশীল। কৃষক, হস্তশিল্পী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র-পণ্য উৎপাদকের দুটি আত্মা ধরনের একটা কিছু আছে: এক দিকে, মেহনতি মানুষ এবং অন্য দিকে, তারা সম্পত্তি-মালিক ও ব্যবসায়ী। সেই জন্যই প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়া শ্রেণীর মাঝখানে তারা দোদুল্যমান থাকে।

বৈরি নানান শ্রেণীতে বিভক্ত এক শ্রেণীভিত্তিক সমাজে অখন্ড কোনো অর্থশাস্ত্র থাকতে পারে না। তার একটা শ্রেণী' চরিত্র থাকতে বাধ্য, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থ প্রকাশ করতে তা বাধ্য। বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাবাদর্শবিদরা একটা বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র সৃষ্টি করে, তাতে অভিব্যক্ত হয় পুঁজিবাদী সমাজের শাসক শ্রেণী বুর্জোয়াদের স্বার্থ। পুঁজিবাদী সমাজের দুটি প্রধান শ্রেণী — প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়ার মধ্যে যারা এক মধ্যবর্তী অবস্থান অধিকার করে থাকে, জনসমষ্টির সেই পেটি-বুর্জোয়া বর্গের (কৃষক, হস্তশিল্পী, প্রভৃতি) স্বার্থ অভিব্যক্ত হয় পেটি-বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে। আর শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ অভিব্যক্ত হয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্রে। অর্থশাস্ত্র কতটা বিজ্ঞানসম্মত ও অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলির অন্তঃসারের মধ্যে কত গভীরভাবে তা প্রবেশ করে, সেটা নির্ভর করে কোন শ্রেণীর স্বার্থকে সে প্রকাশ করছে তার উপরে।

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল ১৮শ শতাব্দীর শেষ ও ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর রচনায়, কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি, প্রলেতারিয়েতের অভ্যুদয় আর প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব জটিল হয়ে উঠতে থাকায়, তার অধঃপতন হয়ে পরিণত হয়েছিল ইতর, সাফাই-গাওয়া অর্থশাস্ত্রে। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে ওঠে তখন। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা খোলাখুলি পুঁজিবাদী

ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন করতে থাকেন, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের আগেকার কৃতিত্বগুলির স্থূলতাসাধন করে তাকে বিকৃত করেন। মার্কসের 'পুঁজি' প্রকাশিত হওয়ার পর সেই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়; ক্রয়যোগ্য বুর্জোয়া ভাড়াটে লেখকরা 'পুঁজিকে' প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছিল।

টমাস আর. ম্যালথাস, জাঁ বাপতিস্ত সে, জেমস মিল, জন রামসে ম্যাককুলোক, ইউজেন বোম বাওয়েরক, নাসাউ উইলিয়ম সিনিয়র, ফ্রেদেরিক বাস্তিয়া, আলফ্রেড মার্শাল, জন মেনার্ড কেইনস, পল এ. স্যামুয়েলসন, ওয়াল্ট ডবলিউ. রস্টো, প্রভৃতিরা যার প্রতিনিধিত্ব করেন সেই ইতর অর্থশাস্ত্রের প্রধান কাজ হল বৈজ্ঞানিক সত্যের অন্বেষণ করার পরিবর্তে বরং পুঁজিবাদের সাফাই গাওয়া ও মাহিমাকীর্তন করা। তাঁদের গবেষণা আদৌ অভিনব কিছু নয় এবং প্রায়শই পুরনো তত্ত্বগুলি দিয়ে প্রস্তুত একটা বস্তু, যেসব তত্ত্ব মার্কসবাদ বহু দিন আগেই খণ্ডন করেছে। অভ্যন্তরিক সম্বন্ধগুলি পরীক্ষা করার পরিবর্তে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা ভাসা-ভাসা অগভীর ব্যাপারগুলি বর্ণনা করাই পছন্দ করেন, ব্যাপারগুলির বাহ্যিক রূপকে উপস্থিত করেন সেগুলির অন্তঃসার হিসেবে।

আজকের দিনের বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র হল একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রবক্তা। এর প্রতিনিধিরা শ্রমজীবী জনগণকে বোঝাতে চান যে পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই তার অন্তঃসারকে পরিবর্তিত করেছে এবং বিবর্তিত হয়েছে জনগণের পুঁজিবাদে, যেখানে সামাজিক বৈরভাবের

জায়গায় এসেছে শ্রেণী শান্তি। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে চিত্রিত করা হয় সামূহিক প্রাচুর্যের স্থপতি হিসেবে, শ্রেণীসমূহের ঊর্ধ্বে এমন এক শক্তি হিসেবে যা পুঁজিবাদের মন্দ ও দ্বন্দ্বগুলি বিদূরিত করতে পারে। সমরবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলির যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য অনেক কিছুই করা হচ্ছে।

পুঁজিবাদের পক্ষ সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ চালিয়েছেন। তাঁদের মতে, সমাজতন্ত্র একটা 'ঐতিহাসিক বিপথগামিতা', সমাজবিকাশের 'স্বাভাবিক' প্রক্রিয়াকে মুচড়ে বিকৃত করার সহিংস প্রচেষ্টার ফল। তাঁদের প্রধান ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক অস্ত্র হল কমিউনিজমবিরোধিতা ও সোভিয়েতবিরোধিতা, যা রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এ সবই বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের সুস্পষ্ট শ্রেণী চরিত্র প্রকাশ করে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা অবশ্য অর্থশাস্ত্রের শ্রেণী চরিত্রের কথাটা প্রবলভাবে অস্বীকার করেন, বলেন যে তাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন অপক্ষপাত 'বৈজ্ঞানিক' গবেষণায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পল এ. স্যামুয়েলসন লিখেছেন: 'রিপাবলিকানদের জন্য একটা আর ডেমোক্র্যাটদের জন্য একটা, শ্রমিকদের জন্য একটা আর মালিকদের জন্য একটা অর্থনীতির তত্ত্ব নেই।'* স্যামুয়েলসনের সঙ্গে এই বিষয়ে আমরা একমত হতে বাধ্য যে রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটদের জন্য আলাদা আলাদা অর্থনৈতিক

---

* Paul A. Samuelson, op. cit., p. 7.

তত্ত্ব থাকতে পারে না, কেননা তারা বৃহৎ পুঁজির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু শ্রমিক ও মালিকরা সেই একই অর্থনৈতিক তত্ত্বের অংশীদার, তাঁর এই বক্তব্য সত্য থেকে বহু দূর।

সেই সঙ্গে, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রকে 'মার্কসীয়করণ' করার চেষ্টাও চালানো হচ্ছে, চেষ্টা করা হচ্ছে, বলা যেতে পারে 'দুই-স্তর' বিশিষ্ট এক অর্থশাস্ত্র সৃষ্টি করার, যার প্রথম স্তরটি গঠিত হবে মার্কসবাদ দিয়ে কিংবা তার বৈপ্লবিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ-বর্জিত শুধু তার অর্থনৈতিক মতবাদ দিয়ে, এবং দ্বিতীয়, স্তরটি গঠিত হবে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র দিয়ে। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের প্রথম পর্যায়ে, খুব সামান্য কয়েকজনই অর্থনীতিবিদ ছিলেন যাঁরা বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের 'মার্কসীয়করণ' চেয়েছিলেন, পক্ষান্তরে ১৯৭০-এর দশকে, সংকট যখন তীব্র হয়েছিল এবং শক্তিসাম্য সমাজতন্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়ে চলছিল, তখন সংকটের নিরসন করার প্রচেষ্টায় মার্কসবাদ ও বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের এক 'সংশ্লেষণের' পক্ষপাতী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। যেমন, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ এ. হেইনস 'বিজ্ঞানে বিপ্লবের' মধ্য দিয়ে এক 'নতুন অর্থশাস্ত্রের' বিকাশ ঘটানোর আহবান জানিয়েছিলেন; একে তিনি দেখেছিলেন রিকার্ডো, মার্কস, কেইনস ও নয়া-ক্লাসিকদের তত্ত্বগুলিতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার একটা সংশ্লেষণ হিসেবে। এ সবই বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের দেউলিয়াপনা প্রদর্শন করে।

পেটি-বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। বৃহদায়তন পুঁজিবাদী যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকায়, ক্ষুদ্র উৎপাদকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পরিণত হয়েছিল প্রলেতারিয়েতে — পুঁজিবাদী শোষণের লক্ষ্যবস্তুতে। সেটাই জন্ম দিয়েছিল পেটি-বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের, যা প্রকাশ করে হতাশাগ্রস্ত ক্ষুদ্র মালিক ও উৎপাদকদের ভাবাদর্শ, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে প্রত্যাবর্তনের এবং যে কোনো উপায়ে তার ধ্বংসকে ঠেকানোর জন্য তাদের বাসনাকে।

পেটি-বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুইশ অর্থনীতিবিদ জাঁ সিসমন্দি, তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সে পিয়ের-জোসেফ প্রুধোঁ, ইংলণ্ডে জন গ্রে, আর রাশিয়ায় নারোদনিকরা। পেটি-বুর্জোয়া অবস্থান থেকে পুঁজিবাদের সমালোচনা করে এই অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদের এই ধরনের সব মন্দ দিকগুলি উদ্ঘাটিত করেছিলেন, যেমন — ক্ষুদ্র উৎপাদকদের (কৃষক, ছোট শিল্পপতি ও কারবারি) ব্যাপক ও বেদনাদায়ক সর্বনাশ, অর্থনৈতিক নৈরাজ্য, ব্যাপক জনসাধারণের নিঃস্বভবন। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের দ্বন্দ্বগুলির সারমর্ম বুঝতে পারেন নি বলে, কিংবা সেগুলির বৈপ্লবিক সমাধান দেখতে পান নি বলে, তাঁরা ক্ষুদ্র উৎপাদনকে আদর্শায়িত করেছিলেন, যে ক্ষুদ্র উৎপাদন বস্তুত উৎপাদনের এক পশ্চাৎপদ রূপ এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে বাধা দেয়। তাঁরা বোঝেন নি যে ক্ষুদ্র-পণ্য উৎপাদনই পুঁজিবাদের

স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ভিত্তি। তাঁদের মতবাদ ইউটোপীয় ও প্রতিক্রিয়াশীল। পেটি-বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের এখনকার প্রতিনিধিরা ক্ষুদ্র উৎপাদকদের ধ্বংসসাধক একচেটিয়া সংস্থাগুলির সর্বাত্মক ক্ষমতার সমালোচনা করেন, কিন্তু তাঁদের আদর্শ হল হস্তক্ষেপমুক্ত অবাধ পুঁজিবাদ।

প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয় এই যে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে তথাকথিত র‍্যাডিকাল অর্থশাস্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটতে দেখা গিয়েছিল, যেটা বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের সংকট, একচেটিয়া সংস্থাগুলির আধিপত্য, ব্যাপক ছাত্র ও যুব আন্দোলন, এবং বিশ্ব সমাজতন্ত্রের সাফল্যগুলির এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়াজনিত সাড়া। র‍্যাডিকাল অর্থশাস্ত্রের স্থানটি মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র আর উদারনৈতিক বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের মাঝামাঝি। এর প্রতিনিধিরা নিজেদের অভিহিত করেন 'মানবিকবাদী মার্কসবাদী' বলে। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে তাঁরা বুর্জোয়া অবস্থান থেকে একপাশে সরে গেছেন, এবং তাঁরা একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিভিন্ন দিকের সমালোচনা করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে 'মানবিকবাদী সমালোচনা' চালান, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিপ্লবী পদ্ধতি থেকে নিজেদের নিঃসংস্রব রাখেন, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী কর্মব্রত অস্বীকার করেন এবং মামুলি সংস্কারকর্মের ওকালতি করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের তত্ত্ব ও কর্মপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদদের

সমস্বর সমালোচনায় র‍্যাডিক্যালরাও আরও বেশি করে গলা মেলানোর প্রবণতা দেখান। 'নয়া-মার্কসবাদী' নামধারী বহুবিধ বামপন্থী গোষ্ঠী আর আদর্শভ্রষ্টরাও র‍্যাডিকাল অর্থশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ।

শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান থেকে

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্র হল একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত, পুরোপুরি সুসংগত ও বৈপ্লবিক অর্থশাস্ত্র, যা মানবজাতির সমাজপ্রগতির শিখরদেশে যাওয়ার পথকে আলোকোদ্ভাসিত করে। তার পক্ষভুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি তার কঠোর বিজ্ঞানসম্মত চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার কারণ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্র নির্ভর করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী পদ্ধতির উপরে, যার ফলে উৎপাদন-সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক নিয়মগুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। তা এই কারণেও বিজ্ঞানসম্মত যে তা যাত্রা শুরু করে সমাজের সবচেয়ে বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শ্রেণী, সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রকৃত নিয়মগুলির অবধারণা যার পক্ষে জীবনমরণের বিষয় সেই শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী-অবস্থান থেকে। শ্রমিক শ্রেণীর বুনিয়াদি অর্থনৈতিক স্বার্থগুলি সমাজপ্রগতির স্বার্থের সঙ্গে, মানবসমাজের কমিউনিজমে বিকাশের বিষয়গত নিয়মের সঙ্গে মিলে যায়।

লেনিনের রচনাগুলি মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের সমস্যাবলীর প্রতি শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গির এক তুলনাহীন

দৃষ্টান্ত। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা যে কথা বলেছিলেন, তাঁদের তত্ত্ব একটা আপ্তবাক্য নয়, বরং কর্মের পথনির্দেশ, এবং লেনিন ঠিক সেইভাবেই তাকে দেখেছিলেন। মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বকে লেনিন বিকশিত করেছিলেন এবং ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন তার বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যারা তাকে বিকৃত করেছিল ও তার বিপ্লবী সারবস্তুকে নির্বীর্য করতে চেয়েছিল তাদের সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

লেনিন তাঁর বুনিয়াদি রচনা, 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' (১৮৯৯) ও অন্য অনেক রচনায় ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে শ্রেণী শক্তিগুলির ভারসাম্যের এক প্রগাঢ় বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন, শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালনাধীনে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে এক মৈত্রীজোটের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেছিলেন এবং রাশিয়ায় পুঁজিবাদী বিকাশের সাধারণ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিয়েছিলেন।

১৯শ শতাব্দীর শেষ দিকে পুঁজিবাদ প্রবেশ করেছিল তার সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে, সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদের ধারা বহন করে লেনিনই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থে, যেটি মার্কসের 'পুঁজিরই' সাক্ষাৎ অনুবর্তন। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক লক্ষণগুলি পরীক্ষা করেছিলেন, ইতিহাসে তার স্থান নির্ধারণ করেছিলেন একচেটিয়া, পরগাছামূলক ও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ

হিসেবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বলগ্ন হিসেবে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক অন্তঃসার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নিয়ম প্রতিপাদন করেছিলেন। সেই নিয়ম থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন যে সমাজতন্ত্র একটি একক পুঁজিবাদী দেশে প্রথমে জয়যুক্ত হতে পারে, এবং সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্রের যুগপৎ বিজয়লাভ অসম্ভব। সেই সিদ্ধান্তটা ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন তত্ত্বের মূলভিত্তি। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের অন্তঃসার ও প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য লেনিন উদ্ঘাটন করেছিলেন এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বহুবিধ রূপের সম্ভাব্যতা দেখিয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব বিকশিত করতে গিয়ে লেনিন সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র আর শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে তাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ভূমিকা দেখান। তিনি দেখান যে সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার ভান করে সংস্কারবাদীরা আর সুবিধাবাদীরা প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে বিবর্তন সংক্রান্ত মার্কসবাদবিরোধী ধ্যানধারণার অধিবক্তা ছিল, শ্রেণী সংগ্রামকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মার্কসবাদ থেকে তার বিপ্লবী মর্মবাণীকে বিদূরিত করা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও সমাজতন্ত্র নির্মাণে প্রলেতারিয়েতকে তার ভাবাদর্শগত অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণী-শরিকানার আহ্বান

জানিয়েছিল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের দেউলিয়াপনার প্রধান কারণ ছিল মার্কসবাদ সম্বন্ধে তাঁদের মতান্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক জীবনে নতুন ব্যাপারগুলি বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে তাঁদের অপারগতা।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে লেখা অনেকগুলি রচনায় লেনিন সমাজতন্ত্রের অর্থশাস্ত্রের মূলনীতিগুলি বিকশিত করার জন্য বিপ্লবের ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের গোড়ার বছরগুলির অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করেছিলেন, এবং কমিউনিস্ট নির্মাণকর্মের উপায়-পদ্ধতি সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রতিজ্ঞাগুলি বিশদ করেছিলেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন, যার প্রধান সংস্থানগুলি পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসরমান প্রত্যেক দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের প্রশ্ন, শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রীজোটের প্রশ্ন এবং সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তির প্রশ্ন তিনি প্রতিপাদন করেছিলেন। লেনিন তাঁর 'সমবায় প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে তাঁর বিখ্যাত সমবায় পরিকল্পনা বিবৃত করেছিলেন, যেটি আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন এবং যাতে কৃষকসমাজকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের মধ্যে টেনে আনার উপায় ও রূপগুলির রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। অর্থনৈতিক নিয়মগুলির বিষয়গত প্রকৃতি সম্বন্ধে, সেগুলির অবধারণা ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মে সেগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে

মার্কসীয় প্রতিজ্ঞাগুলিও তিনি বিশদ করেছিলেন, সমাজতন্ত্রে সুষম জাতীয়-অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছিলেন, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রধান নীতিগুলি প্রতিপাদন করেছিলেন এবং তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপায় দেখিয়েছিলেন।

লেনিন তাঁর চারপাশে যা কিছু নতুন ও প্রগতিশীল সেগুলি প্রণিধান করে কাজের প্রতি ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট মনোভাব দেখতে পেয়েছিলেন প্রথম কমিউনিস্ট সুব্বোতনিকগুলির (জাতির জন্য বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা) মধ্যে, এবং প্রকাশ করেছিলেন সামাজিক শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের মূল, আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি। অপসৃয়মাণ পুঁজিবাদের তুলনায় পরিকল্পিত ও সুষম সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিপুল সুবিধাগুলি তিনি দেখিয়েছিলেন, এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের এক বিশ্বব্যাপী জয়ের ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপাদন করেছিলেন। তাই, লেনিন স্থাপন করেছিলেন ব্যাপক অর্থে অর্থশাস্ত্রের চূড়ান্ত অংশের বনিয়াদ: কমিউনিস্ট উৎপাদন-প্রণালীর অর্থশাস্ত্র। লেনিনের আবিষ্কৃত সমাজতন্ত্রের বিকাশের ও কমিউনিজমে উত্তরণের অর্থনৈতিক সমরূপতাগুলি কর্মে প্রযুক্ত হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্র-অভিমুখী দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণকর্মের মধ্যে।

আজকের দিনের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের বিকাশে লেনিনের ভূমিকাকে উপেক্ষা অথবা বিকৃত করতে চেষ্টা করেন, দুজন

চিন্তানায়ককে একে অপরের বৈপরীত্যে স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা বলে চলেন যে মার্কসবাদ সেকেলে হয়ে গেছে, আর লেনিনবাদ সত্য শুধু রাশিয়ার পক্ষে।

কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের সৃষ্ট এবং লেনিন-কর্তৃক আরও বিকশিত অর্থশাস্ত্র হল সারা পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর মৌল স্বার্থের এক বিজ্ঞানসম্মত অভিব্যক্তি, সেই শ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্মব্রত হল সমগ্র মানবজাতিকে চালিত করে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া।

মানুষ চিরকাল এই রকম একটা সমাজের স্বপ্ন দেখেছে। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, শ্রমিক শ্রেণীর মহান শিক্ষকদের বিপুল প্রচেষ্টা এই সমস্ত স্বপ্নকে এক সুসংলগ্ন বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বে রূপায়িত করেছিল, যে তত্ত্বের চরম উদ্দেশ্য ছিল শুধু পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করাই নয়, তাকে পরিবর্তিত করাও। পূর্বেকার সমস্ত মতবাদের তুলনায়, মার্কসবাদ দীর্ঘকাল ধরে একটা তত্ত্বই থেকে যায় নি, ইতিহাসের রাজপথ ধরে তার জয়যাত্রা শুরু করেছিল। তার সর্বপ্রথম বিজয় ছিল রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব — মানবজাতির ইতিহাসে মহত্তম বিপ্লব, বিশ্ব বিকাশের সন্ধিক্ষণ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অন্যান্য বিজয়ের মধ্যে আছে সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নত সমাজতন্ত্র নির্মাণ এবং অনেকগুলি ইউরোপীয়, এশীয় ও আমেরিকান দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের সাফল্যগুলি। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থেকে মুক্ত বহু জাতি এখন প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে।

অধ্যায় ৭

পুঁজিবাদ দৃশ্যপটে আসার আগে

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থশাস্ত্রের উপজীব্য বিষয় এবং তার গবেষণা পদ্ধতিগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করেছি। সুনির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রণালীর বিশ্লেষণে সেই বিষয়টা কীভাবে প্রকাশিত হয় এবং সেই পদ্ধতিটা প্রয়োগ করা হয়, এখন তা বিবেচনা করা যাক। মানবজাতির সামাজিক ইতিহাসের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে আমাদের আরোহণটা স্বভাবতই রীতিমত সংক্ষিপ্ত হবে, বিশেষত এই কারণে যে এখানে যেসমস্ত সমস্যা বিবেচিত হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলিই আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থমালার পৃথক পৃথক বইয়ে।

আমাদের কালে অতীতের জেরগুলি

যুক্তিবিদ্যা ও ইতিহাস অনুসারে, সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ বিষয়ক অধ্যয়ন শুরু হওয়া

উচিত প্রাক-পুঁজিবাদী গঠনরূপগুলি থেকে। সেই সঙ্গে, এ প্রশ্নও করা যেতে পারে যে পুঁজিবাদের পূর্বগামী ও ঐতিহাসিক দৃশ্যপট থেকে অনেকাংশে প্রস্থান করা সামাজিক উৎপাদনের রূপগুলি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন কি না।

সেই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে এই রূপগুলি অধ্যয়ন করা উচিত, অন্ততপক্ষে এই কারণেও যে অতীত সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান না থাকলে মানবজাতির বর্তমান বোঝা অথবা তার ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া অসম্ভব। বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তারা সেই অতীতকে সর্বপ্রকারে বিকৃত করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানা ও পুঁজিবাদের চিরন্তনতা ও অপরিবর্তনীয়তা প্রমাণ করার চেষ্টায় তাঁরা অস্বীকার করেন যে ইতিহাস আরম্ভ হয়েছিল এমন এক সমাজ দিয়ে যেখানে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, নিপীড়নকারী বা নিপীড়িত ছিল না। আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার অস্তিত্বের নিছক স্বীকৃতিই পুঁজিবাদের চিরন্তনতা আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী বা শোষণহীন এক কমিউনিস্ট সমাজ স্থাপনের অসম্ভাব্যতা, বৈষয়িক মূল্যসমূহের উৎপাদন ও উপযোজনে যৌথ নীতিভিত্তিক এক সমাজ স্থাপনের অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাঁদের উদ্ভাবনগুলিকে খণ্ডন করে। ফলত, এরূপ এক সমাজের গঠন একটা ঐতিহাসিক ব্যত্যয় নয়, কিংবা 'স্বাভাবিক শৃঙ্খলাতন্ত্র' লঙ্ঘন নয়। অবশ্য, আদিম-সম্প্রদায়গত ও কমিউনিস্ট সমাজকে তুলনা করা, সমান করে দেখানো দূরের কথা, খুবই ভুল হবে, কেননা নিচেই দেখানো হবে, আদিম-

সম্প্রদায়গত সমাজে উৎপাদসমূহের যৌথ উৎপাদন ও উপযোজন ছিল উৎপাদিকা শক্তিগুলির অত্যন্ত সামান্য বিকাশের ফল। বেঁচে থাকার জন্য মানুষেরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক দৈনন্দিন সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হত। তার তুলনায়, কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে অত্যন্ত বিকাশপ্রাপ্ত উৎপাদিকা শক্তিগুলির ভিত্তির উপরে, যার ফলে সমাজের সকল সদস্যের সার্বিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং অবাধ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। কিছু কিছু বুর্জোয়া গবেষক মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তারা নাকি আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থাকে আদর্শায়িত করে এবং সভ্যতার আশীর্বাদগুলিকে পরিত্যাগ করে মানুষকে গুহায় ফিরে যেতে বলে। তাঁরা ভুলে যান যে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ভাবাদর্শবাদী হিসেবে এই মার্কসবাদীরাই মানবজাতির বিকাশের সেই কালপর্বটিকে 'স্বর্ণযুগ' বলে চিত্রিত করার, যে সময়ে লোকে নাকি কোনো কাজ না করেই প্রকৃতির ফলগুলি ভোগ করত, এমন একটা যুগ বলে চিত্রিত করার যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ অবস্থান গ্রহণ করে।

দাস-মালিক প্রথা, মানবেতিহাসে তার স্থান সম্বন্ধে মূল্যায়নেও ভাবাদর্শগত একটা সংগ্রাম আছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও ইতিহাসবেত্তারা ক্রীতদাসপ্রথার নিষ্ঠুরতা আর অনৈতিকতার নিন্দা করেন, কিন্তু এই বিষয়টা উপেক্ষা করেন যে মানবসমাজের প্রগতিশীল বিকাশে দাস-মালিক প্রথাটা ছিল একটা নিয়মশাসিত পর্যায়। সেই সঙ্গে, 'সভ্য ও গণতান্ত্রিক' পুঁজিবাদী

সমাজে ক্রীতদাসপ্রথার যে অবশেষ ও জেরগুলি এখনও টিকে আছে, সেগুলির ব্যাপারে তাঁরা চোখ বন্ধ করে থাকেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ঋণশোধের জন্য দিনমজুরি ও খেতবন্দী প্রথা, দক্ষিণ আফ্রিকার খনি ও বাগিচাগুলিতে গোলামসুলভ শ্রম, কোনো কোনো এশীয় দেশে ঋণশোধের জন্য শিশু ও ছোট মেয়েদের বিক্রয়, প্রভৃতির মতো কিছু কুপ্রথার কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট।

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বেশকিছু উপাদান ও জের এখনও টিকে আছে বহু দেশে, মুখ্যত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার প্রাক্তন ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে, এবং কিছু পরিমাণে ইতালি, স্পেন, পোর্তুগাল ও গ্রীসের মতো কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে। বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির কক্ষপথে আকৃষ্ট সদ্যমুক্ত দেশগুলিতে বুর্জোয়া সম্পর্কগুলি সহাবস্থান করছে সামন্ততান্ত্রিক, দাস-মালিক, উপজাতীয় ও অন্যান্য সম্পর্কের সঙ্গে। নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতির অনুসারী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এই সম্পর্কগুলিকে বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে শোষণ নিবিড় করার উদ্দেশ্যে, সর্বাধিক মুনাফা আদায় করা, এই সমস্ত দেশে তাদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা, প্রভৃতির উদ্দেশ্যে। সেই লক্ষ্য সামনে নিয়েই তারা তাদের আয়ত্ত সমস্ত উপায় ব্যবহার করছে: প্রতিক্রিয়াশীল হুকুমতগুলিকে আর্থিক সাহায্যদান থেকে শুরু করে 'গানবোট কূটনীতি' আর প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ পর্যন্ত।

প্রাক-পুঁজিবাদী গঠনরূপগুলির অর্থনৈতিক

সম্পর্ক অধ্যয়ন করা আরও গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটায়, তার শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া, ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে ছাড়া পাওয়া ও স্বাধীন বিকাশের পথাবলম্বী জাতিসমূহ সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতা বেছে নেওয়ার এবং শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রে উত্তরণের উদ্দেশ্য নিয়ে অ-পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করার সুযোগ পায়।

১৯৮৩ সালে, সদ্যমুক্ত দেশগুলির এবং অবশিষ্ট উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির মোট আয়তন ছিল পৃথিবীর ভূভাগের ৬২ শতাংশের বেশি এবং জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২·৪ শতকোটি। এই সমস্ত দেশের অনেকগুলিতেই অর্থনীতি হল আদিম-সম্প্রদায়গত থেকে একচেটিয়া-পুঁজিবাদী সম্পর্ক পর্যন্ত বহুবিধ ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক জোড়াতালি, এক জগাখিচুড়ি।

মানবজাতির শৈশব

মানবসমাজের উদ্ভব হয়েছিল ২০ লক্ষ বছরের আগে। তার প্রারম্ভিক রূপ ছিল **আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থা**, মানবজাতির ইতিহাসে সেটাই ছিল দীর্ঘতম কালপর্ব। তুলনা প্রসঙ্গে বলা যাক যে দাস-মালিক প্রথা স্থায়ী হয়েছিল প্রায় ৪,০০০ বছর; সামন্ততন্ত্র রাশিয়ায় ১,০০০ বছর থেকে চীনে ২,০০০ বছর; আর পুঁজিবাদের ইতিহাসের বয়স ২৫০ বছরের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি।

মানবসমাজের আত্মপ্রকাশ প্রাকৃতিক ইতিহাসের এক নিয়মশাসিত প্রক্রিয়া ছিল, দৈবী সৃষ্টিকর্তার কোনো কাজ ছিল না। দীর্ঘকালীন বিকাশে, আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থা গিয়েছিল এর অনেকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে: আদিম মানব যূথ, বা প্রাক-উপজাতীয় সমাজ; গোষ্ঠী (gentile) প্রথা, বা গোষ্ঠীগত কমিউন (গোত্র), যা দুটি কালপর্বে উপবিভক্ত: মাতৃতন্ত্র (মাতৃকুলীয় গোষ্ঠী প্রথা, বা মাতৃ-অধিকার গোত্র) ও পিতৃতন্ত্র (পিতৃকুলীয় গোষ্ঠী প্রথা, বা পিতৃ-অধিকার গোত্র); ও প্রতিবেশী (অঞ্চলগত) কমিউন।

প্রাণীজগৎ থেকে উদ্ভূত হতে মানুষের লেগেছিল কোটি কোটি বছর। নরাকার বানরের একটি মনুষ্যে ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে, মানবসমাজের আত্মপ্রকাশ ও গঠনের ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল শ্রম। যুক্ত শ্রম, হাতিয়ার তৈরি ও উচ্চারিত বাক্‌শক্তি স্বয়ং মানুষকে, বিশেষত তার মস্তিষ্ককে বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল। নরাকার বানরের যূথ ক্রমে ক্রমে পরিণত হল এক **আদিম মনুষ্য যূথে,** যা প্রকৃতির উপরে ক্রিয়া করার জন্য হাতিয়ার ব্যবহার করে বিভিন্ন উৎপাদ তৈরি করতে শুরু করেছিল।

আগুনের ব্যবহার আদিম মানুষের জীবনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল, তাকে সক্ষম করেছিল প্রকৃতির সেই পরাক্রান্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব অর্জন করতে এবং চিরতরে পশুজগতের ঊর্ধ্বে উঠতে।

কালক্রমে, লাঠি আর পাথর থেকে মানুষ আরও পরিশীলিত ধাতব হাতিয়ার তৈরি করার দিকে গেল।

প্রথমে তারা ব্যবহার করেছিল তামা, তারপরে ব্রোঞ্জ ও লোহা। তদনুযায়ী, হাজার হাজার বছরব্যাপী আদিম সমাজের ইতিহাস প্রস্তর ও তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগে বিভক্ত। হাতিয়ার তৈরির কাজে আদিম মানুষের শ্রম উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই নিচু। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নিউ গিনির পাপুয়ানদের জীবন যিনি অধ্যয়ন করেছিলেন, সেই বিখ্যাত রুশ পর্যটক ও নৃজাতিবিজ্ঞানী মিকলুখো-মাকলাইয়ের বিবরণ অনুযায়ী, পিতামহ যখন একটি পাথরের হাতিয়ার বানাতে শুরু করত, সেটি সমাপ্ত করত তার পৌত্র।

তীর-ধনুক উদ্ভাবন ছিল আদিম সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এর ফলে, শিকার জীবিকার্জনের উপায়ের আরও নির্ভরযোগ্য একটি উৎস হয়ে উঠেছিল। লোকে যেসব জন্তু মারত, সেগুলির শাবকদের ক্রমে ক্রমে পোষ মানাতে শুরু করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলিকে গৃহপালিত করার উদ্দেশ্যে ফাঁদ পেতে পশু ধরতে শুরু করেছিল। এর ফলে দেখা দিয়েছিল গবাদি পশুপালন এবং মাংস, দুধ, পশম ও অন্যান্য উৎপাদের অধিকতর উৎপাদন।

হাতিয়ারগুলি ক্রমে ক্রমে পরিশীলিত হওয়ার দরুন উদ্ভিদ সংগ্রহ থেকে ধান, ভুট্টা, রাই ও অন্যান্য শস্য চাষের দিকে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। আদিম নিড়ানি থেকে গৃহপালিত গবাদি পশুর টানা লাঙলে উৎক্রমণ

শস্য চাষের বিকাশের পক্ষে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল।

আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল হাতিয়ারগুলির সম্মিলিত ব্যবহার। এবং সেটাই স্বাভাবিক, কেননা উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের সেই অতি নিচু স্তরে যৌথ শ্রমই ছিল জীবনধারণের অতি প্রয়োজনীয় উপায় অর্জনের একমাত্র পথ। আদিম মানুষের সম্মিলিত শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি ছিল সরল সহযোগিতা: অল্পবিস্তর বেশ বড় একদল লোকের একটিই উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সম্মিলিতভাবে জড়িত হওয়া (সম্মিলিত শিকার, আদিম ফসলের চাষ, ইত্যাদি)।

যৌথ শ্রম যৌথ সামাজিক মালিকানাও পূর্বনির্ধারিত করেছিল: সমস্ত উৎপাদনের উপায় ও পুরো-তৈরি উৎপাদ ছিল সমগ্র যূথের সম্পত্তি। ছুরি, কুঠার, তীর-ধনুক, নৌকো, বাসগৃহ প্রভৃতি, জমিরই মতো সমগ্র যূথের সামাজিক সম্পত্তি ছিল।

আদিম সমাজে শ্রম উৎপাদনশীলতা খুবই নিচু মাত্রায় ছিল, অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি মেটানোর মতো উৎপাদ বড়জোর উৎপন্ন হত। সেই জন্যই, সমতাবাদী বণ্টনই ছিল উৎপাদ বণ্টনের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ। ‘ঐকত্রিক সংভারের’ নীতি যদি মেনে না চলা হত এবং কিছু লোক অন্যদের চেয়ে বেশি পেত, তা হলে অনেককেই অনাহারে মরতে হত। সমান ভাগাভাগির অভ্যাসটা এত গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে পর্যটক ও নৃজাতিবিজ্ঞানীরা বেশ সম্প্রতিকালেও তা লক্ষ করেছিলেন এশীয়, আফ্রিকান

ও আমেরিকান উপজাতিগুলির মধ্যে। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যিনি পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সেই ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের বিবরণ অনুযায়ী, তিয়েরা দেল ফুয়েগো উপজাতিগুলির একটি উপজাতিকে উপহার দেওয়া একটুকরো কাপড়কে তার সদস্যরা সমান ভাগে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছিল, যাতে প্রত্যেকে তার অংশটা পায়।

সামাজিক সম্পত্তি, সম্মিলিত শ্রম ও উৎপাদগুলির সমতাবাদী বণ্টন যতদিন পর্যন্ত আদিম সমাজে টিকে ছিল, ততদিন পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাজন কিংবা মানুষের উপরে মানুষের শোষণ ছিল না।

স্বপ্রকাশ তথ্যগুলি অগ্রাহ্য করে বহু বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তা ও অর্থনীতিবিদ দাবি করেন যে মানবসমাজ আরম্ভ হয়েছিল 'একক ব্যক্তিদের', পৃথক পৃথক শিকারী, ধীবর ও ফসল উৎপাদকের কার্যকলাপ দিয়ে, তারা নিজেরাই তাদের হাতিয়ার তৈরি করত এবং সেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে রাখত। যেমন, তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন যে মানবেতিহাসের ঊষালগ্নে দুই বর্গের লোক ছিল: এক দল অলস, আরেক দল কঠোর পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী, এবং তারাই শেষ পর্যন্ত সমাজের সম্পদশালী শ্রেণীগুলি গঠন করেছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির 'আদিকাল থেকে বিদ্যমান' চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ ধারণা ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃজাতিবিবরণগত উপাত্তের সঙ্গে মেলে না এবং বিপুল তথ্যগত উপকরণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে

এঙ্গেলস তা খণ্ডন করেছেন 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' রচনায়।

আগেই বলা হয়েছে, প্রাণীজগৎ থেকে উদ্ভূত মানুষেরা গোড়ার দিকে বাস করত আদিম যূথে। পরে, গোত্র (বা gentile commune) হয়েছিল আদিম সমাজের প্রধান কোষ, আরও যুক্তিসহ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং শ্রম দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা তা নিশ্চিত করেছিল। আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও পলিনেশিয়ায় উপজাতির জীবন অধ্যয়নকারী পর্যটক ও নৃজাতিবিজ্ঞানীরা গোত্রকে গণ্য করেন রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত এক দল লোক হিসেবে। অনেকগুলি গোত্র মিলে হত একটি উপজাতি-গোষ্ঠী, যার জীবনের ভিত্তি ছিল ঐকত্রিক শ্রম ও উৎপাদনের উপায়ের উপরে যৌথ মালিকানা। যৌথভাবে উৎপন্ন সমস্ত উৎপাদ কমিউনের সদস্যদের মধ্যে সমান ভিত্তিতে বণ্টিত হত এবং কমিউনের ভিতরে স্বাভাবিক রূপে সেগুলি ব্যবহৃত হত। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও বিদ্যমান ইরোকোয়া ইণ্ডিয়ানদের গোত্রীয় প্রথা যিনি বর্ণনা করেছিলেন, সেই বিখ্যাত মার্কিন ইতিহাসবেত্তা ও নৃজাতিবিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গান লিখেছিলেন যে একটি গোত্রের সদস্যরা একত্রে বাস করত বড় বড় বাসস্থলে, সেখানে থাকত কয়েক ডজন পরিবার। সম্প্রদায়গত খাদ্যের মজুতও এই সমস্ত বাসস্থলে রাখা হত।

উৎপাদিকা শক্তি এত নিচু স্তরে ছিল যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে একজন একক ব্যক্তি অসহায় ছিল

এবং অস্তিত্ব রক্ষার অসুবিধাগুলির মোকাবিলা করতে পারত না। সে বেঁচে থাকতে পারত সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানাভিত্তিক একটা কমিউনের কাঠামোর মধ্যেই। সেই জন্যই **আদিম সমাজের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম ছিল সম্মিলিত শ্রম ও সমতাবাদী বণ্টনের মধ্য দিয়ে কমিউনের অস্তিত্ব ও তার প্রতিটি সদস্যের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা।**

গোত্রীয় কমিউনের প্রথম পর্যায়ে, তার জীবনে প্রধান ভূমিকা পালন করত নারীরা। সেই কালপর্বটি পরিচিত **মাতৃতন্ত্র** (মাতৃকুলীয় আত্মীয়তা বা মাতৃ-অধিকার গোত্র) নামে। আমাদের কালেও কোনো কোনো জাতির মধ্যে এর অবশেষগুলি দেখতে পাওয়া যায়। পরে, পুরুষরা যখন গবাদি পশুপালন (পাস্টরালিজম) ও লাঙলের চাষে প্রবৃত্ত হতে শুরু করে — যার ফলে প্রচুর পরিমাণ উৎপাদ পাওয়া যেতে থাকে — তখন মাতৃতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করে **পিতৃতন্ত্র** (পিতৃকুলীয় আত্মীয়তা বা পিতৃ-অধিকার গোত্র)। এই ধরনের একটি কমিউনে নেতৃত্ব ছিল পুরুষের, আত্মীয়তার পরিচয় এখন পিতার মারফৎ হতে লাগল। পিতৃতন্ত্রে উত্তরণের সঙ্গে ঘটল প্রতিবেশী (অঞ্চলগত) কমিউনে উত্তরণ এবং আদিম ব্যবস্থার অবক্ষয়।

আদিম সমাজের অবক্ষয় ছিল এক দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়া এবং তা চলেছিল হাজার হাজার বছর ধরে। তার ভিত্তি ছিল উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ও সামাজিক শ্রম বিভাজন। প্রথমে শ্রম বিভাজন ছিল প্রকৃতিগত, লিঙ্গভেদ ও বয়স অনুযায়ী, তা কমিউন,

গোত্র ও উপজাতি-গোষ্ঠীর কাঠামোর বাইরে যায় নি। উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ঘটায়, পৃথক পৃথক কমিউন বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে শুরু করে এবং **সামাজিক শ্রম বিভাজন** আকৃতিলাভ করতে থাকে। যে সমস্ত উপজাতি-গোষ্ঠী ভালো চারণভূমির অধিকারী ছিল তারা ক্রমে ক্রমে ফসল উৎপাদন ও শিকার পরিত্যাগ করে গবাদি পশুপালন শুরু করল, তা থেকে পাওয়া যেতে লাগল আরও বেশি মাংস, দুধ, পশম ও চামড়া। তাই, ফসল উৎপাদন থেকে পৃথক হয়ে গবাদি পশুপালন এক স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপে পরিণত হল, এবং সেটাই ছিল প্রথম বড় ধরনের সামাজিক শ্রম বিভাজন।

খাদ্যশস্য উৎপাদক উপজাতি-গোষ্ঠী আর গবাদি পশুপালক উপজাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিনিময়ের এক দৃঢ়তর ভিত্তি যুগিয়েছিল সেটাই, যার ফলে আকস্মিক ও ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বিনিময় ক্রমে ক্রমে আরও নিয়মিত হয়ে উঠেছিল। শ্রমের উৎপাদ আর শুধু নিজস্ব ব্যক্তিগত ভোগের জন্য থাকল না, অন্যান্য সামগ্রীর বদলে বিনিময়ের জন্যও তা উৎপন্ন হতে লাগল, অর্থাৎ তা হয়ে উঠল একটি পণ্য।

আরও পরিশীলিত কারিগরি যন্ত্রের বিকাশ এবং পশুপালক ও কৃষিনির্ভর উপজাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে আরও বেশি শ্রম বিভাজন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রম আরও উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে লাগল। তার ফলে সম্ভব হল কিছু কিছু শ্রম ক্রিয়া সম্পাদনে যৌথ সম্প্রদায়গত শ্রম পরিহার করা, অর্থাৎ একক অর্থনৈতিক

ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হওয়া। গোত্রগুলি ভেঙে পরিণত হতে থাকল বড় বড় পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে, সেগুলি আরও খণ্ডিত হয়ে পরিণত হল একক পরিবারের ইউনিটে। গোত্রীয় (gentile) কমিউন ক্রমে ক্রমে পরিণত হচ্ছিল **প্রতিবেশী (অঞ্চলগত) কমিউনে।** পূর্বোক্ত কমিউনের তুলনায়, প্রতিবেশী কমিউন গঠিত হত শুধু আত্মীয় পরিবারগুলিকে নিয়েই নয়, অনাত্মীয় পরিবারগুলিকে নিয়েও, যারা তাদের নিজেদের গৃহস্থালি চালাত এবং তাদের জন্য বরাদ্দ জমির টুকরোয় চাষ-আবাদ করত। গৃহ ও সংলগ্ন উঠোনটি হয়ে উঠল পরিবারের ব্যক্তিগত অধিকার, আর ক্ষেত্র, তৃণভূমি, অরণ্য ও অন্যান্য জমি কমিউনের সম্পত্তি থেকে গেল। কাটা গাছের মূল উৎপাটন, সেচ ও অনুরূপ অন্যান্য কাজ করা হত ঐকত্রিকভাবে।

চাষযোগ্য জমি এখন একক পরিবারগুলির দ্বারা কর্ষিত হওয়ায়, তার ফলস্বরূপ প্রাপ্ত উৎপাদগুলি আর 'ঐকত্রিক সংভারে' যেত না অথবা কমিউনের সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হত না, বরং একক পরিবারগুলির সম্পত্তি হয়ে উঠল। পরে, জমিকেও একক পরিবারগুলির সম্পত্তির মধ্যে নেওয়া হল, একক পরিবারগুলিই হয়ে উঠল সমাজের মূল অর্থনৈতিক ইউনিট। এইভাবে উদ্ভূত হল **ব্যক্তিগত সম্পত্তি।** এর উদ্ভবের ফলে মানুষে-মানুষে বৈষয়িক অসাম্য দেখা দিল, ধনী ও দরিদ্রে, এবং দাস-মালিক ও ক্রীতদাসে সমাজের বিভাজন দেখা দিল। সুতরাং, আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থা স্থান ছেড়ে দিল মানুষের উপরে মানুষের শোষণভিত্তিক

শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে। সেই সময় থেকে সমাজতন্ত্র নির্মাণ অবধি, সমাজের গোটা ইতিহাসটাই ছিল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

আদিম-সম্প্রদায়গত সম্পর্কের জের ও অবশেষগুলি আমাদের কালে এখনও টিকে আছে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, আলাস্কা, কানাডা, গ্রীনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওশিয়ানিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের কিছু কিছু জাতির মধ্যে। এগুলির মধ্যে আছে অঞ্চলগত কমিউন, এমন কি উপজাতি-গোষ্ঠীগত সম্পর্কের জের, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক উপাদানগুলির অবশেষ, জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতি, উপজাতি-গোষ্ঠী প্রধানদের পরম্পরাগত ক্ষমতা, উপজাতি-গোষ্ঠীতন্ত্রের সম্পর্কের জের, অর্থাৎ আত্মীয়তাভিত্তিক বিভাজনের জের সহ উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতা।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি উপজাতি-গোষ্ঠীগত সম্পর্কের এই সমস্ত জেরকে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, যাতে উঁচুতলার উপজাতীয়দের সাহায্যে আন্তঃ উপজাতীয় বিরোধের বীজ বপন করা যায়, জাতিগুলিকে শোষণ করা যায় এবং তারা যাতে সংহত হতে না পারে। এখন যখন সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং সদ্যমুক্ত দেশগুলি স্বাধীন বিকাশ ও প্রগতির পথে প্রবেশ করেছে, তখন তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম হল আদিম-সম্প্রদায়গত সম্পর্কের জেরগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা।

আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থাকে স্থানচ্যুত করে যে দাস-মালিক ব্যবস্থা এসেছিল, সেটাই ছিল মানুষের উপরে মানুষের শোষণভিত্তিক প্রথমতম উৎপাদন-প্রণালী।

দাসপ্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি যুগিয়েছিল একটা উদ্বৃত্ত-উৎপাদের আত্মপ্রকাশ। ব্যাপারটা এই যে ফসলের চাষ, গবাদি পশুপালন, মাছ ধরা, শিকার ও অন্যান্য ধারার ক্রিয়াকলাপে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ তার নিজের জীবনধারণের জন্য যেটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি উৎপাদ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে, আবশ্যকীয় উৎপাদের উপরে অতিরিক্ত একটা উৎপাদ থেকে গিয়েছিল। এই অবস্থায়, বন্দীদের আগেকার মতো আর হত্যা করা হল না, তাদের দিয়ে দাস হিসেবে কাজ করানো হতে লাগল।

বলতে গেলে পৃথিবীর সকল জাতিরই নানা ধরনের বিকাশপ্রাপ্ত দাসপ্রথা ছিল। প্রথমে তা আত্মপ্রকাশ করেছিল **পিতৃতান্ত্রিক দাসপ্রথা** রূপে। মুক্ত জাতিদের পাশাপাশি, পিতৃতান্ত্রিক গোত্রগুলির ভাঙন ও অঞ্চলগত কমিউনগুলির আত্মপ্রকাশের কালপর্বে সেই গোত্রগুলিতেও কিছুসংখ্যক দাস অন্তর্ভুক্ত ছিল। পিতৃতান্ত্রিক দাসপ্রথা অবিকশিত ও সীমিত ছিল, কারণ, প্রথমত, সম্প্রদায়গত অর্থনীতিতে দাসরা প্রধান শ্রম বাহিনী ছিল না; দ্বিতীয়ত, দাসরা ছিল সাধারণত বন্দী, জ্ঞাতি নয়; তৃতীয়ত, দাস-ব্যবসায় তখনও ছিল ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু এমন কি এই অবস্থাতেও,

দাস-শ্রম দাস-মালিকদের সম্পদশালী করতে সাহায্য করেছিল এবং তার ফলে দেখা দিয়েছিল আরও বেশি বৈষয়িক অসাম্য। ধনী উপজাতীয় উঁচু-মহলের লোকরাও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদের পাশাপাশি, দারিদ্র্যগ্রস্ত ও ঋণ-দাসত্বে আবদ্ধ তাদের নিজেদের উপজাতি-ভুক্ত লোকদের দাসে পরিণত করতে শুরু করেছিল।

বিভিন্ন শ্রেণী ও বৈষয়িক অসাম্য গড়ে উঠতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে, দাসদের বশ্যতাধীন রাখার জন্য ও নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দাস-মালিকরা বিশেষ বিশেষ সংস্থা গঠন করল। শাসক শ্রেণী কর্তৃক শোষিত জনসাধারণের উপরে বলপ্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রের উৎপত্তিস্থল হল এইখানে।

ভারত, চীন, মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, সিরিয়া, পারস্য, প্রভৃতির মতো প্রাচ্যের দেশগুলিতে দাসপ্রথার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সমস্ত দাস-মালিক সমাজে, বিশেষত বিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়গুলিতে, জমি ও উৎপাদনের উপায়ের উপরে এবং দাসদের উপরেও দাস-মালিকদের মালিকানা ব্যক্তিগতের চেয়ে বরং বেশির ভাগই যৌথ ছিল, তা গ্রহণ করেছিল সম্প্রদায়গত, মন্দির ও রাষ্ট্রের সম্পত্তির রূপ। দাসদের ছাড়াও, রাষ্ট্র (যার প্রতিনিধিত্ব করত কোনো স্বৈরাচারী শাসক) শোষণ করত মুক্ত গ্রামীণ জনসমষ্টিকে, প্রতিবেশী কমিউনগুলির সদস্যদের, যারা প্রচণ্ড কর ও শুল্কে ভারগ্রস্ত ছিল, এবং যাদের অবস্থান দাসদের চেয়ে খুব বেশি পৃথক ছিল না। মোটের উপর, এই দেশগুলিতে দাস-শ্রম অর্থনৈতিক

জীবনে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করে নি, এবং দাসদের সংখ্যা বিরাট ছিল না।

কোনো কোনো প্রাচীন দেশে, যেমন গ্রীস বা রোমে, পিতৃতান্ত্রিক দাসপ্রথা ক্রমবিকাশ লাভ করে পরিণত হয়েছিল ক্লাসিকাল দাসপ্রথায়, যেখানে দাস-শ্রম হয়ে উঠেছিল উৎপাদনের ভিত্তি, সমাজের অস্তিত্বেরই ভিত্তি। এই সমস্ত দেশে দাস-মালিক উৎপাদন-প্রণালীর অভ্যুদয় নির্ধারিত হয়েছিল উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ এবং গভীরতর সামাজিক শ্রম বিভাজন দিয়ে। এর সঙ্গে জড়িত ছিল দাস, জমি, প্রভৃতির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্প্রসারণ, আরও বেশি বৈষয়িক অসাম্য ও প্রাকৃতিক উৎপাদনের প্রাধান্যশালী পশ্চাৎপটে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের বিকাশ।

দাস-মালিক সমাজে উৎপাদনের প্রধান শাখাগুলি ছিল ফসলের চাষ, গবাদি পশুপালন এবং মৃৎশিল্প, কামারগিরি ও গম-পেষাইয়ের মতো হস্তশিল্প, যাতে সেই সময়েই রীতিমত জটিল সব হাতিয়ার ব্যবহৃত হত (তাঁত, কুমোরের চাক, হাপর, যাঁতা, প্রভৃতি)। হস্তশিল্পের বিকাশের ফলে ঘটেছিল দ্বিতীয় বড় ধরনের সামাজিক শ্রম বিভাজন: কৃষি থেকে হস্তশিল্পের পৃথগ্‌ভবন। এমন কি পিতৃতান্ত্রিক দাসপ্রথার যুগেও, গ্রীসে ছিল কামার, পাথর-মিস্ত্রি, জোয়াল প্রস্তুতকারক, কুমোর ও ধাতু কর্মী।

কৃৎকৌশলগত বিকাশ ও দাস-শ্রমের সহযোগিতা ঘটতে থাকায়, হাজার হাজার দাস-বিশিষ্ট বড় বড় উদ্যোগ গড়ে তোলা হয়, যেমন প্রাচীন রোমের কৃষিতে

ল্যাতিফুন্দিয়াম, কিংবা প্রাচীন গ্রীসের হস্তশিল্প উৎপাদনে এর্গাস্তেরিঅন। এই সমস্ত উদ্যোগে হাজার হাজার দাস-শ্রমিক একটা উদ্বৃত্ত-উৎপাদ উৎপন্ন করত দাস-মালিকদের জন্য। আমাদের কালেও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দাস-শ্রমের রাজকীয় স্মৃতি নিদর্শনগুলি: ভারতীয় ও গ্রীক মন্দিরগুলি, রোমান থিয়েটার, খাল ও রাস্তাগুলি, চীনের মহাপ্রাচীর, এবং মিশর, মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস ও পেরুতে পিরামিডগুলি।

দাস-মালিক রাষ্ট্রগুলিতে বিকশিত হয়েছিল বিজ্ঞানের বহু শাখা — গণিত, বলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, স্থাপত্য, প্রভৃতি এবং বিশ্ব সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছিল সাহিত্যকর্ম, ভাস্কর্যকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকৃতি দিয়ে। একটা বিষয় বলা দরকার যে ইউরোপীয় সভ্যতা পৃথিবীতে প্রাচীনতম নয়, কেননা আজকের দিনের ইউরোপীয় জাতিগুলির পূর্বপুরুষরা যখন আদিম-সম্প্রদায়গত সমাজে বাস করছিল, সেই সময়েই মিশর, ভারত, চীন ও মেসোপোটেমিয়া লিপিবদ্ধ ইতিহাসের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল।

দাস-মালিক উৎপাদন-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য ছিল উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে শ্রমশক্তির এক সুনির্দিষ্ট সংযোগ-প্রণালী: দাস-শ্রমিক উৎপাদনের উপায় থেকে শুধু যে বঞ্চিত ছিল তাই নয়, সে নিজেই ছিল দাস-মালিকের সম্পত্তি; দাস-মালিক তাকে কাজ করতে বাধ্য করত এবং ফলস্বরূপ প্রাপ্ত সমগ্র উৎপাদটি উপযোজন করত, তার একটা অকিঞ্চিৎকর অংশ দিত

দাসের নিজের জন্য, নেহাৎ তাকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে।

দাসকে দেখা হত একটা জিনিস হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে নয়। গবাদি পশুর মতো তাকে কেনা-বেচা করা যেত অথবা হত্যা করা যেত। প্রাচীন রোমে সমস্ত কারিগরি উপকরণকে ভাগ করা হয়েছিল 'কথা-বলা' (দাস), 'হাম্বাধ্বনি-করা' (চাষের পশু) আর 'মূক' (কাজের সাধিত্র) বলে। আরিস্ততল সমাজে দাসের অবস্থান প্রকাশ করেছেন অতি যথার্থভাবে। তিনি লিখেছেন: 'একজন দাস হল একটি সজীব সাধিত্র, আর একটি সাধিত্র হল এক অচেতন দাস।' বহু দাসকে মালিকের নাম খোদাই করা একটা কলার সব সময়ে পরে থাকতে হত। দাসদের গায়ে ছাপও দেগে দেওয়া হত, যাতে পালিয়ে গেলে সহজেই ধরে ফেলা যায়।

স্বভাবতই, এই ধরনের প্রত্যক্ষ, শারীরিক বলপ্রয়োগের অবস্থায় ক্রীতদাসের কাজ করার বা শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কোনোই প্রণোদনা ছিল না। তার সাধিত্রগুলি সে ধ্বংস করে ফেলত বলে, সেগুলি স্থূল ও আদিম থেকে গিয়েছিল। দাসপ্রথা ছিল মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম, সবচেয়ে প্রকাশ্য ও পাশবিক শোষণের রূপ। উদ্বৃত্ত-উৎপাদের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য দাস-মালিকরা দাস-শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়াতে চেষ্টা করত। দাস সংগ্রহের প্রধান উৎস ছিল রাজ্যজয়মূলক যুদ্ধগুলি। যেমন, খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে কতকগুলি যুদ্ধ রোমান দাস-মালিকদের

১,৫০,০০০ -- ২,০০,০০০ পর্যন্ত দাস যুগিয়েছিল। পরে কমিউনের ঋণদায়গ্রস্ত দরিদ্র সদস্যরাও দাসে পরিণত হয়েছিল।

দাস-মালিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল জীবনধারণোপযোগী উৎপাদন, সেখানে বেশির ভাগ উৎপাদই গার্হস্থ্য প্রয়োজনগুলি মেটাতে চলে যেত। উদ্বৃত্ত-উৎপাদের এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ব্যবহৃত হত অনুৎপাদনশীলভাবে, সেটা চলে যেত দাস-মালিকের ও তার আশপাশের লোকজনের ব্যক্তিগত পরগাছাসুলভ ভোগে (চমকপ্রদ সব প্রাসাদ আর মন্দির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে, চমৎকার ভোজ উৎসবে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ক্রীড়া ও সাড়ম্বর প্রদর্শন, প্রভৃতিতে)। তাই, **দাস-মালিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল দাস-মালিকদের পরগাছাসুলভ চাহিদাগুলি আরও বেশি মাত্রায় পূরণ করা। সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল প্রত্যক্ষ শারীরিক বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে ক্রীতদাসদের উপরে নির্মম শোষণের সাহায্যে। সেটাই ছিল দাস-মালিক সমাজের মূল অর্থনৈতিক নিয়মের সারমর্ম।**

সামাজিক শ্রম বিভাজন যত গভীর হয়ে উঠতে থাকে এবং কৃষি ও হস্তশিল্প উৎপাদন বাড়তে থাকে, পণ্য-অর্থ সম্পর্ক তদনুযায়ী বিকশিত হতে থাকে। দাস-শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-উৎপাদ যারা উপযোজন করত, বড় বড় লাতিফুন্দিয়া, এর্গাস্তেরিয়া ও অন্যান্য উদ্যোগের সেই সব মালিকরা সেই উৎপাদের একটা অংশ বাজারে ছাড়তে লাগল। দাসদেরও কেনা-বেচা করা হতে লাগল ব্যাপকতর পরিসরে। ক্ষুদ্র

উৎপাদকরাও কৃষক ও হস্তশিল্পীরা — তাদের উৎপাদের একটা অংশ বিক্রি করত। গ্রীস, রোম, ভারত ও চীনে বিভিন্ন কর্মশালা, কামারশালা, বেকারি ও অন্য হস্তশিল্প কর্মশালা বাজারের জন্য সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষ পারদর্শিতার অধিকারী ছিল। পণ্য-বিনিময় ক্রমে ক্রমে বিকাশলাভ করে পরিণত হল নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্যে, বাজারে সক্রিয় কেনা-বেচা চলতে লাগল। বাণিজ্য প্রসারিত হয়ে চলায় ও রাষ্ট্রীয় সীমানাগুলি অতিক্রম করতে শুরু করায়, ক্রমে ক্রমে পরিণত হল বৃহদায়তন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে; তাতে জড়িত ছিল মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, চীন, গ্রীস, রোম, প্রভৃতি দাস-মালিক রাষ্ট্র।

পণ্য-অর্থ সম্পর্ক ও বাণিজ্যের বিকাশের ফলে দেখা দিয়েছিল পুঁজির প্রথম ঐতিহাসিক রূপগুলি: **বণিকের পুঁজি ও চোটার পুঁজি**। বণিকদের একটি শ্রেণীর উদ্ভব ছিল তৃতীয় বড় ধরনের সামাজিক শ্রম বিভাজন। পণ্যসামগ্রী বিনিময়ে বণিকরা কাজ করত মধ্যগ হিসেবে। পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে তারা বণিকের মুনাফার রূপে দাস-মালিকদের উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একটা অংশ আর কৃষক ও হস্তশিল্পীদের উৎপন্ন উৎপাদের একটা অংশ উপযোজন করার জন্য ব্যবহার করত দামের পার্থক্যটাকে এবং সরাসরি প্রতারণাকে।

কুসীদজীবীরা চড়া হারের সুদে অর্থ ধার দিত দাস-মালিকদের এবং ক্ষুদ্র পণ্য-উৎপাদক — কৃষক ও হস্তশিল্পীদের। সুদের রূপে, কুসীদজীবীরা উপযোজন করত কৃষক ও হস্তশিল্পীদের উৎপন্ন উৎপাদের একটা

অংশ এবং ক্রীতদাসদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একটা অংশ।

বণিকের পুঁজি ও চোটার পুঁজি পণ্য উৎপাদনের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল, দাস-মালিক সমাজের সারগতভাবে প্রাকৃতিক অর্থনীতিকে ক্ষুণ্ণ করেছিল, দাস-মালিকদের অর্থলিপ্সা বাড়িয়েছিল এবং দাসদের উপরে শোষণ নিবিড় করতে সাহায্য করেছিল। দাস-মালিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বিনিময়ের বিকাশ বৈষয়িক অসাম্য বাড়িয়েছিল, কারও ভাগ্যে সম্পদ আর কারও ভাগ্যে ঋণবন্ধনদশা ও সর্বনাশ এনেছিল। দাস ব্যবসায় হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে মুনাফাদায়ক ব্যবসায়গুলির অন্যতম। দাস ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা দাস ব্যবসায়ের বড় বড় কেন্দ্রে সমবেত হত শুধু দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই নয়, অন্যান্য দেশ থেকেও।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও ইতিহাসবেত্তারা প্রাচীন দাস-মালিক সমাজের ইতিহাসকে বিকৃত ও পরিমার্জিত করতে চেষ্টা করেন। পুঁজিবাদী সম্পর্কের চিরন্তন প্রকৃতি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রাচীন গ্রীস ও রোমে পুঁজিবাদের উপাদানগুলি সন্ধান করেন।

সমাজের বিকাশে দাসপ্রথা ছিল এক আবশ্যিক পর্যায় এবং আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার তুলনায় তা ছিল সামনের দিকে বেশ বড় একটা পদক্ষেপ। তা সাধিত্র নির্মাণে, উৎপাদনের বিশেষীকরণে ও গভীরতর সামাজিক শ্রম বিভাজনে অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। বৃহত্তর পরিসরে সহযোগিতা ও উচ্চতর শ্রম উৎপাদনশীলতা ঘটিয়েছিল। সেই সময়েই সর্বপ্রথম শহরগুলি

আত্মপ্রকাশ করেছিল বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে, এবং বিশেষ ধরনের মানবিক ক্রিয়াকলাপস্বরূপ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার কেন্দ্র হিসেবেও। কিন্তু সেই প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি ছিল বহু প্রজন্মের বিপুলসংখ্যক দাসের হাড়ভাঙা শ্রম।

দাস-মালিক প্রথার মধ্যে ছিল অমীমাংসেয় আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব, যার ফলে তার ক্ষয় ও পতন হয়েছিল। প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল দাসদের অর্থনৈতিক স্বার্থ আর দাস-মালিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন বা উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনশীলতার কোনো বৈষয়িক বা নৈতিক প্রণোদনাহীন দাসদের গোলামসুলভ শ্রম শেষ পর্যন্ত দাসভিত্তিক উৎপাদনের বদ্ধাবস্থা ও ক্ষয় ঘটিয়েছিল। দাস-শ্রমকে ব্যবহার করা হত অতি লুণ্ঠেরামূলক ও অনুৎপাদনশীলভাবে, এবং কায়িক শ্রমকে একজন মুক্ত নাগরিকের মর্যাদাহানিকর বলে মনে করা হত। কঠোর কায়িক শ্রম ছিল দাসদের বিধিলিপি, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের কাজ-কারবার, রাজনীতি, দর্শন, শিল্পকলা ও সাহিত্য ছিল দাস-মালিকদের বিশেষ অধিকার; দাসদের তারা নির্মমভাবে শোষণ করত। এই ছিল মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিরোধাভাসমূলক বৈপরীত্যের উৎস, তার একটা সুস্পষ্ট শ্রেণী চরিত্র ছিল।

দাসপ্রথার বৈরমূলক দ্বন্দ্বগুলি শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্যেও প্রকাশ পেয়েছিল। শহরগুলি ছিল হস্তশিল্প, বাণিজ্য, কুসীদবৃত্তি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র, আর কৃষি উৎপাদনের পশ্চাৎপদ রূপবিশিষ্ট

গ্রামাঞ্চলগুলিতে আদিম ব্যবস্থার বহু বৈশিষ্ট্যই বজায় ছিল। শহরগুলি গ্রামাঞ্চলকে শোষণ করত বিভিন্ন রূপে: কৃষিজাত উৎপাদ কম দামে ক্রয় ও শহুরে সামগ্রী বেশি দামে বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে, কর ও নানা ধরনের শুল্কের মধ্য দিয়ে। মুক্ত কৃষকদের রাজ্যজয়ের যুদ্ধে সামরিক সেবার জন্যও সংগ্রহ করা হত। এই সবের ফলে গ্রামাঞ্চল দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়েছিল, তার শ্রমশক্তিহানি ও কৃষির অবনতি ঘটেছিল, এবং দাস-মালিক প্রথার বুনিয়াদগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

দাস-মালিক সমাজের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল দাসভিত্তিক বৃহদায়তন উৎপাদন আর মুক্ত কৃষক ও হস্তশিল্পীদের ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। দাস-শ্রমোৎপন্ন উৎপাদ বিক্রি হত অপেক্ষাকৃত কম দামে, কেননা দাসদের সস্তায় ভরণপোষণ করা যেত এবং তাদের শ্রমের সহযোগিতার ফলে উৎপাদনের উপায় আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেত। ক্ষুদ্র কৃষক ও হস্তশিল্পী গৃহস্থালিগুলি বড় বড় উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে পারত না, অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়ে যেত। কর বৃদ্ধি, ঋণ বন্ধনদশা, দাস-মালিকদের পক্ষ থেকে সরাসরি কৃষকদের ধনসম্পত্তি দখল আর যুদ্ধের কঠিনতা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সর্বনাশের ফলে দাস-মালিক রাষ্ট্রগুলিতে, বিশেষত রোমে এক বিপুলসংখ্যক বিত্তহীন ও ছিন্নমূল মানুষ দেখা দিয়েছিল, যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং উৎপাদনের সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছিল পুরোপুরি।

তারা ব্যক্তিগতভাবে মুক্ত ছিল বলে সমস্ত উৎপাদনশীল শ্রমকে তারা অপছন্দ করত এবং শহরের পথে পথে ভীড় জমিয়ে রুটি দাবি করত। দাসদের উদ্বৃত্ত-শ্রমের বিনিময়ে তাদের ভরণপোষণ করতে বাধ্য হত দাস-মালিক রাষ্ট্র। রোমে এই ধরনের লোকেদের বলা হত লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এখন যাদের শ্রমের বিনিময়ে সমাজ টিকে থাকে, সেই আধুনিক প্রলেতারিয়েতের বিপরীতে রোমান লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত বেঁচে থাকত সমাজের বিনিময়ে।

মুক্ত কৃষক ও হস্তশিল্পীদের সর্বনাশ রোম ও অন্যান্য দাস-মালিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাকে দুর্বল করেছিল, কেননা ক্ষুদ্র উৎপাদকরাই ছিল সেগুলির সামরিক ক্ষমতার মেরুদণ্ড। রাজ্যজয়ের যুদ্ধগুলি আরও ঘন ঘন পরিণত হল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে, সামরিক জয়ের জায়গায় ঘটতে লাগল পরাজয়, আর সস্তা দাসদের উৎসটি নিঃশেষ হয়ে যেতে শুরু করল।

বড় বড় দাসভিত্তিক উদ্যোগে সস্তা দাসদের অন্তঃপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে আসায় এবং দাসদের দাম বেড়ে যাওয়ায়, এই উদ্যোগগুলি ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের তুলনায় তাদের আগেকার সুবিধাগুলি হারাল, এবং দাস-শ্রমোৎপন্ন উদ্বৃত্ত-উৎপাদ হ্রাস পেল। কৃষির ক্ষয়ের পরে এল হস্তশিল্পের অবনতি, ফলে বাণিজ্য স্তব্ধ হয়ে গেল। শহরের জনসংখ্যা সংকুচিত হল, শহরগুলি ক্ষয় পেতে লাগল, সেগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব

নষ্ট হল। দাস-মালিক প্রথার ভাঙনের সঙ্গে জড়িত ছিল উৎপাদিকা শক্তিগুলির ব্যাপক বিনাশ।

বৃহদায়তন দাসভিত্তিক উৎপাদন সংকট-কবলিত ছিল বলে এবং তা ক্রমেই আরও কম আয় দিত বলে, জমির বড় বড় খণ্ডকে ছোট ছোট টুকরোয় বা অংশে ভাগ করাটা লাভজনক হয়ে উঠল, নির্দিষ্ট শর্তে সেগুলি মুক্ত নাগরিকদের কাছে বা দাসদের কাছে ইজারা দেওয়া হত। নতুন কৃষি মজুররা জমির টুকরোর সঙ্গে বাঁধা থাকত এবং সেই সব জমির টুকরোর সঙ্গে তাদেরও বিক্রি করা যেত। এরা গঠন করেছিল পণ্য উৎপাদকদের এক নতুন বর্গ, যারা দাস আর মুক্ত নাগরিকদের মাঝামাঝি এক মধ্যবর্তী অবস্থান অধিকার করে ছিল। তারা পরিচিত ছিল 'কলোনি' নামে, এবং তারাই ছিল মধ্যযুগের ভূমিদাসদের পূর্বপুরুষ। ক্ষুদ্রায়তন কৃষকভিত্তিক উৎপাদনই হয়ে উঠল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একমাত্র মিতব্যয়ী, আত্ম-পূরণমূলক রূপ।

দাসভিত্তিক উৎপাদনের অবনতি ও তার দ্বন্দ্বগুলির গভীরতাবৃদ্ধির ফলে, শ্রেণী সংগ্রাম নিবিড় হয়ে উঠল। দাসদের বিদ্রোহমূলক অভ্যুত্থানগুলি মিলে গেল নিপীড়কদের বিরুদ্ধে বিত্তহীন কৃষক ও হস্তশিল্পীদের সংগ্রামের সঙ্গে। ইতিহাসে বহু দাস বিদ্রোহের ঘটনা আছে। সবচেয়ে বেশি পরিচিত বিদ্রোহগুলির মধ্যে ছিল ইউনুস ও ক্লিওনের নেতৃত্বে সিসিলি দ্বীপে বিদ্রোহ, আরিস্তোনিকাসের নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরে বিদ্রোহ, চীনে দাস ও গরিব কৃষকদের 'রক্তিম ভ্রূ'

বিদ্রোহ, বস্পোরাস রাজ্যে সাউমাকুসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ও ইতালিতে স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান। দাসদের অভ্যুত্থানগুলি দাস-মালিক রাষ্ট্রগুলির ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল, সেগুলির সমাপতন ঘটেছিল প্রতিবেশী উপজাতি ও জাতিগুলির সশস্ত্র আক্রমণের সঙ্গে। রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস সেই দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক। শোষিত জনসাধারণের অভ্যুত্থানগুলিতে ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে যাওয়া এই সাম্রাজ্য জার্মান, গালিক, স্লাভ ও অন্যান্য বর্বর উপজাতির আঘাতে শেষ পর্যন্ত চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। দাসপ্রথার পতনে প্রধান দুটি বৈরমূলক শ্রেণী — দাস ও দাস-মালিক শ্রেণী লোপ পেয়েছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষের উপরে মানুষের শোষণের অবসান ঘটেছিল। দাসপ্রথার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল সামন্ততন্ত্র, যার অধীনে শোষণ নতুন নতুন ও আরও নমনীয় রূপ ধারণ করেছিল, উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের অধিকতর সুযোগ যুগিয়েছিল।

দাস-মালিক প্রথা বহুকাল আগে লোপ পেলেও, দাস-মালিক সম্পর্কের জের ও অবশেষগুলি আজও রয়েছে। ১৬শ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের পর, লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানকে আমেরিকায় জবরদস্তি আমদানি করা হয়েছিল এবং তুলা বাগিচা ও খনিগুলিতে দাস হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আফ্রিকানদের ধরা আর দাস ব্যবসায় খুবই লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল। ১৬৮০ থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত শুধু ব্রিটিশ

বণিকরাই ২০ লক্ষের চেয়ে বেশি দাস চালান দিয়েছিল ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্তও ইংলণ্ড, স্পেন, পোর্তুগাল, ফ্রান্স ও হল্যান্ডের উপনিবেশগুলিতে দাস ব্যবসায় ও বাগিচাগুলিতে দাস-শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার চলেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, দাসপ্রথা আইনগতভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-১৮৬৪) ফলে, যে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছিল দাস-মালিক দক্ষিণের বিরুদ্ধে শিল্পপ্রধান উত্তরের বিজয়ে। কিন্তু এমন কি তার পরেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষত দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, কৃষ্ণাঙ্গরা থেকে গিয়েছিল জনসমষ্টির সবচেয়ে অধিকারহীন ও নিপীড়িত অংশ।

বাগিচায় দাসপ্রথা ও পিতৃতান্ত্রিক দাসভিত্তিক সম্পর্কের জের এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কিছু কিছু দেশে এখনও বিদ্যমান। এই জেরগুলির মধ্যে আছে ঋণশোধের জন্য দিনমজুরি, বা প্রায় দাসসুলভ অনৈচ্ছিক বশ্যতার প্রথা, যেখানে কৃষক ও খামারের মজুররা বৃহৎ ভূস্বামীদের উপরে নির্ভরশীল। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্য ও নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন নামে অভিহিত ঋণ-দাসত্ব হল দাস শোষণের সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত রূপগুলির অন্যতম, এবং বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলি তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। যখন কোনো ভূম্যধিকারী একজন মজুরকে কিছু খাদ্যসামগ্রী ধার দেয় এবং তাকে একটুকরো জমি ও মোটামুটি একটা বাসস্থল যোগায়, তখনই তা সাধারণত শুরু হয়। এর ফলে, বহু পরিবার

ঋণ-বন্ধনদশায় আবদ্ধ হয়, কেননা পরিবারের কর্তার ঋণভার তার সন্তানসন্ততিরা উত্তরাধিকারসূত্রে বহন করে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানীয় আফ্রিকান জনসমষ্টি ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকেদের ব্যাপারে দাসপ্রথার কাছাকাছি বৈষম্যমূলক ও বর্ণবাদী আচার-আচরণ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে বর্ণবাদ ও কৃষ্ণাঙ্গ পৃথকীকরণ হল দাস-মালিক প্রথার জের। যেমন, দাস-মালিক গ্রীসের ভাবাদর্শবিদরা মনে করতেন যে একমাত্র গ্রীকদেরই 'নগর-রাষ্ট্রগুলিতে' বসবাস করার অধিকার ছিল, কেননা প্রকৃতি স্বয়ং তাদের করেছিল অন্যান্য জাতির প্রভু, এবং মুক্ত গ্রীকদের পাশাপাশি বাস করার কোনো অধিকার দাসদের ছিল না।

আজকের দিনের পুঁজিবাদী সমাজ দাসপ্রথার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে মানসিক ও কায়িক কাজের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে বিরোধাভাসমূলক বৈপরিত্য। সেই বৈপরিত্য শুধু বজায় রাখাই হয় নি, তাকে নতুন নতুন রূপে আরও জটিল করা হয়েছে। কায়িক শ্রমের প্রতি যে বিতৃষ্ণা শোষকরা সৃষ্টি করেছে, তার উৎসসন্ধান করা যায় সেই দাসপ্রথার মধ্যে।

দাস-মালিক সম্পর্ক ও শোষদের জেরগুলির বিরুদ্ধে, উপনিবেশবাদ ও কৃষ্ণাঙ্গ পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে এক দৃঢ়পণ সংগ্রামই চিরতরে দাসপ্রথার অবসান ঘটানো সম্ভব করে তুলবে। এই সংগ্রাম গণতন্ত্র ও

প্রগতির জন্য নতুন স্বাধীন জাতিগুলির চালানো সামগ্রিক সংগ্রামেরই অখণ্ড অংশ।

সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাস

দাসপ্রথার স্থানগ্রহণকারী ও শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত সামন্ততন্ত্র ছিল সমাজের বিকাশে এর পরবর্তী নিয়ম-শাসিত পর্যায়। সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের রূপগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছিল।

বহু দেশে, যেমন প্রাচীন রোমে, সামন্ততন্ত্র আত্মপ্রকাশ করেছিল দাস-মালিক প্রথার ভাঙনের ফলে। সামন্ততন্ত্রে পরিণত হওয়ার সেই রূপটি কিছুটা পরিমাণে প্রাচ্য সামন্ততন্ত্রেরও (চীন, ভারত, ব্যাবিলোনিয়া, প্রভৃতি) বৈশিষ্ট্যসূচক ছিল। সেই সঙ্গে, এই দেশগুলিতে সামন্ততন্ত্র আসাটা ছিল মন্থরতর এবং নিজস্ব কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল সেচ ব্যবস্থার গুরুত্বের দরুন, স্বৈরাচারী শাসকদের সম্পত্তির রূপে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি-মালিকানার প্রচলন ও কমিউনের অধিকতর স্থিতিশীলতার দরুন।

অন্যান্য জাতি সামন্ততন্ত্রে উপনীত হয়েছিল ভিন্নভাবে। কেউ কেউ সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিল উন্নত দাস-মালিকানা প্রথার পাশ কাটিয়ে সরাসরি আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থা থেকে। প্রাচীন রুস ও পূর্ব ও উত্তর ইউরোপের অন্যান্য দেশের বৈশিষ্ট্যসূচক ছিল সেটা।

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব বিভিন্নভাবে হলেও, সেই

প্রক্রিয়ায় ফলাফল মোটামুটি একই ছিল। তা জন্ম দিয়েছিল **সামন্ত প্রভু** নামে পরিচিত ভূম্যধিকারীদের এক নতুন শ্রেণীর, যারা সামরিক বা অন্যান্য সেবার জন্য রাজা বা জারদের কাছ থেকে জমি পেয়েছিল। সেই সঙ্গে, একদা-মুক্ত কৃষক, 'কলোনি' ও কমিউনের সদস্যরা সামন্ত প্রভুদের ব্যক্তিগত অধীনতায় এসে গড়ে তুলেছিল পরাধীন ও শোষিত **ভূমিদাসদের** একটি শ্রেণী।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের একটা প্রকট সোপানবৎ গঠনকাঠামো ছিল, তার বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খণ্ড-বিক্ষিপ্ততা। সামন্ত প্রভুদের একটা গোটা সোপানতন্ত্র ছিল, তাদের প্রত্যেকে ছিল উপরের ধাপটির অধীনস্থ। 'ফিউডালিজম' (সামন্ততন্ত্র) শব্দটি এসেছে 'ফিউড' শব্দ থেকে, পশ্চিম ইউরোপে যার দ্বারা বোঝাত উচ্চ পদস্থ সামন্ত প্রভু (সিনিয়র) কর্তৃক একজন নিম্নপদস্থ সামন্ত প্রভুকে (ভাসাল) প্রথমে আজীবন ও পরে উত্তরাধিকারযোগ্য ভূসম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর করা, এই শর্তে যে শেষোক্তকে নির্দিষ্ট কিছু কিছু সেবা দিতে হবে। রাজা, জার ও অন্যান্য শাসকরা ছিলেন উচ্চপদাসীন সিনিয়র, তাঁরা ভূসম্পত্তি দিতেন তাঁদের ভাসালদের: রক্ষী, ভৃত্য, গির্জার বিভিন্ন ধাপের যাজক ও মঠগুলিকে। তাই 'ফিউডের' রূপে ভূসম্পত্তির ভিত্তিতে উদ্ভূত শোষণমূলক ব্যবস্থাটি পরিচিত হল 'ফিউডালিজম' বা সামন্ততন্ত্র নামে।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও ইতিহাসবেত্তারা

সমাজব্যবস্থা হিসেবে সামন্ততন্ত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক অন্তঃসারটিকে অস্পষ্ট করে দিতে চান, তার সোপানবৎ গঠনকাঠামো ও অন্যান্য দৃশ্য দিককে তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক বলে উপস্থিত করেন। প্রকৃতপক্ষে, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের ব্যাপারে আসল জিনিসটা ছিল এই যে উৎপাদনের মূল উপায়, জমি ছিল সামন্ত প্রভুর মালিকানাধীন, যারা সেই জমির উপরে কাজ করত সেই কৃষকদের নয়। কৃষকরা সামন্ত প্রভুর কাছ থেকে জমি পেত তার মালিক হওয়ার জন্য নয়, শুধু তা ব্যবহার করার জন্য। জমির সঙ্গে তারা বাঁধা ছিল এবং বহু সামন্ততান্ত্রিক কৃত্যাক সম্পন্ন করতে হত তাদের। কৃষকদের জমি বরাদ্দ করাটা ছিল সামন্ত প্রভুদের জন্য শ্রমশক্তি যোগানোর একটা উপায়, জমির উপরে তাদের একচেটিয়া ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে প্রভুদের উপরে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল ছিল।

মালিকানার সামন্ততান্ত্রিক রূপটি দাস-মালিক রূপটি থেকে পৃথক ছিল। সামন্ততন্ত্রে, উৎপাদকরা উৎপাদনের সমস্ত উপায় থেকে বঞ্চিত ছিল না, কেননা কৃষকদের থাকত একটি বাসগৃহ, সংলগ্ন বাইরের ঘর, প্রভৃতি, উপকরণ, চাষের পশু ও উৎপাদনশীল গবাদি পশু, বীজ, পশুখাদ্য ও অন্যান্য উৎপাদনের উপায়। নিজেদের জমির টুকরোয় চাষ করে তারা নিজেদের জন্য ও তাদের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদ উৎপন্ন করত। তাই, তার শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন ছিল কৃষকের নিজের ব্যাপার। এই অবস্থায়, সামন্ত প্রভুর

কৃষকদের উপরে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা থাকা দরকার ছিল, যাতে তাদের বাধ্য করা যায় তার জন্য কাজ করতে। শ্রম ও অন্যান্য কৃত্যক সম্পন্ন করার জন্য কৃষকদের উপরে অর্থনৈতিক নিয়ম-বহির্ভূত অস্বাভাবিক, প্রত্যক্ষ শারীরিক বাধ্যবাধকতার বৈশিষ্ট্যে সামন্ততন্ত্র চিহ্নিত ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সারমর্ম ছিল এই যে পরাধীন কৃষকের উদ্বৃত্ত-শ্রমে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-উৎপাদটি উপযোজন করত সামন্ত প্রভু (ভূস্বামী)। সেই উদ্বৃত্ত-উৎপাদ ধারণ করেছিল সামন্ততান্ত্রিক জমি-খাজনার রূপ। **সামন্ততন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম হল কাজ করার বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে ও চুক্তি-আবদ্ধ অর্থনৈতিক নিয়ম-বহির্ভূত অস্বাভাবিক শোষণের মধ্য দিয়ে একটি উদ্বৃত্ত-উৎপাদ উৎপাদন, ও সামন্ততান্ত্রিক জমি-খাজনার রূপে সামন্ত প্রভু কর্তৃক তার উপযোজন।**

সামন্ততান্ত্রিক খাজনার রূপগুলি সামন্ততন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে ক্রমবিকাশ লাভ করেছিল। **সামন্ততান্ত্রিক খাজনার** তিনটি **রূপ** আছে: ১) শ্রম খাজনা, ২) সামগ্রীতে খাজনা, ও ৩) অর্থ খাজনা।

শ্রম খাজনায় (কর্ভি প্রথা) কৃষক সপ্তাহের একটা অংশে (তিন দিন বা তারও বেশি) সামন্ত প্রভুর তালুকে কাজ করত, নিজের উপকরণ ও গবাদি পশু ব্যবহার করে, বাকি দিনগুলিতে কাজ করত নিজের জমির টুকরোয়। কৃষক আবশ্যকীয় উৎপাদ উৎপন্ন করত তার নিজের জমিতে, আর উদ্বৃত্ত-উৎপাদ উৎপন্ন করত

সামন্ত প্রভুর জমিতে। প্রভুর জন্য কাজ করার সময়ে, চুক্তি-আবদ্ধ কৃষক তার কাজের ফলাফলে আগ্রহী ছিল না, অথচ নিজের জমির টুকরোয় কাজ করার সময়ে সে শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোয় আগ্রহী ছিল, কারণ সেটাই ছিল তার জীবনধারণের উপায়ের উৎস।

সামগ্রীতে খাজনা (quit-rent) শ্রম খাজনা থেকে পৃথক ছিল এই দিক দিয়ে যে উদ্বৃত্ত-উৎপাদ সামন্ত প্রভুর জমিতে উৎপন্ন হত না, বরং আবশ্যকীয় উৎপাদের মতোই, কৃষকের ব্যক্তিগত জমির টুকরোয় উৎপন্ন হত। তাই, কৃষক তার সামন্ততান্ত্রিক কৃত্যক সম্পন্ন করার পর নিজের জন্য কাজ করতে পারত। তার ফলে তার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও তার শ্রমের ফলগুলি উন্নত করায় তার স্বার্থ ছিল।

পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের বিকাশ ঘটায়, সামগ্রীতে খাজনার জায়গায় এসেছিল **অর্থ খাজনা**; তাতে কৃষক সামন্ত প্রভুকে উদ্বৃত্ত-উৎপাদ সামগ্রীতে দেওয়ার পরিবর্তে নগদ মুদ্রায় দিত। তাই, উৎপাদটি উৎপন্ন করা ছাড়াও কৃষককে তখন সেটি বিক্রয় করতে হত, সেটিকে অর্থে পরিবর্তিত করতে হত। কৃষক উৎপাদন তার প্রাকৃতিক চরিত্র হারিয়ে বাজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগসূত্র গড়ে তুলল। পণ্য সম্পর্কের বিকাশ কৃষকসমাজের প্রভেদনকে (বর্গ-বিভাজনকে) ত্বরান্বিত করল। বাজারের জন্য উৎপাদনে উত্তরণ ঘটায়, কিছু কিছু কৃষক আরও ধনী হয়ে উঠল, আর তাদের বৃহদংশ দারিদ্র্যগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হল। কৃষকদের উপরে শোষণকে নিবিড়তম করার প্রয়াসী সামন্ত প্রভুরাও ক্রমেই বেশি

করে বাজার-সম্পর্কের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। অর্থ খাজনা ছিল সামন্ততান্ত্রিক খাজনার সর্বশেষ রূপ, এবং অর্থ খাজনায় রূপান্তর এটাই দেখিয়েছিল যে সামন্ততন্ত্রের অবনতি ঘটছিল এবং তার দ্বন্দ্বগুলি আরও গুরুতর হয়ে উঠেছিল।

সামন্ততন্ত্রের গোড়ার কালপর্বে শহরগুলির একটা পুনরুজ্জীবন দেখা গিয়েছিল; দাসপ্রথার ভাঙনের সময়ে সেগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। শহরগুলি সাধারণত আত্মপ্রকাশ করেছিল অযাজকীয় অথবা যাজকীয় সামন্ত প্রভুদের বাসভবনকে কেন্দ্র করে। শেষ পর্যন্ত শহরগুলি হয়ে উঠেছিল বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের কেন্দ্র। কারুশিল্পী ও বণিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল গিল্ডগুলিতে (প্রথম কারুশিল্প গিল্ড গঠিত হয়েছিল ইতালিতে ১০ম শতাব্দীতে)। কারুশিল্প গিল্ডগুলি উৎপাদনের কৃৎকৌশল, সামগ্রীর পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষ নির্ধারিত করে বিশদ নিয়ম স্থির করত, কাঁচামাল ক্রয় ও পুরো-তৈরি উৎপাদগুলির বিপণন নিয়ন্ত্রণ করত। ওস্তাদ কারুশিল্পীর ছিল নিজস্ব ঠিকামজুর ও শিক্ষানবিস। প্রথমে, কাজে যে নিজেই অংশগ্রহণ করত সেই ওস্তাদ-প্রভু আর তার অধীনস্থদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল পিতৃতান্ত্রিক। পরে, ঠিকামজুর আর শিক্ষানবিসদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়, ওস্তাদ নিজে কাজ করা বন্ধ করে দিতে থাকে, এবং তার অধীনস্থরা পরিণত হয় মজুরি-শ্রমিকে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশে নেতৃভূমিকা ক্রমেই বেশি করে গ্রাম থেকে শহরে সরে যেতে থাকে। শহরের

উপরে গ্রামের রাজনৈতিক আধিপত্য ছিল সামন্ত প্রভুত্বের রূপে, আর শহর গ্রামকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষণ করত চড়া দাম, কর, গিল্ড প্রথা, বণিকসুলভ প্রতারণা আর কুসীদবৃত্তির মধ্য দিয়ে।

উন্নত সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শহুরে জনসমষ্টি অত্যন্ত বর্গ-বিভাজিত ছিল সম্পত্তি-মালিকানা ও সামাজিক দিক দিয়ে। তা দুই মেরুপ্রান্তে বিভক্ত ছিল, তার এক দিকে ছিল ধনী বণিক, কুসীদজীবী, ও শীর্ষস্থানীয় গিল্ড-মাস্টাররা, অন্য দিকে ছিল শহুরে গরিব, শিক্ষানবিস ও ঠিকামজুররা। শহরগুলিতে যারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই নিম্নতর শহুরে বর্গের লোকেরা শহুরে উঁচু মহল ও সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই সংগ্রাম ঘৃণিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষক যুদ্ধের সঙ্গে এসে মিশেছিল।

সামন্ততন্ত্রে উৎপাদিকা শক্তিগুলি কিছু মাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। অর্থনীতিতে যার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সেই কৃষিতে পর্যায়ক্রমে শস্যারোপণের দুই-ক্ষেতি ব্যবস্থা থেকে তিন-ক্ষেতি ব্যবস্থায় অগ্রগতি ঘটেছিল লোহার লাঙলের ফলা, মই ও অন্যান্য ধাতব উপকরণ এবং চাষের পশু ব্যবহারের সাহায্যে। বাতচক্র আর জলচক্রগুলি ছিল সামন্ততন্ত্রের কৃৎকৌশলগত কৃতিত্বগুলির অন্যতম। ধাতু গলন ও ধাতু-কর্মে ব্যবহৃত কৃৎকৌশলের উৎকর্ষ ঘটানো হয়েছিল, এবং তাঁত ব্যবহৃত হয়েছিল ব্যাপকতর পরিসরে। নতুন উদ্ভাবনগুলির মধ্যে ছিল কাগজ, বই ছাপাই, ঘড়ি ও কম্পাস, যা জাহাজ-চলাচলের বিকাশসাধনে সাহায্য করেছিল। কিন্তু

উৎপাদন ও বিনিময়ের অধিকতর বিকাশের পথে বাধা হয়ে উঠেছিল গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক (কৃষকদের ব্যক্তিগত পরনির্ভরশীলতা), শহরগুলিতে গিল্ড নিয়ম, রাষ্ট্রের সামন্ততান্ত্রিক খণ্ডবিক্ষিপ্ততা এবং সামন্ত প্রভুদের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ আর বিরোধ।

সামন্ততন্ত্রের দ্বন্দ্বগুলিকে জটিলতর করা ও তার ভাঙনের ক্ষেত্রে বাণিজ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদককে (হস্তশিল্পী বা কৃষককে) উৎপাদনের উপায় যুগিয়ে ও তার উৎপাদগুলি বিপণন করে, বণিক-ব্যবসায়ী তাকে পদানত করে রেখেছিল। ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকরা নামত তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখলেও, আসলে তারা মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত বেশি ধনী কিছু কিছু ওস্তাদ কারুশিল্পী পুঁজিপতিতে পরিণত হল, আর তাদের ঠিকামজুর ও শিক্ষানবিসরা তাদের উদ্যোগে কাজ করতে লাগল ভাড়ায়; তারা দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়ে পরিণত হতে লাগল প্রলেতারিয়েতে।

কুটির শিল্প, সহযোগিতা ও ম্যানুফ্যাকচারের রূপে পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি ১৫শ শতাব্দীর শেষ ও ১৬শ শতাব্দীর গোড়ায় সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের সময়ে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সমস্ত তথ্য ও ঘটনা সেই সব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের বক্তব্যকে নাকচ করে, যাঁরা সামন্ততন্ত্রকে এক ধরনের 'ভ্রূণাবস্থার পুঁজিবাদ' হিসেবে উপস্থিত করতে এবং তার নিজস্ব সামাজিক-

অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তুটি তা থেকে বাদ দিতে চেষ্টা করেন।

ইউরোপীয় ও প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিরাট পরিসরে বিকাশলাভ করে, তাতে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয় আরবীয় ও বাইজেনটাইন বণিকরা, এবং ইউরোপীয় দেশগুলির নিজেদের মধ্যেও বাণিজ্য প্রসারিত হয়। ১৫শ শতাব্দীতে আমেরিকা আবিষ্কার ও ভারতে যাওয়ার এক নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার, এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া, ইস্টার্ণ, গিনিয়ান ও অন্যান্য বাণিজ্য কোম্পানি স্থাপন বাণিজ্যের বিকাশের পক্ষে ও বিশ্ব বাজার গঠনের পক্ষে অনেকখানি কাজ করেছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, বিশেষত বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, **কুসীদবৃত্তি** এক বিরাট ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। কুসীদজীবীরা সামন্ত প্রভুদের ও মঠগুলিকে অর্থ ধার দিত গলা-কাটা সুদের হারে (১০০-২০০ শতাংশ), এইভাবে কৃষকদের গোলামসুলভ শ্রমোৎপন্ন উদ্বৃত্ত-উৎপাদের বেশ বড় একটা অংশ তারা আত্মসাৎ করত। কৃষক ও হস্তশিল্পীরাও কঠোর শর্তে অর্থ ধার করত, যার ফলে সাধারণত তারা সর্বস্বান্ত হয়ে প্রলেতারিয়েতে পরিণত হত।

সুতরাং, শহর ও গ্রামে পুঁজিবাদী সম্পর্ক পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজেরই অন্ত্রের ভিতরে; আর নিপীড়িত জনসাধারণের সংগ্রাম, মুখ্যত সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছিল। কৃষক যুদ্ধগুলি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষয়গ্রস্ত ও

দুর্বল করেছিল, আগমনী ঘোষণা করেছিল বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির।

বুর্জোয়া, বুর্জোয়ায় পরিণত হওয়া সম্ভ্রান্তসমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে হিংসা ও বলপ্রয়োগের ব্যাপক ব্যবহার পুঁজিবাদের অভ্যুদয় ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। যেমন, সাক্ষাৎ উৎপাদকদের, সর্বোপরি কৃষকদের জবরদস্তি করে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল উৎপাদনের উপায় থেকে, এবং সম্পদ, অর্থ ও জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। এটাই ছিল **পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের** প্রক্রিয়া। ইংলণ্ডে তা শুরু হয়েছিল ১৫শ শতাব্দীর শেষ তৃতীয় ভাগে, এবং স্থায়ী হয়েছিল ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। যাত্রাবিন্দুটি ছিল বস্ত্র ম্যানুফ্যাকচারগুলির বিকাশ, যা পশমের চাহিদা বাড়িয়েছিল এবং যার ফলে পশমের দামও তদনুযায়ী বেড়েছিল। মেষ পালন মুনাফাদায়ক হওয়ায়, ভূস্বামীরা কৃষকদের জমি জবরদস্তি 'পরিবেষ্টন' করার আশ্রয় নিয়েছিল, কৃষকদের তাদের জমির টুকরো থেকে বিতাড়িত করে জমিগুলিকে পরিণত করেছিল মেষচারণ ভূমিতে। সেই থেকে জন্ম নিয়েছিল এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ, যারা সামন্ততান্ত্রিক গোলামী থেকে মুক্ত অথচ তাদের উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত। এরাই ছিল প্রলেতারিয়েত। টিকে থাকার জন্য তারা জায়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে, তাদের উদ্যোগগুলিতে কাজ করতে বাধ্য হত।

পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি সংগঠিত করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন ছিল, এবং বণিক,

কুসীদজীবী, আর ধনী হস্তশিল্পীদের সঞ্চয়ন সেই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জায়মান বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল অ-তুল্যমূল্য বাণিজ্যের সাহায্যে, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় জনসমষ্টিকে লুণ্ঠন ও নিশ্চিহ্ন করে, বোম্বেটেগিরি আর দাস ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে। অতি অল্প কালের মধ্যে, শুধু আমেরিকাতেই নির্মূল করা হয়েছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ স্থানীয় অধিবাসীকে। পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ে হিংসা এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল, যদিও তা নিজেই কোনো নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক সৃষ্টি করে নি।

সংরক্ষণবাদের রাষ্ট্রীয় নীতি পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। তার অর্থ ছিল এই যে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে জাতীয় পুঁজিপতিদের রক্ষা করে এবং জাতীয় শিল্পের বিকাশ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বিদেশী সামগ্রী আমদানির বিরুদ্ধে চড়া শুল্কের বেড়া তোলা হয়েছিল।

সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ ঘটেছিল বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির ফলে। প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি হয়েছিল নেদারল্যান্ডসে (১৬শ শতাব্দীতে), ইংলণ্ডে (১৭শ শতাব্দীতে) ও ফ্রান্সে (১৮শ শতাব্দীতে)। সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে কৃষক ও হস্তশিল্পীদের সংগ্রামকে বুর্জোয়ারা ব্যবহার করেছিল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্য এবং পুঁজিবাদী বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার জন্য।

একবার ক্ষমতায় আসার পর, বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের

উপরে শোষণ নিবিড় করে তুলেছিল, কিন্তু শ্রমিকদের অটল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে একটা সমঝোতায় এসেছিল সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে, তখনও পর্যন্ত যাদের হাতে ছিল যথেষ্ট জমি ও অন্যান্য সম্পদ। সামন্ত প্রভুরা, ভূস্বামীরা কৃষকদের শোষণ করে চলতে লাগল, কিন্তু সেটা নতুন, বুর্জোয়া রূপে, তার সঙ্গে ছিল শ্রম-কৃত্যক বা ভাগ-চাষের মতো কিছু অতীত সামন্ততান্ত্রিক শোষণের রূপের জের। সামন্ততন্ত্রের, খাজনার প্রাক-পুঁজিবাদী রূপগুলির জের ও অবশেষ কিছু কিছু পুঁজিবাদী দেশে এখনও বিদ্যমান রয়েছে, যেমন ইতালিতে, পোর্তুগালে, স্পেনে ও গ্রীসে।

সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলি সবচেয়ে নাছোড় হয়ে টিকে আছে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার শিল্পগতভাবে পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে, সেখানে নয়া-উপনিবেশবাদীরা সর্বপ্রকারে এগুলিকে চিরস্থায়ী করে রাখতে চেষ্টা করে, কেননা তা তাদের ধনবান হতে সাহায্য করে, এবং প্রগতির পথে সদ্যমুক্ত দেশগুলির বিকাশকে বিঘ্নিত করে। এই সমস্ত দেশে জনসাধারণের উপরে শোষণের সামন্ততান্ত্রিক রূপগুলি বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলির সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের সঙ্গে ও জাতীয় পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষণের সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যায়। সেই জন্যই, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা জাতিগুলি সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে, সর্ব রূপে শোষণের অবসানের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে মিশে যায়।

অধ্যায় ৮

পঁজির যেখানে সর্বময় কর্তৃত্ব

একটি সমাজব্যবস্থা হিসেবে পঁজিবাদ এখন পৃথিবীর বৃহত্তর অংশ অধিকার করে রয়েছে। তার অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত (পূর্ববর্তী উৎপাদন-প্রণালীগুলির তুলনায়) ইতিহাসে, পঁজিবাদ ক্ষমতাশালী উৎপাদিকা শক্তির জন্ম দিয়েছে ও তার বিকাশ ঘটিয়েছে। সেই সঙ্গে, আপোসহীন দ্বন্দ্বে তা দীর্ণ: অতি-উৎপাদন, বেকারি ও মুদ্রাস্ফীতির অর্থনৈতিক সংকট, ঘোরতর সমরবাদ, বর্ণবাদ, উপনিবেশবাদ ও অন্যান্য অভিশাপ।

১৯ শতাব্দীর শেষ সন্ধিক্ষণে পঁজিবাদ চলে গিয়েছিল তার চূড়ান্ত পর্বে, সাম্রাজ্যবাদের পর্বে, অর্থাৎ, একচেটিয়া, পরগাছাসুলভ ও ক্ষয়িষ্ণু পঁজিবাদের পর্বে, স্পষ্টভাবে উন্মোচন করেছিল তার ঐতিহাসিকভাবে অচিরস্থায়ী প্রকৃতি। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয় সাম্রাজ্যবাদের শিকলে প্রথম

ভাঙন ঘটিয়েছিল, আনয়ন করেছিল তার সাধারণ সংকটের পর্যায়, যখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাদেশেই দেশগুলি পুঁজিবাদ থেকে চ্যুত হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। বর্তমানে, এক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম চলছে দুটি বিপরীত সমাজব্যবস্থা: সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদের মধ্যে। এই অবস্থায়, বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদরা এ কথা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যে মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থে বিধৃত পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ আর লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক মতবাদ দুটোই সেকেলে হয়ে গেছে এবং গত কয়েক দশকে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যে সমস্ত গুণগত নতুন পরিবর্তন ঘটেছে, তার প্রতিফলন তাতে ঘটে না।

সত্যি বটে, অগ্রসরমান বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লব, রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও অন্যান্য ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন অবস্থার সঙ্গে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়ে চলেছে ও খাপ খাইয়ে চলেছে। কিন্তু সমস্ত আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও, পুঁজিবাদী উৎপাদনের বুনিয়াদি সারমর্ম, পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণ, মার্কসের কাল থেকে আজ পর্যন্ত বদলায় নি।

অতীতের মতো এখনও, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদের রচনাগুলি তাদের সকলের কাছেই বিধিগ্রন্থস্বরূপ, যারা পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালী সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে চায়, সঠিক তত্ত্বগত-পদ্ধতিবিদ্যাগত অবস্থান থেকে তাকে পরীক্ষা করতে চায়।

পণ্য উৎপাদন কী?

মানবজাতির বিকাশের আদি পর্যায়গুলিতে প্রাকৃতিক অর্থনীতির প্রাধান্য ছিল। গোষ্ঠীপতিপ্রধান কৃষক গৃহস্থালি, দাস-মালিক লাতিফুন্দিয়া ও সামন্ততান্ত্রিক তালুকগুলি ছিল সারগতভাবে প্রাকৃতিক।

তাই, প্রাকৃতিক উৎপাদনের পণ্য উৎপাদনে রূপান্তরের শর্তগুলি কী? প্রথমত, পণ্য উৎপাদনের জন্য দরকার সামাজিক শ্রম বিভাজনের বিকাশ। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়, কেননা শ্রম বিভাজন ছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাচীন ভারতীয় লোক-সম্প্রদায়েও, যাদের সদস্যদের মধ্যে ছিল ভূস্বামী, কর্মকার, কুম্ভকার, ছুতোর, ইত্যাদি। কিন্তু তারা যা কিছু উৎপাদন করত সে সবই সমতাবাদী নীতির ভিত্তিতে সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হত ক্রয় বা বিক্রয় ছাড়াই। সেটা হত, তার কারণ শ্রমের উৎপাদ ছিল সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন, তার একক সদস্যদের নয়।

দ্বিতীয়ত, যে শর্তটি পণ্য উৎপাদনের জন্ম দিয়েছিল তা হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানার আত্মপ্রকাশ। হস্তশিল্পী যখন উৎপাদনের উপায় ও তার ফলস্বরূপ উৎপাদগুলির মালিক হয়, সে তখন তার শ্রমের উৎপাদগুলি বিক্রয় করতে পারে। ফলত, এই দুইটি বিষয়ের মিলন — উৎপাদকদের মধ্যে সামাজিক শ্রম বিভাজন ও উৎপাদনের উপায়ের উপরে

ব্যক্তিগত মালিকানা — অবশ্যম্ভাবীরূপেই পণ্য উৎপাদনের জন্ম দেয়।

পণ্য উৎপাদনের দুইটি ঐতিহাসিক রূপ আছে: প্রথম, কৃষক, হস্তশিল্পী, প্রভৃতিদের **সরল পণ্য উৎপাদন,** এবং দ্বিতীয়, **পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন।** এ দুটি একই ধরনের, কেননা উভয়েরই ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা, এবং পণ্যসামগ্রীর বিনিময় হল স্বতঃস্ফূর্ত ও এলোমেলো।

কিন্তু সরল ও পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনের মধ্যে সারগত প্রভেদও আছে। সরল পণ্য উৎপাদনে উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের উৎপাদটির মালিক উৎপাদক স্বয়ং, মানুষের উপরে মানুষের শোষণ সেখানে নেই। পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনে, সাক্ষাৎ উৎপাদক উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং উৎপাদটি তার নয় বরং উৎপাদনের উপায়ের মালিক পুঁজিপতির, যে মজুরি-শ্রমিককে শোষণ করে।

পুঁজিবাদে, বেশির ভাগ উৎপাদই উৎপন্ন হয় বিক্রয়ের জন্য, অর্থাৎ, সেগুলি হয়ে ওঠে পণ্যসামগ্রী। সেখানে কেনা-বেচা হয় সব কিছু: কল-কারখানা, রেলওয়ে, জমি, ভোগ্যপণ্য, ইত্যাদি। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, উৎপাদনের উপায়ের মালিক হিসেবে পুঁজিপতি আর যারা তাদের শ্রমশক্তি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে সেই মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যেকার সম্পর্কও একটি পণ্য চরিত্র ধারণ করে।

সুতরাং, খুব স্বাভাবিকভাবেই মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্বন্ধে তাঁর তদন্ত শুরু করেছিলেন পণ্যের

এক বিশ্লেষণ দিয়ে। 'পঁুজির' ১ম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, 'যে সমস্ত সমাজে পঁুজিবাদী উৎপাদন-প্রণালীর প্রাধান্য, তাদের সম্পদ নিজেকে উপস্থিত করে 'পণ্যসামগ্রীর এক বিপুল সঞ্চয়ন' হিসেবে, তার একক হল একটিমাত্র পণ্য। সুতরাং আমাদের তদন্ত অবশ্যই শুরু করতে হবে একটি পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়ে।'* এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপেই যথার্থ। সরলতম কোষটির প্রকৃতি না বুঝলে, একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীর জটিল জীবসত্তাটি অধ্যয়ন করা অসম্ভব। তাই, বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক একক — পণ্যের — এক বিশ্লেষণই পঁুজিবাদের সারমর্ম ও তার বিকাশের সমরূপতাগুলি বোঝার চাবিকাঠি।

পণ্য

উপরেই বলা হয়েছে, পণ্য হল শ্রমের একটি উৎপাদ, যা ব্যক্তিগত ভোগের চেয়ে বরং বিক্রয়ের জন্যই, বিনিময়ের জন্যই উদ্দিষ্ট। তার গুণ-ধর্মগুলি কী?

শ্রমের একটি উৎপাদকে একটি পণ্য হতে হলে প্রথমে তা কোনো না কোনো ধরনের মানবিক চাহিদা (ব্যক্তিগত বা সামাজিক) পূরণে সক্ষম হতে হবে, অর্থাৎ সেটিকে একটি **ব্যবহার-মূল্য** হতে হবে। পণ্যের সেই গুণটি নির্ধারিত হয় তার পদার্থগত, রাসায়নিক, যান্ত্রিক ও অন্যান্য গুণ-ধর্মের দ্বারা। এইভাবে, একটি

---

* Karl Marx, *Capital*, Vol. I, p. 43.

কোট বা একজোড়া জুতোর ব্যবহার-মূল্যটা রয়েছে এই ঘটনায় যে সেগুলি পোশাক ও পাদুকার ব্যাপারে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগে। রুটি, মাংস ও দুধ, যেগুলি মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন মেটায় সেগুলির আছে অন্য ব্যবহার-মূল্য। বই পাঠকদের আত্মিক চাহিদা মেটায় এবং যন্ত্র বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে মানুষের সামাজিক প্রয়োজন মেটায়।

স্পষ্টতই, ব্যবহার-মূল্যগুলির পরিধি অতি ব্যাপক। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে একটি পণ্য হওয়ার জন্য, একটি উৎপাদকে তার নিজের উৎপাদকদের চাহিদার পরিবর্তে অন্য লোকেদের চাহিদা পূরণ করতে হবে, অর্থাৎ সেটিকে একটি সামাজিক ব্যবহার-মূল্য হতে হবে। সেটাই স্বাভাবিক, কেননা উৎপাদকের নিজের চাহিদা পূরণের জন্য উদ্দিষ্ট একটি উৎপাদকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা যায় না। শ্রমের একটি উৎপাদ একটি পণ্য হয়ে ওঠে একমাত্র তখনই, যখন সেটি বিনিময়ের জন্য, ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য উদ্দিষ্ট হয়।

পণ্যসামগ্রী একটি অপরটির বদলে বিনিময় হয় নির্দিষ্ট পরিমাণগত অনুপাতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক বস্তা ময়দা দুটি কুড়ুলের বদলে বিনিময় হতে পারে। এক নির্দিষ্ট পরিমাণগত অনুপাতে আরেকটি পণ্যের বদলে একটি পণ্যের বিনিময় হওয়ার ক্ষমতাকে বলা হয় **বিনিময়-মূল্য**।

সুতরাং, একটি পণ্য হতে হলে, শ্রমের একটি উৎপাদের অবশ্যই দুটি গুণ থাকা দরকার:

প্রথম, একটা ব্যবহার-মূল্য, অর্থাৎ, কোনো মানবিক চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা, এবং দ্বিতীয়, একটা বিনিময়-মূল্য, অর্থাৎ, নির্দিষ্ট পরিমাণগত অনুপাতে আরেকটি পণ্যের বদলে বিনিময় হওয়ার ক্ষমতা। পণ্যের এই দুটি গুণ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। তার একটি যদি না থাকে, তবে কোনো পণ্য থাকবে না, যে-পণ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে।

প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে পণ্যসামগ্রী যে পরিমাণগত অনুপাতে একটির বদলে অপরটি বিনিময় হয়, সেই অনুপাতগুলি নিতান্তই আপতিক, কেননা এই অনুপাতগুলি বদলে চলে। কিন্তু দেখা গেছে যে একটা কালপর্ব ধরে ওঠাপড়াগুলি ঘটে কোনো গড় স্তরকে কেন্দ্র করে এবং এই সমস্ত ওঠাপড়ার গোটা সময়টা ধরে একটি পণ্য আরেকটি পণ্যের চেয়ে বেশি ব্যয়সাপেক্ষ থাকে: দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোনার দাম রুপোর চেয়ে বেশি, এবং রুপোর দাম লোহার চেয়ে বেশি। তা হলে, পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে পরিমাণগত অনুপাতগুলি কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়?

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা সেই প্রশ্নটির উত্তর দেন বিভিন্নভাবে। কেউ কেউ মনে করেন যে একটি পণ্যের বিনিময়-মূল্য নির্ধারিত হয় যোগান ও চাহিদার সম্পর্ক দিয়ে। তাঁরা শুরু করেন এই অনুমান থেকে যে একটি পণ্যের চাহিদার চেয়ে যোগান যখন বেশি হয়, তখন তার দাম নিম্নগামী হতে থাকে, এবং যখন চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি হয় তখন পণ্যটির দাম

ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে। কিন্তু যোগান ও চাহিদার যদি সমাপতন ঘটে তা হলে একটি পণ্যের দাম কিসের দ্বারা নির্ধারিত হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর এই ধরনের যুক্তিধারা থেকে পাওয়া যায় না। পরিমাণগত অনুপাতগুলির অল্পবিস্তর স্থিতিশীল যে স্তরটিকে কেন্দ্র করে দামের ওঠাপড়া ঘটে তা কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় কিংবা সমস্ত ওঠাপড়াতেই সোনা কেন রুপোর চেয়ে বেশি ব্যয়সাপেক্ষ এবং রুপো লোহার চেয়ে বেশি ব্যয়সাপেক্ষ, সে সব প্রশ্নের উত্তরও এ থেকে পাওয়া যায় না।

বহু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে অনুপাতগুলির ব্যাখ্যা করেন পণ্যসামগ্রীর উপযোগিতা দিয়ে। তাঁদের মতে, একটি পণ্যের উপযোগিতা যত বেশি, তার ব্যবহার-মূল্য তত বেশি এবং তার দামও তত বেশি। কিন্তু গুণগতভাবে পৃথক ব্যবহার-মূল্যগুলি তুলনা করা যায় কীভাবে? ধরুন, একটি লেবু-জাতীয় ফলের ব্যবহার-মূল্য আর একটি বইয়ের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে অভিন্ন জিনিসটা কী? ব্যবহার-মূল্যে যে পার্থক্য উৎপাদকের যেটা নেই সেই ব্যবহার-মূল্য পেতে আকাঙ্ক্ষী করে, তা হল পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ের এক চালক-শক্তি, কিন্তু তা সেই বিনিময়ের পরিমাণগত অনুপাতগুলি নির্ধারণ করতে পারে না।

পণ্য-মূল্য

পণ্যসামগ্রীর পরিমাণগত তুলনার নিহিতার্থ এই যে সেগুলির অভিন্ন কিছু একটা আছে, যা

সেগুলিকে প্রমেয় করে তোলে। পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার-মূল্যগুলির মধ্যে সমস্ত প্রভেদ সত্ত্বেও, সেগুলির সবারই একটা অভিন্ন গুণ আছে: **শ্রমের উৎপাদ** হওয়ার গুণ। পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমই সেগুলির বিনিময় হওয়ার অনুপাত স্থির করার একমাত্র সম্ভাব্য ভিত্তি। কিন্তু বিভিন্ন উৎপাদক একই ধরনের পণ্য উৎপাদনে অসম পরিমাণ শ্রম ব্যয় করে। সেটা নির্ভর করে কৃৎকৌশলগত স্তর ও শ্রম উৎপাদনশীলতায় পার্থক্য, দক্ষতার মান ও শ্রমের নিবিড়তায় পার্থক্যের মতো বিষয়গুলির উপরে। একটি পণ্যের মূল্য যদি প্রতিটি একক উৎপাদকের দ্বারা সেটির উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম-সময়ের পরিমাণের উপরে নির্ভর করত, তা হলে সেটির উৎপাদনে বেশি সময় যে ব্যয় করত, সে-ই একটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকত। সেই জন্যই একটি পণ্যের মূল্য (তার **সামাজিক মূল্য**) নির্ধারিত হয় গড়পড়তা সামাজিকভাবে স্বাভাবিক অবস্থায়, সেই সময়ে প্রচলিত শ্রম দক্ষতা ও নিবিড়তার গড়পড়তা মাত্রায় সেটি উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের পরিমাণ দিয়ে। এই ধরনের শ্রম-সময়কে বলা হয় **সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়**, এবং তা পণ্যের সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করে।

শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্র

পণ্যের যেহেতু দুটি গুণ আছে — ব্যবহার-মূল্য ও মূল্য — তাই তার মধ্যে মূর্ত শ্রমেরও সেই রকম দ্বিবিধ চরিত্র আছে।

সমাজে বহুবিচিত্র ধরনের শ্রম বহুবিচিত্র ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে। প্রতিটি ব্যবহার-মূল্যে এক নির্দিষ্ট ধরনের শ্রম মূর্ত থাকে: খাদ্যশস্যে মূর্ত থাকে একজন চাষীর শ্রম; পোশাকে, একজন দর্জির; ইস্পাতে, একজন ইস্পাত শ্রমিকের। **মূর্ত শ্রম** নির্দিষ্ট সব ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে।

খাদ্যশস্য ও পোশাকের মতো পণ্যসামগ্রী বিনিময় করতে গিয়ে, যে বিভিন্ন মূর্ত ধরনের শ্রম এই সমস্ত পণ্যসামগ্রী সৃষ্টি করে, সেটাকে নজরের মধ্যে রাখি না। এখানে খাদ্যশস্য ও পোশাক হল মানুষের কায়িক ও মানসিক প্রচেষ্টার উৎপাদ, সাধারণভাবে শ্রম ব্যয়ের উৎপাদ, সেই শ্রমের পার্থক্যটা শুধু পরিমাণে, গুণে নয়। মূর্ত ধরনের শ্রমকে গণ্য না করে সাধারণভাবে এই ধরনের শ্রমকে বলা হয় **বিমূর্ত শ্রম**। এই শ্রম একটি পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে।

তাই, এক দিকে, শ্রম হল মূর্ত এবং তা ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে। অন্য দিকে, যে কোনো পণ্য উৎপাদকের শ্রম হল সাধারণভাবে শ্রমের ব্যয়, বা বিমূর্ত শ্রম, যা সামাজিক শ্রমের সমগ্র পরিমাণের একটা অংশ এবং যা একটি পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে। ভাষান্তরে, একজন পণ্য-উৎপাদকের শ্রমের দুটি দিক আছে, তা হল একাধারে মূর্ত ও বিমূর্ত।

সারসংক্ষেপ করে, এই সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে যে **একটি পণ্যের মূল্য হল সেটির উৎপাদনে ব্যয়িত ও পণ্যটিতে মূর্ত সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় বিমূর্ত শ্রম।** সুতরাং, একটি পণ্যের মূল্যের **মোট পরিমাণ**

মূল্যও নির্ধারিত হয় শ্রম-সময়ের স্থায়িত্বকাল দিয়ে। একটি পণ্যের উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের ব্যয় যত বেশি, তার মূল্যও তত বেশি। শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে, একটি পণ্য-এককের মূল্য হ্রাস পায়।

মার্কসই সর্বপ্রথম শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্র আবিষ্কার করেছিলেন, পুঁজিবাদী উৎপাদনের সারমর্ম ও তার বিকাশের নিয়মগুলি উদ্‌ঘাটন করার ক্ষেত্রে তা ছিল বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস মনে করতেন যে শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্র হল সেই 'কেন্দ্রবিন্দু যার উপরে আবর্তিত হচ্ছে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধি'।*

•

ব্যক্তিগত ও সামাজিক শ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্ব

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত দ্বন্দ্ব ভ্রূণাবস্থায় থাকে পণ্যসামগ্রীর মধ্যে। আমরা আগেই দেখেছি, মূল্য হল পণ্যে মূর্ত সামাজিক শ্রম। সেই সঙ্গে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানাভিত্তিক এক অর্থনীতিতে পণ্য উৎপাদকের শ্রমের একটা ব্যক্তিগত চরিত্র থাকে। সে কী উৎপন্ন করে, সেটা তার নিজস্ব, ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে উৎপন্ন করতে পারে তার যা খুশি: পোশাক, পাদুকা, আসবাব, রুটি, প্রভৃতি, এবং প্রথম নজরে মনে হয় যে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সেই ধারণাটা অলীক, কেননা বাস্তবিকপক্ষে পণ্য উৎপাদক

* Karl Marx, *Capital,* Vol. I, 1984, p. 49.

সামাজিক শ্রম বিভাজনে বাঁধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পোশাক তৈরি করার জন্য একজন দর্জির এমন অন্য অনেক বস্তু দরকার হয়, যেগুলি সে নিজে তৈরি করে না। তাই, সে অন্যান্য পণ্য উৎপাদকের উপরে নির্ভর করে, যারা ঠিক সেই দর্জির মতোই ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিক। সাক্ষাৎভাবে একটা ব্যক্তিগত চরিত্র থাকার সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেক পণ্য উৎপাদকের শ্রম সামাজিক শ্রমের পুঞ্জটির একটি অংশ। কিন্তু সেই সামাজিক চরিত্র গোপন থাকে, বাজারে তা শুধু প্রকাশ পায় পণ্য বিনিময়ের প্রক্রিয়ায়। উৎপাদক যখন তার পণ্যটিকে বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে আসে, একমাত্র তখনই সে দেখতে পায় সেই পণ্যটি সমাজের দরকার কি না, অর্থাৎ তার শ্রম সামাজিক শ্রমের একটা অংশ কি না। সে যদি এমন একটি পণ্য উৎপন্ন করে থাকে যেটি সমাজের দরকার নেই, তা হলে সেটি বিক্রি হবে না। ভাষান্তরে, সেটির ব্যবহার-মূল্য সমাজের দ্বারা স্বীকৃত হবে না, এবং সেটির উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম হবে পণ্ডশ্রম। প্রায়শ এর উল্টোটাও ঘটে: যার একটা সামাজিক ব্যবহার-মূল্য আছে এবং যেটি সমাজ ও তার সদস্যদের কাছে প্রয়োজনীয় এমন একটি পণ্য বিক্রি হতে পারে না জনসাধারণের দারিদ্র্যহেতু, সেটা কেনার মতো অর্থ তাদের থাকে না। সে ক্ষেত্রে, পণ্যটির উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমও অপচিত হয়। এই ব্যাপারগুলি হল পণ্যের ব্যবহারমূল্য ও তার মূল্যের মধ্যে, মূর্ত ও বিমূর্ত শ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলির এক বহিঃপ্রকাশ,

যেগুলি প্রকাশ করে সরল পণ্য উৎপাদনের মূল দ্বন্দ্বকে: ব্যক্তিগত ও সামাজিক শ্রমের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে।

তাই, পণ্য উৎপাদকদের শ্রমের আছে একাধারে সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত ও সুপ্ত সামাজিক এক চরিত্র, শেষোক্তটি প্রকাশ পায় শুধু পরোক্ষভাবে, বাজারে ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যেখানে বস্তুনিচয়ের মধ্যে, পণ্যসামগ্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি, সেখানে মার্কস উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন এক বস্তুগত বহিরাবরণে ঢাকা মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক।

মূল্যের নিয়মটি কীভাবে কাজ করে?

পণ্য উৎপাদনের গতিবিধি ও বিকাশের অর্থনৈতিক নিয়মই হল **মূল্যের নিয়ম।** তার সারমর্ম এই যে পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন ও বিনিময় হয় সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম বিনিয়োগ অনুযায়ী।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানাভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের অবস্থায় মূল্যের নিয়মটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও এলোমেলোভাবে কাজ করে প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের মধ্যে। তার ক্রিয়ার তিনটি প্রধান রূপ আছে।

প্রথম, মূল্যের নিয়ম বিভিন্ন শিল্প শাখার মধ্যে সামাজিক শ্রম বিভাজনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়মন করে যোগান ও চাহিদার সম্পর্কের ক্ষেত্রে

পরিবর্তনগুলির অভিঘাতে সেগুলির মূল্যকে কেন্দ্র করে দামের নিয়ত ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে। যোগান ও চাহিদার পরিবর্তনগুলির অভিঘাতে, দামে একটা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন ঘটে এবং যে সমস্ত শিল্পের পণ্যসামগ্রীর চাহিদা কম (তার সঙ্গে সঙ্গে দামও কম), পণ্য উৎপাদকরা সেই সমস্ত শিল্প পরিত্যাগ করে এমন সব শিল্পের দিকে যায় যেখানে চাহিদা বেশি (দামও বেশি), এবং তার ফলে আবার এই উৎপাদকদের পরিত্যক্ত শিল্পগুলিতে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর চাহিদায় বৃদ্ধি ঘটবে এবং, বিপরীতপক্ষে, যেখানে উৎপাদন প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়ে সেই সমস্ত শিল্পে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পাবে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশ ঘটায়, যখন বড় বড় উদ্যোগে বিপুল পণ্যসামগ্রীপুঞ্জ উৎপন্ন হয়, তখন এই সমস্ত ওঠাপড়ার স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র, উৎপাদনের নৈরাজ্য সবচেয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রকট হয়। তা পুঁজিবাদে সহজাত, এবং অর্থনৈতিক সংকটগুলির সময়ে তা তুঙ্গে গিয়ে পৌঁছয়।

দ্বিতীয়, মূল্যের নিয়মের ক্রিয়ার অনুষঙ্গী হল পণ্য উৎপাদকদের প্রভেদন (বর্গ-বিভাজন), যাদের বেশির ভাগই সর্বস্বান্ত হয়ে প্রলেতারিয়েতে পরিণত হয়, আর অল্প কয়েকজন সমৃদ্ধিশালী হয়ে পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। সেটা ঘটে কীভাবে? পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন কৃৎকৌশলগত স্তরে ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রম উৎপাদনশীলতায়, যার ফলে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকদের উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর একক মূল্য

একই প্রকার হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরে নেওয়া যাক যে একজন উৎপাদক একটি পণ্য তৈরি করে ১০ ঘণ্টায়, আরেকজন ১৫ ঘণ্টায়, অথচ বাজারে সেই পণ্যটি বিক্রয় হবে তার যথামূল্যে, যা নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় দিয়ে। সেই সময়টা যদি, ধরুন, ১২ ঘণ্টার সমান হয়, তা হলে প্রথম উৎপাদক তার পণ্যটি বিক্রি করে স্পষ্টতই একটা বাড়তি আয় পকেটস্থ করবে, আর শেষোক্ত উৎপাদক লোকসান করবে। সেইভাবে, প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের মধ্যে কিছু উৎপাদক সর্বস্বান্ত হবে, অন্যরা সমৃদ্ধিশালী হবে।

অধুনাতম প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক যন্ত্রপ্রধান উৎপাদন ক্ষুদ্র উৎপাদকদের আয়ত্তের বাইরে, পুঁজিপতির হাতে তা প্রতিযোগিতার এক শক্তিশালী হাতিয়ার। কৃৎকৌশলগত নবোদ্ভাবনাগুলি প্রবর্তন করে পুঁজিপতিরা তাদের পণ্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস করে, আরও প্রতিযোগিতাক্ষম হয়, এবং ব্যাপক ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদকদের সর্বনাশ করে।

তৃতীয়, মূল্যের নিয়মের ক্রিয়া পণ্য উৎপাদনের স্বতঃস্ফূর্ত কৃৎকৌশলগত প্রগতির সহায়ক হয়। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, এবং পণ্যসামগ্রীর সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় মূল্যের তুলনায় পণ্যসামগ্রীর একক মূল্য কমায়, এবং তা থেকে পাওয়া যায় বাড়তি আয়। সেই জন্যই পণ্য উৎপাদকরা তাদের আয় বাড়ানোর উপায় হিসেবে ও প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে একটা অস্ত্র হিসেবে কৃৎকৌশলগত প্রগতিতে অর্থনৈতিকভাবে আগ্রহী।

অর্থ কী?

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, মানবেতিহাসে এমন একটা সময় ছিল, যখন অর্থের অস্তিত্ব ছিল না, লোকের তা দরকার হত না। সেগুলি ছিল আদিম-সম্প্রদায়গত ব্যবস্থার দিন। অর্থ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল দাস-মালিক সমাজে। কোনো কোনো বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে অর্থ হল প্রকৃতির দান, কেননা সোনা ও রুপোর স্বাভাবিক, সহজাত গুণাবলীই সেগুলিকে অর্থে পরিণত করে। অন্যরা মনে করেন যে অর্থ হল রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকলাপের ফল।

মার্কসই সর্বপ্রথম অর্থের অন্তঃসার ও উৎপত্তির এক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। অর্থ আত্মপ্রকাশ করেছিল পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, মূল্যের রূপগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

একটি পণ্যের মূল্য প্রকাশ করা যায় একমাত্র আরেকটি পণ্যের সঙ্গে তাকে সমীকৃত করেই, আরেকটি পণ্যের বদলে তার বিনিময়ের মধ্য দিয়েই। কিন্তু উন্নত পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের অবস্থায়, পণ্যসামগ্রী একটি অপরটির বদলে প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় হয় না, বরং সবগুলি পরিমাপ করা হয় অর্থের হিসাবে, যার ফলে প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্য প্রকাশ করা হয় এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থে। অর্থ হল বিশ্বজনীন পণ্য, বিশ্বজনীন তুল্যমূল্য।

পণ্য উৎপাদনের অধীনে, উৎপাদকদের শ্রম-বিনিয়োগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূল্যায়িত হয় অর্থের সাহায্যে।

পণ্যসামগ্রীতে অঙ্গীভূত শ্রম প্রত্যক্ষভাবে শ্রম-সময়ে পরিমাপ করা হয় না, হয় পরোক্ষভাবে, অর্থের সঙ্গে সমস্ত পণ্যসামগ্রীর সমীকরণের মধ্য দিয়ে। অর্থের আত্মপ্রকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, পণ্যসামগ্রীর সমগ্র জগৎটা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল দুই মেরুপ্রান্তে: এক মেরুপ্রান্ত সমস্ত প্রথাগত পণ্যসামগ্রী, এবং অন্য মেরুপ্রান্তে এক বিশেষ পণ্য হিসেবে অর্থ। অর্থ এক বিশেষ সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে শুরু করেছিল এক বিশ্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে, সমস্ত পণ্যসামগ্রীর মূল্যের এক অভিন্ন পরিমাপ হিসেবে।

অর্থের অন্তঃসার প্রকাশিত হয় তার ক্রিয়াগুলিতে। পুঁজিবাদে অর্থ ক্রিয়া করে এইভাবে: ১) **মূল্যের একটি পরিমাপ,** ২) **সঞ্চলনের একটি মাধ্যম,** ৩) **মজুতের একটি উপায়,** ৪) **পরিশোধের একটি উপায়,** ও ৫) **বিশ্বজনীন অর্থ।**

সমস্ত পণ্যের মূল্যই প্রকাশিত হয় অর্থের হিসাবে। সেই ক্রিয়াটি — **মূল্যের পরিমাপ** হিসেবে — অর্থ সম্পন্ন করে এক ভাবগত ক্রিয়া হিসেবে, অর্থাৎ একটি পণ্যের মূল্য মানসিকভাবে সমীকৃত হয় অর্থের মূল্যের সঙ্গে। ভাবান্তরে, এই ক্রিয়াটির জন্য কোনো বাস্তব অর্থ দরকার হয় না। প্রত্যেক পণ্যেরই একটা দাম আছে। দাম হল একটি পণ্যের মূল্যের অর্থমুদ্রাগত অভিব্যক্তি। একটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করার জন্য একটা দামের মান থাকা দরকার, যেটি হল অর্থের একটি একক হিসেবে স্বীকৃত সোনার একটা স্থিরীকৃত পরিমাণ। একটি সামাজিক পরিমাপ হিসেবে মূল্যের

বিপরীতে, দামের মান হল একটা প্রয়োগগত পরিমাপ। প্রত্যেক দেশের আছে তার দামের নিজস্ব জাতীয় মান, নিজস্ব অর্থমুদ্রাগত একক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডলার, ব্রিটেনে পাউন্ড স্টার্লিং, ফ্রান্সে ফ্রাঙ্ক, ইত্যাদি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডিসেম্বর ১৯৭১ অবধি মার্কিন ডলারে ছিল ০·৮৮৮৬৭১ গ্রাম সোনা। তাই, একটা জিনিসের দাম ৮·৮৮৬৭১ গ্রাম সোনা এ কথা বলার পরিবর্তে আমরা বলি যে সেটার দাম ১০ ডলার।

অর্থ মূল্যের পরিমাপ হিসেবে তার ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে একটি ভাবগত ক্রিয়া হিসেবে একমাত্র এই কারণে যে সঞ্চলনের ক্ষেত্রে তা ইতিমধ্যেই বাস্তব অর্থ হিসেবে কাজ করছে। একটি পণ্য কেনার জন্য বাস্তব অর্থ থাকা চাই। পণ্য বিনিময় যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন একটি উৎপাদ আরেকটি উৎপাদের বদলে সরাসরি বিনিময় করা হত (দ্রব্য-বিনিময়), যেটা ছিল সরল পণ্য বিনিময় এবং যাকে প্রকাশ করা যায় নিম্নলিখিত সূত্র দিয়ে: প(পণ্য) — প(পণ্য), বা প — প। উন্নত পণ্য উৎপাদনের অধীনে পণ্যটি প্রথমে বিক্রীত হয় অর্থের বিনিময়ে, এবং তারপর পূর্বোক্ত বিক্রেতার দ্বারা সেই অর্থ ব্যবহৃত হয় আরেকটি পণ্য ক্রয়ের জন্য। এখন সূত্রটা হবে অন্য: প(পণ্য) — অ(অর্থ)—প(পণ্য), বা প—অ—প।

যে বিনিময়ে অর্থ হল মধ্যস্থ যোগসূত্র, তাকে বলা হয় পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলন। অর্থ এখানে **সঞ্চলনের মাধ্যমের** ক্রিয়া সম্পন্ন করে। অর্থকে যদি ক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হয়, তা হলে তার একটা নির্দিষ্ট

পরিমাণের যোগান থাকতে হবে। সেই পরিমাণটা মুখ্যত নির্ধারিত হয় সঞ্চলনশীল পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ দিয়ে এবং সেগুলির দামের যোগফল দিয়ে। সেই সঙ্গে, প্রতিটি অর্থমুদ্রাগত একক যেহেতু একাধিক ক্রয় ও বিক্রয়কর্ম করাতে পারে, সেই হেতু অর্থের প্রচলন যত দ্রুত হয় (অর্থাৎ, ক্রেতার হাত থেকে বিক্রেতার হাতে তার গতিটা যত দ্রুত হয়), ততই কম তা দরকার হয়, এবং এর উল্টো। সুতরাং সূত্রটি হল:

পণ্যসামগ্রীর সঞ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ = $\frac{\text{পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ} \times \text{পণ্যসামগ্রীর দাম}}{\text{অর্থের প্রচলনের বেগমাত্রা}}$

অর্থ হল সম্পদের বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত এক মূর্তরূপ, কেননা পুঁজিবাদে তাকে যে কোনো পণ্যতে পরিবর্তিত করা যেতে পারে। একমাত্র যে অর্থকে মজুত করা যায় তা হল যেটা বাস্তবিকই থাকে, অর্থাৎ নগদ মুদ্রা। সে ক্ষেত্রে, একটি পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ (প—অ) ধরে রাখা হয় এবং সঞ্চলন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ভাষান্তরে, তা সঞ্চিত হয় এবং একটি মজুতে রূপান্তরিত হয়।

অর্থ **পরিশোধের উপায়** হিসেবে কাজ করে পণ্যসামগ্রী ক্রেডিটে ক্রয় ও বিক্রয়ের সময়ে, যখন ক্রেতা একটি পণ্য ক্রয় করে কিন্তু দাম পরিশোধ করে পরবর্তী কালে। এইভাবে, পণ্য উৎপাদকদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়: ক্রেতা হয় অধমর্ণ, আর বিক্রেতা হয় উত্তমর্ণ। ঋণ

পরিশোধের যখন সময় হয়, তখন অধমর্ণ-উৎপাদক অবশ্যই তার পণ্য বিক্রয় করবে এবং উত্তমর্ণ-উৎপাদককে পরিশোধ করবে। তার পণ্যটি যদি উশুল করা না যায়, তা হলে অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ উভয়েই কঠিন অবস্থায় এসে পড়ে।

আন্তর্জাতিক বন্দোবস্তগুলিতে, অর্থ কাজ করে **বিশ্বজনীন অর্থ** হিসেবে। ক্রীতব্য সামগ্রীর দাম মেটানো যখন প্রয়োজন হয় তখন ক্রয়ের বিশ্বজনীন উপায় হিসেবে, এবং যখন ঋণ পরিশোধ করা দরকার হয় তখন পরিশোধের বিশ্বজনীন উপায় হিসেবে কাজ করে। বিশ্বজনীন অর্থ সামাজিক সম্পদের এক বিশ্বজনীন মূর্তরূপও বটে, যাকে তার মালিকরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য কারণে এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যেতে পারে। দামের জাতীয় মান হিসেবে অর্থ যে পোশাকটি পরিধান করে, সেই কাজের সময়ে সেই 'স্থানীয় পোশাক খসিয়ে ফেলে', এবং আত্মপ্রকাশ করে বহুমূল্য ধাতুগুলির পিন্ড, বা বাটের আদি রূপে, যেগুলি তাদের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে (মান) ওজন অনুযায়ী গৃহীত হয়।

এমন একটা সময় ছিল যখন অর্থ পাওয়া যেত সোনা ও রুপোর মুদ্রার রূপে। আমাদের কালের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে কাগজী অর্থ পণ্য সঞ্চলনে সোনা ও রুপোকে প্রতিস্থাপিত করেছে। যে কাগজী অর্থ ছাড়া হচ্ছে তার পরিমাণ যখন বিদ্যমান পণ্যসামগ্রীপুঞ্জের সঞ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় সোনার পরিমাণকে ছাপিয়ে যায়, তখন কাগজী অর্থের অবচয় ঘটে। ধরা যাক,

কাগজী ডলারের পরিমাণ সেগুলি যে সোনার প্রয়োজনীয় পরিমাণের প্রতিকল্প হিসেবে কাজ করে, তার চেয়ে বেশি হয়ে গেল। সে ক্ষেত্রে কাগজী অর্থের অর্ধেক পরিমাণ অবচয় ঘটে, এবং দাম বেড়ে যায়। বুর্জোয়া রাষ্ট্র তার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য, সর্বোপরি অস্ত্রবাবদ ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য বিপুল পরিমাণ কাগজী অর্থ ছাড়ে। অত্যধিক কাগজী অর্থ ছাড়ার ফলে অর্থের যে অবচয় ঘটে তাকে বলা হয় **মুদ্রাস্ফীতি**। আমাদের কালে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণ দুরন্ত মুদ্রাস্ফীতির অভিশাপ ভোগ করে, দাম বেড়ে যায় প্রতি বছর ১০, ২০, ৩০ কিংবা এমন কি ১০০ শতাংশেরও বেশি। সেটা বোধগম্য, কেননা শ্রমিক ও কর্মচারীরা তাদের মজুরি ও বেতন পায় অবচয়প্রাপ্ত অর্থে, অথচ জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বেড়ে চলে।

বুর্জোয়া সমাজে, যেখানে সব কিছুই ক্রয়যোগ্য ও বিক্রয়যোগ্য, সেখানে অর্থ একটা বলশালী শক্তি। অর্থ দিয়ে যে কোনো পণ্য ক্রয় করা যায়, যে কোনো খেয়াল মেটানো যায়। সম্মান, ভালোবাসা বা বিবেকের মতো আত্মিক মূল্যগুলিও ক্রয় ও বিক্রয়ের বস্তু। অর্থের লালসা জন্ম দেয় নৈতিক বিচ্যুতির, খুন, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধের। অর্থ যে কোনো অপরাধের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করে। সামরিক-শিল্প সমাহারের প্রতিভূ অস্ত্র প্রস্তুতকারকরা মুনাফার তাড়নায় রক্তক্ষয়ী ও বিধ্বংসী যুদ্ধের বীভৎসতাতেও সংযত হয় না।

বুর্জোয়া সমাজে একজন ব্যক্তির স্থান নির্ভর করে তার সম্পদের উপরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন মার্কিন

ব্যবসায়ী সম্পর্কে বলা হয় যে 'তার দাম এত কোটি ডলার'। অর্থের ক্ষমতা তথাকথিত 'সমান সুযোগ' সংক্রান্ত একটা প্রিয় বুর্জোয়া অতিকথার সঙ্গে সম্পর্কিত; এই অতিকথা অনুযায়ী, যে কোনো উদ্যোগী ব্যক্তিই ইচ্ছা করলে রাশি রাশি অর্থ রোজগার করতে পারে। তাকে শুধু অপেক্ষা করে থাকতে হবে তার সৌভাগ্যের ক্ষণটির জন্য।

বুর্জোয়া সমাজে অর্থের ক্ষমতার কারণ হল এই যে তাকে পুঁজিতে পরিবর্তিত করা যায়, মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ারে, মুনাফা ও সমৃদ্ধির উপায়ে পরিবর্তিত করা যায়।

পুঁজিবাদী শোষণের সারমর্ম

পুঁজিবাদী সমাজে দুটি বিপরীত শ্রেণী আছে: **বুর্জোয়া,** অথবা উৎপাদনের উপায়ের ও সামাজিক সম্পদের যারা মালিক সেই পুঁজিপতিদের একটি শ্রেণী; এবং **প্রলেতারিয়েত,** উৎপাদনের উপায় থেকে যারা বঞ্চিত ও শোষণের বস্তু সেই মজুরি-শ্রমিকদের একটি শ্রেণী।

পুঁজিবাদের আত্মপ্রকাশের পক্ষে অবস্থাগুলি গড়ে উঠেছিল সামন্ততন্ত্রের ভাঙন ও পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের সময়ে। সেগুলি ছিল: ১) সম্পদচ্যুত এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর (প্রলেতারিয়েত) গঠন, যারা ব্যক্তিগতভাবে মুক্ত-স্বাধীন ছিল কিন্তু উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত ছিল, এবং যারা বেঁচে থাকতে

পারত শুধু পুঁজিপতির কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে; ২) কয়েকজন ব্যক্তির হাতে অর্থ ও উৎপাদনের উপায়ের সঞ্চয়ন; ৩) বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজার গঠন।

সরল পণ্য উৎপাদনে, পণ্য মালিক সে নিজে যেসমস্ত পণ্য উৎপন্ন করেছে তা বিক্রয় করে তার প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্য ক্রয় করার জন্য। সরল পণ্য সঞ্চলনের সূত্রটি হল প—অ—প, এবং সেই ধরনের পণ্য বিনিময়ের লক্ষ্য হল পণ্য মালিকের প্রয়োজন মেটানো।

পুঁজিপতি উৎপাদনকর্মে নিযুক্ত হয় মুনাফার জন্য। সে অর্থের একটা অঙ্ক আগাম দেয় আরও বেশি পাওয়ার উদ্দেশ্যে। সুতরাং, পুঁজির সূত্রটি পণ্য সঞ্চলনের সূত্র থেকে আলাদা। তা প্রকাশ করা যায় এই ভাবে: অ—প—অ′ যেখানে অ′=অ+উ। সেই সূত্রটিতে, দুটি চরমপ্রান্তিক উপাদান (অর্থ) একই ধরনের, তাদের মধ্যে কোনো গুণগত প্রভেদ নেই। কিন্তু কিছু প্রভেদ নিশ্চয়ই থাকতে হবে, কেননা তা না হলে বিনিময়টা হবে অর্থহীন। একজন পুঁজিপতি ১০,০০০ ডলার দিয়ে একটি পণ্য উৎপন্ন করছে শুধু সেই ১০,০০০ ডলারে সেটা বিক্রি করার জন্য — এটা কল্পনা করা মুশকিল। বস্তুতপক্ষে, অ আর অ′ এই দুয়ের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে, কিন্তু সেই প্রভেদটা পরিমাণগত। ধরা যাক যে পুঁজিপতি ১০,০০০ ডলার ব্যবহার করল একটি পণ্য (প) ক্রয় করার জন্য এবং তার পর সেটি বিক্রয় করেছিল ১১,০০০ ডলারে, এইভাবে সে তার পুঁজি বাড়াল ১,০০০ ডলার। এই ১,০০০ ডলারকে — আগাম দেওয়া পুঁজির বৃদ্ধিকে —

মার্কস বলেছেন **উদ্বৃত্ত-মূল্য** (উ)। এটাই হল পুঁজির লক্ষ্য, পুঁজির গতির চূড়ান্ত বিন্দু।

এখন প্রশ্ন ওঠে: গোড়ায় আগাম দেওয়া অর্থের অংকটির বৃদ্ধির উৎস কী। আর যাই হোক, পণ্য উৎপাদন ও সঞ্চলনের নিয়ম অনুযায়ী, পুঁজিপতি তো একটি পণ্য ক্রয় করে ও সেটি বিক্রয় করে তার যথামূল্যে, তুল্যমূল্যে, যাতে গোড়ায় আগাম দেওয়া অর্থের অংকটিতে কোনো বৃদ্ধি হতে পারে না, বা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এরূপ এক বৃদ্ধি সত্যিই ঘটে। সেটা না ঘটলে, পুঁজিপতির অবস্থান থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের গোটা প্রক্রিয়াটাই নিতান্ত অর্থহীন হত। তা হলে রহস্যটা কী?

কিছু কিছু বুর্জোয়া গবেষক মনে করেন যে আগাম দেওয়া অর্থের বৃদ্ধিটা আসে বিনিময় থেকে: এই রকম একটা অনুমান করাটা অবশ্য একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে প্রবেশ করা, কেননা পুঁজিপতি একজন বিক্রেতা হিসেবে যেটুকু জেতে, ক্রেতা হিসেবে সেটা হারায়, এবং এর উল্টো।

প্রকৃতপক্ষে, আগাম দেওয়া পুঁজির উৎস নিহিত রয়েছে পুঁজিপতির কেনা পণ্যের (প) বিশেষ গুণের মধ্যে।

পুঁজিপতি তার ব্যবসায় চালু করার সময়ে ঘরবাড়ি তোলে এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায় ক্রয় করে। শ্রমিকদেরও ভাড়া করে সে। শ্রমিকদের ভাড়া করার ক্রিয়াটা হল তাদের একমাত্র সম্বল: তাদের শ্রমশক্তি, তাদের কাজ করার

ক্ষমতা, ক্রয় করার ক্রিয়া। পুঁজিবাদে, শ্রমশক্তি হয়ে ওঠে একটি পণ্য, এবং যে কোনো পণ্যের মতো তার থাকে মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য। **শ্রমশক্তি পণ্যটির মূল্য** নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনে (ও পুনরুৎপাদনে) সামাজিক শ্রম ব্যয়ের দ্বারা। বেঁচে থাকা ও কাজ করার জন্য একজন লোকের খাদ্য, বস্ত্র ও আবাসন দরকার, অর্থাৎ তাকে তার চাহিদা পূরণ করতে হয়। কিন্তু শ্রমিকের দরকারী এই সমস্ত জীবনধারণের উপায়ই হল পণ্যসামগ্রী এবং সেগুলির নিজস্ব একটা মূল্য আছে। সেই জন্যই শ্রমশক্তি পণ্যটির মূল্য শ্রমিকের জীবনধারণের উপায়ের মূল্য দিয়ে নির্ধারিত হয়। পুঁজির একটা নিয়ত শ্রমশক্তি-প্রবাহ প্রয়োজন হয় বলে, শ্রমিকের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায়ের মূল্যও শ্রমশক্তির মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি চালানোর মতো দক্ষ শ্রমিক পুঁজিপতিদের দরকার হয় বলে, শ্রমিকের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বাবদ ব্যয়ও শ্রমশক্তির মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

যে কোনো পণ্যের মতো, শ্রমশক্তিরও ব্যবহার-মূল্য আছে, আর পুঁজিবাদী শোষণের রহস্যটা নিহিত রয়েছে এখানেই। বিষয়টা এই যে শ্রমশক্তির এমন একটা বিশেষ-নির্দিষ্ট ব্যবহার-মূল্য আছে, যা পৃথিবীতে অন্য কোনো পণ্যের নেই। রুটি, পোশাক, পাদুকা, প্রভৃতির মতো যে কোনো পণ্যের ব্যবহার-মূল্য ভোগের প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়ে যায়, অথচ শ্রমশক্তি পণ্যটির ব্যবহার-মূল্য, সেটির ভোগের প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত

হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, বরং নিজের মূল্যের চেয়েও বেশি মূল্য উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি বিবেচনা করা যাক।

ধরে নেওয়া যাক যে একটি সুতিকলের মালিক একজন শ্রমিককে নিয়োগ করল, এবং কর্ম-দিবসের শেষে তাকে ১০ ডলার দিল। শ্রমের প্রতিটি ঘণ্টায় শ্রমিক সৃষ্টি করেছে ২ ডলার দামের মূল্য।

এও ধরে নেওয়া যাক যে ১০ ঘণ্টার এক কর্ম-দিবসে শ্রমিক উৎপন্ন করেছে ১০০ মিটার বস্ত্র, ব্যবহার করেছে ৫০ ডলার দামের সুতো ও অন্যান্য উৎপাদনের উপায়। ১০০ মিটার বস্ত্রের মূল্য কী হবে? প্রথমে, তার অন্তর্ভুক্ত হবে ব্যবহৃত-হয়ে-যাওয়া উৎপাদনের উপায়ের মূল্য: ৫০ ডলার। দ্বিতীয়ত, তার অন্তর্ভুক্ত হবে ১০ ঘণ্টায় শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট মূল্য: ২০ ডলার। ফলে, ১০০ মিটার বস্ত্রের মূল্য হবে মোট ৭০ ডলার।

এই ১০০ মিটার বস্ত্র উৎপন্ন করতে পুঁজিপতির কত খরচ হয়েছিল? সে ৫০ ডলার ব্যয় করেছিল উৎপাদনের উপায় ক্রয় করার জন্য এবং ১০ ডলার ব্যয় করেছিল শ্রমিকের মজুরি দেওয়ার জন্য, যার মোট পরিমাণটা মাত্র ৬০ ডলার। স্পষ্টতই, পুঁজিপতি যদি ১০০ মিটার বস্ত্র যথামূল্যে বিক্রয় করে, তা হলে সে যা বিনিয়োগ করেছিল তার চেয়ে ১০ ডলার বেশি পায়।

এই ১০ ডলারের উৎস কী? উত্তরটা খুবই সরল। বিষয়টা এই যে শ্রমিকের নিজের মজুরি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য লাগে মাত্র ৫ ঘণ্টা, অথচ পুঁজিপতি

তাকে দিয়ে ১০ ঘণ্টার এক কর্ম-দিবসে কাজ করায়। তাই, ১০ ঘণ্টার মধ্যে ৫ ঘণ্টা সে নিজের জন্য কাজ করে তার শ্রমশক্তির মূল্যের এক তুল্যমূল্য সৃষ্টি করে, আর বাকি ৫ ঘণ্টা সে পুঁজিপতির জন্য কাজ করে এমন একটি মূল্য সৃষ্টি করে, যেটিকে পুঁজিপতি কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়ে নিজে উপযোজন করে।

ভাষান্তরে, কর্ম-দিবস দুই অংশে বিভক্ত। কর্ম-দিবসের যে অংশে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্যের একটা তুল্যমূল্য সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় **আবশ্যকীয় শ্রম-সময়**, এবং সেই সময়ে ব্যয়িত শ্রমকে বলা হয় **আবশ্যকীয় শ্রম।** কর্ম-দিবসের অন্য যে অংশে শ্রমিক পুঁজিপতির জন্য মেহনত করে তাকে বলা হয় **উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়।** উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ে শ্রমিক ব্যয় করে **উদ্বৃত্ত-শ্রম** এবং সৃষ্টি করে **উদ্বৃত্ত-মূল্য,** যার সবটাই পুঁজিপতির দ্বারা উপযোজিত হয়। ফলত, **উদ্বৃত্ত-মূল্য** (উ) হল উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ে শ্রমিকের দাম-না-দেওয়া শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য, অথবা আগাম দেওয়া পুঁজির উপরেও অতিরিক্ত মূল্য।

উদ্বৃত্ত-মূল্য নিংড়ে নেওয়াই পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য, চালিকা শক্তি। শ্রম বাজারে, পুঁজিপতি শ্রমশক্তি পণ্যটি ক্রয় করে তার বিশেষ-নির্দিষ্ট ব্যবহার-মূল্য, তার উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে। **উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিয়ম হল পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম, যা পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্য আর তা অর্জনের উপায় উভয়কেই প্রকাশ করে।** তা প্রকাশ করে পুঁজিবাদী সমাজের মূল উৎপাদন-সম্পর্ককে: বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক মজুরি-

শ্রমিকদের শোষণের সম্পর্ককে। দাসপ্রথা ও সামন্ততন্ত্রে. লক্ষ্যটা ছিল দাস-মালিক ও সামন্ত প্রভুদের প্রয়োজন ও খেয়াল মেটানোর জন্য যতখানি প্রয়োজন, মেহনতি জনগণের কাছ থেকে ততখানি উদ্বৃত্ত-শ্রম নিংড়ে আদায় করে নেওয়া। পুঁজিবাদে, শ্রমিকের উদ্বৃত্ত-শ্রমের উৎপাদকে পরিবর্তিত করা হয় অর্থে, যাকে আবার কাজে লাগানো যায় এবং কাজে লাগানো হয় নতুন উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃজক বাড়তি পুঁজি হিসেবে। সেই জন্যই, শোষণের ধূর্ততম রূপগুলি ব্যবহার করে পুঁজিপতিরা উদ্বৃত্ত-মূল্যের জন্য এমন প্রচন্ড লালসা দেখায়।

পুঁজিবাদী শোষণের রহস্যভেদ করার পর, পুঁজির সংজ্ঞানির্ণয় করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ধারণা বহুবিধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডেভিড রিকার্ডো আদিম মানুষের ব্যবহৃত প্রথম পাথর আর লাঠির মধ্যেই পুঁজিকে দেখতে পেয়েছিলেন। আজকের দিনের বুর্জোয়া গবেষকরাও অনুরূপ সব সংজ্ঞার্থ দেন, পুঁজিকে পর্যবসিত করেন একটি জিনিসে, একটি বস্তুতে। পুঁজি সম্বন্ধে এরূপ এক বোধ বুর্জোয়াদের খুবই কাজে লাগে। পুঁজি যদি একটা জিনিস হয়, তা হলে তার মানে এই যে স্মরণাতীত কাল থেকে তার অস্তিত্ব ছিল, কেননা মানুষকে তার ক্রিয়াকলাপের একেবারে প্রথম পদক্ষেপ থেকেই নানান জিনিস নিয়ে কাজ করতে হত।

প্রকৃতপক্ষে, পুঁজি একটা জিনিস নয়, বরং বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে এক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্ক। তদবস্থ জিনিসগুলি — ইমারত, ঘরবাড়ি,

যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল — পুঁজি নয়। হস্তশিল্পী নিজে যে মেশিন-টুলটি চালায় সেটি পুঁজি নয়। কিন্তু সেই মেশিন-টুলটাই পুঁজিতে পরিণত হবে, যদি সেটির মালিক সেটিকে মজুরি-শ্রম শোষণ করার জন্য ব্যবহার করে। তাই, **পুঁজি হল সেই মূল্য যা তার মালিককে উদ্বৃত্ত-মূল্য এনে দেয় মজুরি-শ্রম শোষণের মধ্য দিয়ে।**

উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে পুঁজির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। উদ্যোগপতি তার একটি অংশকে ব্যবহার করে উৎপাদনের উপায় ক্রয় করার জন্য: কারখানার ইমারত ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল, জ্বালানি, প্রভৃতি ক্রয় করার জন্য। একটি পণ্যের উৎপাদনে, উৎপাদনের এই উপায়গুলির মূল্য পুরো-তৈরি উৎপাদটিতে স্থানান্তরিত হয় শ্রমিকের মূর্ত শ্রমের সাহায্যে। পুঁজির এই অংশটির মূল্যের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না বলে, মার্কস একে অভিহিত করেছেন **স্থির পুঁজি** (সপু) বলে।

পুঁজির অপর যে অংশটি শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য খরচ হয়, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তার মূল্যের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণটি দিয়ে তা বাড়ে। মার্কস একে বলেছেন **অস্থির পুঁজি** (অপু)।

তাই, শ্রমিকের মূর্ত শ্রম পণ্যটির ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে এবং ব্যবহৃত-হয়ে-যাওয়া উৎপাদনের উপায় স্থানান্তরিত করে পুরো-তৈরি উৎপাদটিতে। সেই সঙ্গে, তার বিমূর্ত শ্রম সৃষ্টি করে নতুন মূল্য, যার একটি অংশ হল উদ্বৃত্ত-মূল্য। এটাই হল মজুরি-শ্রমিকের শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রের একটি প্রকাশ।

ভাষান্তরে, পুঁজিবাদে উৎপন্ন একটি পণ্যের মূল্য তিনটি অংশে বিভক্ত: পুরনো মূল্য, অথবা নতুন উৎপাদটিতে স্থানান্তরিত উৎপাদনের উপায়ের মূল্য এবং নতুন মূল্য, যা শ্রমশক্তির মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমষ্টি।

ফলত, পুঁজিবাদে উৎপন্ন একটি পণ্যের মূল্য প্রকাশ করা যেতে পারে এই সূত্রে: প=সপু+অপু+উ, এখানে প বোঝাচ্ছে পণ্যের মূল্য (পণ্য-মূল্য), সপু — স্থির পুঁজি, অপু — অস্থির পুঁজি আর উ—উদ্বৃত্ত-মূল্য।

স্থির ও অস্থির পুঁজিতে পুঁজির যে বিভাজন মার্কস প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টিতে পুঁজির অঙ্গীয় অংশগুলির বিভিন্ন ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছিল। মার্কস উদ্বৃত্ত-মূল্যের রহস্য ব্যাখ্যা করেছিলেন, বিজ্ঞানসম্মত এই প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন যে মজুরি-শ্রমিকের উদ্বৃত্ত-শ্রমই হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের একমাত্র উৎস, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎসারিত হয় মজুরি-শ্রম শোষণ থেকে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের পদ্ধতি

যথাসম্ভব বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের উপরে শোষণ চরমতম মাত্রায় নিবিড় করে তুলতে চেষ্টা করে। সেই শোষণের মাত্রা

নির্ধারণ করা যায় কীভাবে? তা নির্ণয় করা যায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার থেকে, অথবা কর্ম-দিবসটি যে অনুপাতে উদ্বৃত্ত ও আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ে বিভক্ত সেই অনুপাত থেকে, কেননা শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত (দাম-না দেওয়া) শ্রম উদ্বৃত্ত-মূল্যে অঙ্গীভূত হয়ে থাকে, আর তাদের আবশ্যকীয় (দাম-দেওয়া) শ্রম অস্থির পুঁজির অনুষঙ্গী হয়। ফলত, **উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার** উ′ নির্ধারিত হয় শতাংশ হিসেবে প্রকাশিত অস্থির পুঁজি অপু-র সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্য উ-এর অনুপাত হিসেবে। সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের সূত্রটি হল:

$$উ' = \frac{উ}{অপু} \times ১০০।$$

এইভাবে, শ্রমশক্তির দৈনিক মূল্য যদি হয় ৪ ডলার, এবং কর্ম-দিবসে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য যদি হয় ৬ ডলার, তা হলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হবে ১৫০ শতাংশ:

$$উ' = ৬/৪ \times ১০০ = ১৫০\%।$$

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার শ্রমশক্তি শোষণের মাত্রা প্রদর্শন করে। কর্ম-দিবসের বিভিন্ন অংশের অনুপাত হিসেবেও তা প্রকাশ করা যায়:

$$উ' = \frac{\text{উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়}}{\text{আবশ্যকীয় শ্রম-সময়}} \times ১০০।$$

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হল একটি আপেক্ষিক রাশি, আর

উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ হল একটি অনাপেক্ষিক রাশি। পুঁজিপতির দ্বারা উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণকে তা প্রকাশ করে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ নির্ভর করে শোষণের হারের উপরে এবং মজুরি-শ্রমিকদের সংখ্যার উপরে। **উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণের (উ) সূত্রটি** হল: উ=উ'× অপু, যেখানে উ' হল উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এবং অপু হল সমস্ত শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের জন্য আগাম দেওয়া অস্থির পুঁজি। স্পষ্টতই, শ্রমশক্তি শোষণের হার বাড়িয়ে এবং মজুরি-শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বাড়ানো যায়।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ও মোট পরিমাণ ধীরনিশ্চিত গতিতে বেড়েই চলেছে। লেনিন হিসাব করেছিলেন যে ১৯০৮ সালে জারতন্ত্রী রাশিয়ায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ছিল ১০২ শতাংশ। আজকের দিনের অর্থনীতিবিদদের হিসাব অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা ১৯৩৯ সালে গিয়ে পৌঁছেছিল ২০০ শতাংশে এবং ১৯৬৭-১৯৭৩ সালে ৩৪৫ শতাংশে। বর্তমানে, অংকটা আরও উঁচু। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদেশী পুঁজির মালিকানাধীন উদ্যোগগুলিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বিশেষভাবেই উঁচু। সেখানে শ্রমিকদের মজুরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে মজুরির চেয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, এমন কি এক-চতুর্থাংশ কম অথচ শ্রম উৎপাদনশীলতা কম নয়। তাই শ্রমিকরা দিনের আরও বৃহত্তর অংশ ব্যয় করে পুঁজিপতিদের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করার কাজে।

উদ্বৃত্ত-শ্রমের ভাগটা বাড়ানোর জন্য পংজিপতিরা দুটি প্রধান পদ্ধতি ব্যবহার করে। প্রথমটি হল কর্ম-দিবস দীর্ঘ করা। আবশ্যকীয় শ্রম-সময় যতক্ষণ পর্যন্ত একই থাকে, ততক্ষণ উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বাড়ানো এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ও মোট পরিমাণ বাড়ানোও সম্ভব হয়।

কর্ম-দিবস প্রসারিত করে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্ট হয়, তাকে বলা হয় **অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য।**

কিন্তু কর্ম-দিবসের প্রসারণের শারীরিক, সামাজিক ও অন্যান্য সীমা আছে। সেই জন্যই, উদ্বৃত্ত-মূল্যের আরও বেশি মোট পরিমাণ উপযোজন করার আকাঙ্ক্ষায় পংজিপতি শোষণের হার বাড়ানোর নতুন নতুন ও আরও কার্যকর উপায়ের সন্ধান করে।

শ্রমশক্তি শোষণের মাত্রা বাড়ানোর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল কর্ম-দিবসের স্থায়িত্বকাল একই থাকা অবস্থায় আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস করা।

কর্ম-দিবসে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস করার সাহায্যে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যকে বলা হয় **আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য।**

আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কীভাবে কমানো সম্ভব? মুখ্যত, শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণের উপায় উৎপাদনকারী শাখাগুলিতে ও সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে সামাজিক শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে। সেটা শ্রমিকের জীবনধারণের উপায়ের মূল্য হ্রাস করতে এবং ফলত, শ্রমশক্তির মূল্য হ্রাস করতে সাহায্য করে। তার সঙ্গে জড়িত থাকে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস, যে সময়ে শ্রমিক এমন

একটি মূল্য উৎপন্ন করে যা তার শ্রমশক্তির মূল্যের তুল্যমূল্য।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের অন্যতম প্রকারভেদ হল **অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য**। এর ফলেও শ্রমিকের জীবনধারণের উপায়ের মূল্যে হ্রাস ঘটে এবং আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমে যায়। মুনাফালাভের তাড়নায় প্রত্যেক পুঁজিপতিই নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। কেন? ব্যাপারটা এই যে পুঁজিপতির দ্বারা প্রবর্তিত কৃৎকৌশলগত নবোদ্ভাবনাগুলি একই শিল্পের অন্য উদ্যোগপতিদের দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পুঁজিপতির পণ্যটি উৎপাদন করতে কম খরচ পড়বে, এবং তার পণ্যগুলির একক মূল্য কম থাকবে। কিন্তু এই সমস্ত পণ্যসামগ্রী বাজার-দরে বিক্রি হবে বলে — যে-বাজার-দর নির্ধারিত হয় শিল্পে উৎপাদগুলির বৃহদংশ উৎপন্নকারী উদ্যোগগুলিতে উৎপাদনের গড়পড়তা সামাজিক অবস্থা দিয়ে — সেই পুঁজিপতি একটা অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য পাবে।

কিন্তু একজন একক পুঁজিপতি অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য পেতে পারে শুধু কিছুকালের জন্য, কারণ শিল্পে অন্য পুঁজিপতিরা তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং তাদের নিজের উদ্যোগগুলিতে নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন করতে শুরু করে, সেটা পণ্য উৎপাদনের জন্য সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় হ্রাস করতে, অর্থাৎ একটি পণ্য-এককের মূল্য হ্রাস করতে সাহায্য করে। পণ্যটির সামাজিক মূল্য কমে যায় বলে, সেটির এবং

পৃথক উদ্যোগগুলিতে যেমন উৎপন্ন হয় সেই পণ্যটির একক মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু কোনো কোনো উদ্যোগে তা যেমন অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমনি অন্যান্য উদ্যোগে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য দেখা দেয়, পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বতঃস্ফূর্ত কৃৎকৌশলগত প্রগতিকে উদ্দীপিত করে।

মুনাফালাভের তাড়নায় পুঁজিবাদ শিল্প বিকাশের তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছে: ১) সরল সহযোগিতা, ২) ম্যানুফ্যাকচারি ও ৩) যন্ত্রপ্রধান উৎপাদন।

সরল সহযোগিতা পুঁজিবাদের সৃষ্টি নয়, বরং আগেই আমরা দেখেছি, প্রাক-পুঁজিবাদী গঠনরূপগুলিতেও তা ছিল। পুঁজিবাদ সহযোগিতায় অন্তর্নিহিত শ্রম উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগের বিকাশ ঘটিয়েছিল মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। সরল সহযোগিতায়, একটি কর্মশালায় কর্মরত শ্রমিকরা একই ধরনের কাজ করত। কর্মশালার ভিতরে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রম বিভাজনের প্রবর্তন **ম্যানুফ্যাকচারি প্রথায়** উত্তরণ সূচিত করেছিল। প্রথম ম্যানুফ্যাকচারিগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৬শ শতাব্দীতে এবং সেগুলির ভিত্তি ছিল কায়িক কারিগরি যন্ত্র। কিন্তু শ্রমের বিশেষীকরণ সাধিত্রগুলির উৎকর্ষসাধনে সাহায্য করেছিল এবং তার ফলে শ্রম উৎপাদনশীলতায় যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছিল। এইভাবে, পিন উৎপন্নকারী ম্যানুফ্যাকচারিগুলিতে বিশেষীকরণ ও শ্রম বিভাজন শ্রম উৎপাদনশীলতা ২৪০ গুণ বাড়ানো সম্ভব করে তুলেছিল। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ১৯শ

শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ম্যানুফ্যাকটরিগুলির বিকাশের ফলে উত্তরণ ঘটেছিল **যন্ত্রপ্রধান উৎপাদনে।** যন্ত্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল ও বিস্তৃত হতে শুরু করেছিল ব্রিটেনে, এবং পরে বৃহৎ যন্ত্রপ্রধান উৎপাদন অন্যান্য দেশেও চালু হয়।

প্রথম যন্ত্রগুলি হাতে তৈরি করা হয়েছিল ম্যানুফ্যাকটরিগুলিতে। পরে, যন্ত্র-নির্মাণ যন্ত্রের বিকাশ ঘটায়, যন্ত্রপ্রধান উৎপাদন পুঁজিবাদের সঙ্গে মানানসই এক দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয়েছিল এবং প্রাধান্যশালী হয়ে উঠেছিল।

ম্যানুফ্যাকটরি থেকে যন্ত্রপ্রধান উৎপাদনে উত্তরণ এক বুনিয়াদি কৃৎকৌশলগত বিপ্লব সূচিত করেছিল, কারুশিল্পীর সুপ্রাচীন কলাকে তা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। শহরে ও গ্রামে পুরনো সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে পড়ছিল, এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন হস্তশিল্প উৎপাদকদের উৎখাত ও সর্বনাশ করে একটির পর একটি শাখাকে দখল করে চলছিল। বৃহৎ যন্ত্রপ্রধান উৎপাদনের মধ্যে পুঁজিবাদ খুঁজে পেয়েছিল তার শোষণমূলক চরিত্রের সঙ্গে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের জন্য তার তৃপ্তিহীন লালসার সঙ্গে সবচেয়ে মানানসই উৎপাদনের রূপকে।

পুঁজিবাদে যন্ত্রপাতির ব্যবহার গভীরভাবে পরস্পরবিরোধী। যন্ত্র এমনিতে মানবশ্রম সাশ্রয় ও লাঘব করে এবং তার অন্তর্বস্তুকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু পুঁজিবাদে যন্ত্র শ্রম নিবিড় করার ও বেকারি বাড়ানোর

কাজে লাগে। যন্ত্র শ্রমের নিবিড়তা বাড়ায় এবং মানব দেহযন্ত্রকে দ্রুততর গতিতে ক্ষইয়ে ফেলে।

একটি যন্ত্র চালানোর জন্য প্রায়শই কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণ বা বিপুল কায়িক শক্তি দরকার হয় না বলে, শ্রমিকদের স্ত্রী-সন্তানরাও আরও ব্যাপকতর পরিসরে পুঁজিবাদী উৎপাদনের মধ্যে আকৃষ্ট হয়। শ্রমশক্তির মূল্যকে তা হ্রাস করে, কেননা শ্রমিকের পরিবারের ভরণপোষণের মূল্যটা অন্তর্ভুক্ত করার আর প্রয়োজন থাকে না। একটি পৃথক, আংশিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে শ্রমিক যন্ত্রটির উপাঙ্গে পরিণত হয় এবং মানসিক ও কায়িক কাজের মধ্যেকার ব্যবধানটা বেড়ে চলে। বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতি যখন শ্রম প্রক্রিয়ায় মানসিক শ্রমের ভাগটাকে বাড়ায়, তখন শ্রমজীবী জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিগত সামর্থ্যও হয়ে ওঠে শোষণের বস্তু ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস।

যন্ত্রের পুঁজিবাদী ব্যবহারের সীমাগুলি কী? পুঁজিপতিদের যন্ত্র দরকার শ্রমিকদের শ্রম লাঘব করার জন্য নয়, বরং মুনাফা বাড়ানোর জন্য। সুতরাং, পুঁজিপতি একটি যন্ত্র প্রবর্তন করে একমাত্র তখনই যখন তা যে শ্রমিকদের প্রতিস্থাপিত করছে সেই শ্রমিকদের শ্রমের চেয়ে সস্তা। ফলত, মজুরি যত কম হয়, যন্ত্র প্রবর্তন করার জন্য পুঁজিপতিদের প্রণোদনাও তত কম হয়। পুঁজিবাদে কোনো কোনো শিল্পে উচ্চ কৃৎকৌশলগত স্তর যে অন্যান্য শাখায় পশ্চাৎপদ ধরাবাঁধা কাজের যন্ত্রপাতির সঙ্গে সহাবস্থান করে, এটা হল তার অন্যতম কারণ। শিল্পগতভাবে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত

দেশগুলিতে কৃৎকৌশলগত প্রগতির পথে একটা বড় প্রতিবন্ধক হল সস্তা শ্রমশক্তির লভ্যতা। যন্ত্র প্রবর্তন করার পরিবর্তে, পুঁজিপতিরা বাগিচাগুলিতে, নির্মাণ ও অন্যান্য শিল্পে বিপুল পরিমাণ সস্তা শ্রম ব্যবহার করাই উপযুক্ত মনে করে।

তাই, পুঁজিবাদে যন্ত্র হল শ্রমিকদের উপরে আরও বেশি নিবিড় শোষণের হাতিয়ার। যন্ত্রগুলি তাদের সম্মুখীন হয় পুঁজি হিসেবে, এক বৈরি শক্তি হিসেবে। ইংলন্ডে যখন যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল তখন যে শ্রমিকরা আর হস্তশিল্পীরা নানানভাবে সেগুলি চূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, সেটা কোনো আপতিক ঘটনা ছিল না। ১৮শ শতাব্দীর শেষে ও ১৯শ শতাব্দীর গোড়ায়, 'যন্ত্র ধ্বংস' করার এক আন্দোলন সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিহাসে তা তাঁতী নেড লুডের নামানুসারে লুডাইট আন্দোলন নামে পরিচিত।

শ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছিল যে তাদের শত্রু যন্ত্র নয় বরং সেগুলির যারা মালিক সেই পুঁজিপতিরা, এবং যন্ত্রগুলিকে আক্রমণ করে অথবা কায়িক শ্রমে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে কোনো লাভ নেই। এরূপ এক সংগ্রাম অর্থহীন, এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা ইতিহাসকে বিপরীতগামী করা যায় না। লড়াই করতে হবে সমাজব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, যে সমাজব্যবস্থা কৃৎকৌশলগত প্রগতির সমস্ত কৃতিত্বকে নিয়োজিত করে কাজ না করা,

পরগাছা শ্রেণীগুলির সেবায় এবং শ্রমিক শ্রেণীকে নিক্ষেপ করে দারিদ্র্য ও অধিকারহীনতার পঙ্কে।

পুঁজিবাদী সমাজের দুই মেরুপ্রান্ত

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা বলে থাকেন যে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায় শ্রমজীবী জনগণের অবস্থা উন্নত হয়। তাঁরা বলেন, আগেকার প্রজন্মগুলির জানা ছিল না কোনো রেলপথ, সমুদ্রগামী জাহাজ, বিশাল বিশাল শহর অথবা উচ্চ প্রযুক্তিবিশিষ্ট ও হাজার হাজার মানুষ নিযুক্ত বিশাল বিশাল কল-কারখানা। কিন্তু প্রকৃতির উপরে মানুষের ক্ষমতার এই বিস্তার অর্জিত হয়েছে বহু প্রজন্মের শ্রমজীবী জনগণের উপরে নিপীড়ন ও নির্মম শোষণের বিনিময়ে, তাদের অবস্থার অবনতির বিনিময়ে।

পুঁজিপতিদের প্রধান ভাবনা হল নিজেদের মুনাফা বাড়ানো। মুনাফালাভের তাড়নায় তারা নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। মুনাফার লালসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুঁজিপতিদের প্ররোচিত করে উৎপাদনের পরিসর বাড়াতে, কেননা ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির তুলনায় বড় উদ্যোগগুলির অনেক বেশি সুবিধা থাকে: যন্ত্রপাতি দিয়ে সেগুলি আরও ভালোভাবে সজ্জিত, তারা সহজতর শর্তে ক্রেডিট পেতে পারে এবং তাদের সামগ্রী আরও সুবিধাজনক দামে বড় বড় প্রস্থে বিক্রীত হতে পারে।

প্রাক-পুঁজিবাদী গঠনরূপগুলির তুলনায়, পুঁজিবাদের

বৈশিষ্ট্য হল সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন, অর্থাৎ, উৎপাদনের পুনরাবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণের সম্প্রসারণ। উৎপাদন সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে, পুঁজিপতিরা সঞ্চয়নের জন্য, তাদের স্থির ও অস্থির পুঁজি বাড়ানোর জন্য যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে, তার একটা অংশকে ব্যবহার করে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশের বার্ষিক সঞ্চয়নের মধ্য দিয়ে, পুঁজিপতি তার পুঁজি বাড়িয়ে চলে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশের সঞ্চয়নের মধ্য দিয়ে পুঁজির আয়তনে একটা বৃদ্ধিকে (উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পুঁজিতে পরিণত করা) বলা হয় **পুঁজির ঘনীভবন।**

কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পুঁজিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে পুঁজির আয়তন বাড়াতে বেশ দীর্ঘ সময় লেগে যায়। যেমন, প্রারম্ভিকভাবে একটি উদ্যোগে আনুমানিক মূল্য যদি হয় ২০ লক্ষ ডলার, তা হলে বছরে ১,০০,০০০ — ২,০০,০০০ ডলার সঞ্চয়ন করে পুঁজিপতি মোট অঙ্কটাকে বাড়িয়ে ৩০-৪০ লক্ষ ডলার করবে এক দশকের মধ্যে। তাই, পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজি বাড়ানোর আরও বেশি দ্রুত এক পদ্ধতিও ব্যবহার করে: অনেকগুলি পুঁজিকে মিলিয়ে (জবরদস্তি অথবা ঐচ্ছিক) একটিমাত্র পুঁজিতে পরিণত করা। এটা **পুঁজির কেন্দ্রীভবন** বলে পরিচিত।

একটি উদ্যোগ যত বড় হয়, তার মালিকদের উপযোজিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ তত বেশি হয় এবং পুঁজির সঞ্চয়ন তত বেশি দ্রুত হয়। একজন পুঁজিপতি যদি উদ্বৃত্ত-মূল্য (শ্রমিকদের দাম-না-দেওয়া

শ্রম) উপযোজন করে না থাকে, তা হলে সে তার সমস্ত পুঁজিই ব্যবহার করে ফেলত এবং চরম দুর্দশায় এসে পড়ত। কিন্তু তা ঘটে না, এবং পুঁজিগুলি সংকুচিত হওয়ার পরিবর্তে বেড়েই চলে। তার কারণ, পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের দাম-না-দেওয়া শ্রম উপযোজন করে। একটি পুঁজির প্রারম্ভিক উৎস যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, কয়েক বছরের মধ্যেই তা অন্য লোকেদের সঞ্চিত দাম-না-দেওয়া শ্রমে পরিণত হয়। ফলত, প্রলেতারিয়েত যখন বুর্জোয়া শ্রেণীকে তার ধনসম্পদ থেকে দখলচ্যুত করে তখন সে যাথার্থ্য ন্যায়বিচার ছাড়া আর কিছু করে না, অধিকারবলে সে যার অধিকারী সেটাকেই নিজের হাতে নিয়ে নেয়।

পুঁজি সঞ্চয়ন বলতে মুখ্যত বোঝায় পুঁজিপতির সম্পদ বৃদ্ধি। সেই সঙ্গে, পুঁজিবাদের বিকাশ প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাকে স্ফীত করে। শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থানের উপরে পুঁজি সঞ্চয়নের একটা পরস্পরবিরোধী ফল-প্রভাব হয়। উৎপাদনের বৃদ্ধি শুধু যে শ্রমশক্তির চাহিদা বাড়ায় তাই নয়, এমন অবস্থাও সৃষ্টি করে যেখানে কিছু শ্রমজীবী মানুষ উৎপাদন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়, পুঁজির প্রয়োজনের তুলনায় এক আপেক্ষিক 'উদ্বৃত্ত' গঠিত হয়। একেই বলা হয় **বেকারি**। সেই ব্যাপারটার কারণগুলি কী?

আমরা জানি, পুঁজি স্থির (সপু) ও অস্থির (অপু) পুঁজিতে বিভক্ত। সপু আর অপু-র মধ্যেকার অনুপাত নির্ধারিত হয় শ্রমের কাছে লভ্য বন্দোবস্তগুলির কৃৎকৌশলগত স্তর দিয়ে। মার্কস **পুঁজির অঙ্গীয়**

গঠনবিন্যাসের ধারণাটা প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে সপু-র মূল্য ও অপু-র মূল্যের মধ্যে পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত হয়, কেননা কৃৎকৌশলগত স্তরে পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সেগুলি সম্পর্কিত।

এটাকে প্রকাশ করা যায় এইভাবে অ=সপু/অপু, এখানে তা বোঝাচ্ছে পুঁজির অঙ্গীয় গঠনবিন্যাসকে। এইভাবে, কায়িক সাধিত্রগুলি থেকে যন্ত্রে উত্তরণের অর্থ হল শ্রমের কাছে লভ্য বন্দোবস্তগুলির কৃৎকৌশলগত স্তরের বৃদ্ধি, এবং মূল্যের হিসাবে অস্থির পুঁজির সঙ্গে স্থির পুঁজির অনুপাতেও একটা বৃদ্ধি, অর্থাৎ পুঁজির এক উচ্চতর অঙ্গীয় গঠনবিন্যাস।

উৎপাদন সম্প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতিরা নতুন নতুন শ্রম-সাশ্রয়মূলক যন্ত্রও প্রবর্তন করে। ফলে, স্থির পুঁজি সপু আর অস্থির পুঁজি অপু-র মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্ক পরিবর্তিত হয় প্রথমোক্তটির অনুকূলে, অর্থাৎ, পুঁজির অঙ্গীয় গঠনবিন্যাস বাড়ে। এর ফলে শ্রমশক্তির চাহিদায় আপেক্ষিক হ্রাস ঘটে।

ধরে নেওয়া যাক যে পুঁজির অঙ্গীয় গঠনবিন্যাস অ=১/১, অর্থাৎ, পুঁজির প্রতিটি ১০০ এককে আছে ৫০ সপু ও ৫০ অপু। কৃৎকৌশলগত পুনঃসজ্জার ফলে, পুঁজির অঙ্গীয় গঠনবিন্যাস বেড়ে হবে, ধরুন, ৩/১, অর্থাৎ, পুঁজির প্রতিটি ১০০ এককে থাকবে ৭৫ সপু ও ২৫ অপু। ফলত, অস্থির পুঁজি হ্রাস পাবে ৫০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে, অথবা অর্ধেক। তার মানে এই যে সেই বিশেষ উদ্যোগটিতে শ্রমশক্তির চাহিদাও অর্ধেক হ্রাস পাবে। পুঁজিবাদে নতুন যন্ত্রপাতির

ব্যবহার শ্রমিকদের একটা অংশকে উৎপাদন থেকে বহিষ্কৃত করে এবং ব্যাপক বেকারি ঘটায়।

বেকারদের বাহিনী স্ফীত হয় শুধু এই প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিকদের দিয়েই নয়, সর্বস্বান্ত কৃষক, হস্তশিল্পী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র উৎপাদকদের দিয়েও। প্রলেতারীয়তে পরিণত দখলচ্যুত লক্ষ-লক্ষ কৃষক তাদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করে কাজের সন্ধানে শহরে যেতে বাধ্য হয়, বেকারদের পংক্তিতে যোগ দেয়। আমাদের কালে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেকারি অতিব্যাপক ও দুরারোগ্য হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সংকটের কালপর্বগুলিতে তা সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আগে যেমন হত তেমন আরোগ্য ও পুনরুজ্জীবনের কালপর্বগুলিতে তা আর মিটে যায় না।

বেকারদের বাহিনী শ্রম বাজারের উপরে চাপ সৃষ্টি করে এবং কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে দেয় তাদের শ্রমশক্তির মূল্যের নিচে। পুঁজিপতিরা বেকারিকে ব্যবহার করে শ্রম নিবিড় করার জন্য, শ্রমজীবী জনগণের জীবনমান নামিয়ে আনার জন্য এবং নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য। পুঁজিপতিদের ব্যাপক বেকারি দরকার হয় যাতে তারা অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কালপর্বগুলিতে তাদের উদ্যোগগুলিতে সস্তা শ্রমশক্তির যোগান দিতে পারে। শ্রমের এক বিরাট সংরক্ষিত বাহিনী, বেকারদের এক বাহিনী সব সময়েই পুঁজিপতিদের হাতে থাকে। বেকারি শ্রমজীবী জনগণের উপরে চাপিয়ে দেয় বিরাট দুঃখদুর্দশা, তা হল পুঁজিবাদী উৎপাদনের এক অবশ্যম্ভাবী কুফল।

পুঁজিবাদে পুঁজি ও সামাজিক সম্পদের সঞ্চয়ন যত বেশি, বেকার ও দারিদ্র্যগ্রস্ত মানুষের সংখ্যাও তত বেশি। সমাজের এক মেরুপ্রান্তে পুঁজির সঞ্চয়ন, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিলাসব্যসন, অমিতব্যয়িতা ও অলসতা, সমাজের আরেক মেরুপ্রান্তে সমাজের সমগ্র সম্পদের উৎপাদক প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অবনতি ও জীবনমানের নিম্নগামিতাকে বোঝায়। এই হল মার্কসের আবিষ্কৃত **পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের** অনাপেক্ষিক **সাধারণ নিয়মের** সারমর্ম। সেই নিয়মটি **পুঁজিবাদে প্রলেতারিয়েতের অবস্থার আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক অবনতির অবশ্যম্ভাবিতা প্রদর্শন করে।**

আজকের দিনের পুঁজিবাদে, প্রলেতারিয়েতের অবস্থার আপেক্ষিক অবনতি মুখ্যত প্রকাশ পায় জাতীয় আয়ে মজুরির ক্রমসংকোচমান অংশে, অর্থাৎ, এক বছরে সমাজে নতুন সৃষ্ট মূল্যে এবং মোট জাতীয় উৎপাদেও। গত কয়েক দশক ধরে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তথাকথিত এক 'আয় বিপ্লব' সংঘটিত হচ্ছে বলে যে বুর্জোয়া অতিকথাটি চালু হয়েছে, তাতে সত্য কিছু নেই। মূল অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি, মজুরি-'সংস্তম্ভনের' কর্মনীতি, সামাজিক কর্মসূচিগুলিকে প্রচন্ডভাবে কেটে কমানো, একচেটিয়া কর কমানোর সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের উপরে ক্রমবর্ধমান করের বোঝা, প্রভৃতির মতো বিষয়গুলি পুঁজিপতির মুনাফার তুলনায় শ্রমিকদের আয় কমানোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় আয়কে একচেটিয়া সংস্থাগুলির অনুকূলে

পুনর্বণ্টন করে বুর্জোয়া রাষ্ট্র শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে বিশাল সামরিক ব্যয় মেটায়।

প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অনাপেক্ষিক অবনতি প্রকাশ পায় নিম্নতর জীবনমানের মধ্যে। শ্রমিক শ্রেণীর জীবনমান সম্পর্কে বিচার করতে হলে পুরো এক প্রস্ত সূচককে হিসাবে ধরতে হবে, তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে অর্থ মজুরির আয়তন ও ভোগ্য সামগ্রীর দামের আয়তন, কর্মনিযুক্তি ও বেকারির মাত্রা, শ্রমের নিবিড়তা ও স্থায়িত্বকাল, করের হার এবং আবাসন, সাংস্কৃতিক, প্রাত্যহিক ও অন্যান্য অবস্থা।

পুঁজিবাদের বিকাশ ও ক্রমবর্ধমান পুঁজি সঞ্চয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা খারাপের দিকেই গেছে, এমন কি কিছু কিছু সূচক যদি উন্নত হয়ে থাকে, তা হলেও। যেমন, শ্রমিকদের অধ্যবসায়পূর্ণ সংগ্রামের ফলে নামিক মজুরির কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু শ্রমের নিবিড়করণ, ক্রমবর্ধমান বেকারি, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধিকতর অনিশ্চয়তা, এবং উচ্চতর কর ও দামের দরুন সেই বৃদ্ধি নাকচ হয়ে যায়। শোষক শ্রেণীগুলির অনুকূলে জাতীয় আয় পুনর্বণ্টনে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ারগুলির অন্যতম হল মুদ্রাস্ফীতি।

অর্থনৈতিক সংকটের বছরগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার অবনতি ঘটে বিশেষভাবে। পুনরুজ্জীবনগুলির সময়ে মজুরিতে কিছুটা বৃদ্ধি হতে পারে এবং বেকারি কিছুটা কমতে পারে। কিন্তু পুনরুজ্জীবনগুলির পরেই অবশ্যম্ভাবীরূপে আসে সংকট, যার উল্টো ফল ফলে এবং শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার অবনতি ঘটে।

প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অবনতি বিভিন্ন দেশে, এমন কি একই দেশের বিভিন্ন শিল্প শাখায় ও অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হয়। কোনো কোনো দেশে, প্রলেতারিয়েত তার অবস্থা উন্নত করতে সমর্থ হয়, আবার অন্যত্র দারিদ্র্য ও অনাহার থাকে আরও প্রকটরূপে। প্রলেতারিয়েতের অবস্থার আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক অবনতি একটা নিয়ম-শাসিত ব্যাপার। যে অনুন্নত দেশগুলিতে কোটি কোটি মানুষ বিদেশী একচেটিয়া সংস্থা আর জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে শোষিত, শুধু সেই দেশগুলিতেই যে তা প্রকাশ পায় তাই নয়, সবচেয়ে ধনী পুঁজিবাদী দেশ – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তা প্রকাশ পায়। সে দেশে কোটি কোটি লোক বাস করে সরকারি 'দারিদ্র্য-রেখার' নিচে। তাদের অনেকেই 'অ-শ্বেতাঙ্গ': কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্পানিক ও অন্যান্য।

পুঁজিবাদী বাস্তবতার কঠোর তথ্য ও ঘটনায় বুর্জোয়া গবেষকরা প্রলেতারিয়েতের অবস্থার আপেক্ষিক অবনতিটা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু কোনোরূপ অনাপেক্ষিক অবনতির কথা তাঁরা একগুঁয়ের মতো অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, আজকের দিনের শ্রমিকরা এমন সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে যা তারা আগে কখনও করে নি। তাদের কি কখনও এমন সব মোটর গাড়ি, টিভি সেট, রেফ্রিজারেটর, কাপড়-কাচা কল ও অন্যান্য স্থায়ী ভোগ্যপণ্য ছিল? সামাজিক বীমার ক্ষেত্রটি কি প্রসারিত হয় নি, বেকারি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা কি বাড়ে নি, ইত্যাদি?

দৃঢ়পণ শ্রেণী সংগ্রামের ফলে উন্নত পুঁজিবাদী

দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী বস্তুতই তার বৈষয়িক মান কিছুটা উন্নত করতে সমর্থ হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণীকে বাধ্য করেছে তার মুনাফার একটা অংশ ছেড়ে দিতে এবং সামাজিক বিধানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু রেয়াত দিতে। কিন্তু তাতে জনসাধারণের অধিকতর শোষণ ও সামাজিক দারিদ্র্যের ঘটনাটা নাকচ হয়ে যায় না, কেননা বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লবে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ এবং সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে শুধু যে নতুন নতুন বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদার জন্ম দেয় তাই নয়, তাদের চাহিদাকে স্বাভাবিক পরিমাণে মেটানোও তাদের পক্ষে আরও দুষ্কর করে তোলে। শ্রমজীবী জনগণের দ্রুত-বর্ধমান বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদার চেয়ে তাদের বৈষয়িক মানের আরও বেশি পিছিয়ে পড়াটা প্রলেতারিয়েতের অবস্থার এক অনাপেক্ষিক অবনতিই প্রদর্শন করে। যেমন, এমন কি মার্কিন প্রেসিডেন্টের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদত্ত সরকারি তথ্যাদি অনুযায়ী, গত দশকে উৎপাদনে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছিল ১৫ শতাংশ, এবং সেই কালপর্বে বেকারি ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৮-১০ শতাংশ।

এ সবই শুধু যে যন্ত্র-শ্রমিকদের অবস্থার অবনতি ঘটায় তাই নয় অ-যন্ত্র শ্রমিক-কর্মচারীদেরও অবস্থার অবনতি ঘটায় এরা শোষিত হয় নতুন নতুন ও আরও পরিশীলিত উপায়ে। ক্ষুদ্র উৎপাদকরাও, বিশেষত সংকটের কালপর্বগুলিতে, দারিদ্র্যগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হয়। যেমন, ১৯৩৫ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে খামারগুলির সংখ্যা ৬৮,১৪,০০০ থেকে কমে হয়েছিল ২৮,১৯,০০০। তাই, পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে, বিশেষত তার সর্বোচ্চ, একচেটিয়া পর্যায়ে বিকাশের ফলে জনসমষ্টির এক সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রলেতারিয়েতে পরিণতি ঘটে এবং মার্কসের আবিষ্কৃত পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করে।

পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের ঐতিহাসিক প্রবণতার উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে মার্কস দেখিয়েছিলেন যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন ও উপযোজনের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের উৎপাদিকা শক্তিগুলির অগ্রগতির ফলে উৎপাদনের এক বিশাল সামাজিকীকরণ ঘটে এবং তা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গত পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদের মূল দ্বন্দ্ব — উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর উপযোজনের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী রূপের মধ্যে দ্বন্দ্ব — গভীর হয়। উৎপাদিকা শক্তিসমূহ এবং সেগুলির বিকাশকে যা শৃঙ্খলিত করে সেই পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে অমীমাংসেয় বিরোধ মীমাংসিত হওয়ার দাবি জানায়। তা মীমাংসা করা যায়, কিন্তু একমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ককে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে, যে-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের অবাধ সুযোগ করে দেয়। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বিষয়গত পূর্বশর্তগুলিই যথেষ্ট নয়, কারণ সেকেলে শাসক শ্রেণীগুলি কখনোই নিজে থেকে ঐতিহাসিক

দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হবে না। সেই জন্য, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য আরেকটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল প্রলেতারিয়েত-কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং পুঁজিবাদী সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর।

মার্কস লিখেছেন: 'উৎপাদনের উপায়ের কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সামাজিকীকরণ অবশেষে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছয়, যেখানে সেগুলি তাদের পুঁজিবাদী বহিরাবরণের সঙ্গে বেমানান হয়ে পড়ে। এইভাবে বহিরাবরণটি বিদীর্ণ হয়ে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার মৃত্যু-ঘণ্টা বেজে ওঠে। দখলকারীরা দখলচ্যুত হয়।'*

মার্কসের প্রতিভাদীপ্ত বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বাণীকে ইতিহাস সপ্রমাণ করেছে। অক্টোবর ১৯১৭-তে পৃথিবী পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার মৃত্যু-ঘণ্টা শুনতে পেয়েছিল রাশিয়ায়, সমাজতন্ত্র নির্মাণকারী প্রথমতম দেশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানার মৃত্যু-ঘণ্টা ধ্বনিত হয়েছে ইউরোপ, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশে।

শোষকদের আয়

মজুরি-শ্রমিকদের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য হল বুর্জোয়া সমাজে সকল শোষকের অনর্জিত আয়ের

* Karl Marx, *Capital,* Vol. I, p. 715.

উৎস। তা বণ্টিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, শিল্প ও বাণিজ্যিক পুঁজিপতি, ব্যাংকার ও ভূস্বামীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতায়। পুঁজিপতিদের প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই তার ভাগের উদ্বৃত্ত-মূল্যটা পায় এক বিশেষ রূপে: শিল্প পুঁজিপতিরা পায় **শিল্প মুনাফার** রূপে, বণিকরা পায় **বাণিজ্যিক (বণিকের) মুনাফা** রূপে, ঋণদাতা পুঁজিপতিরা (ব্যাংকাররা) পায় **সুদের** রূপে। ভূস্বামীরা তাদের ভাগটা পায় **জমির খাজনার** রূপে।

শ্রমিকদের শ্রমে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য মুখ্যত উপযোজিত হয় শিল্প পুঁজিপতিদের দ্বারা, বাণিজ্যিক ও ঋণদাতা পুঁজিপতিরা তাদের কাছ থেকে নিজ নিজ ভাগ পায় প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থের রূপে উৎপন্ন হয় না, মজুরি-শ্রমিকের শ্রমের দ্বারা তা অঙ্গীভূত হয়ে থাকে একটি পণ্যের মধ্যে। উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অর্থে (ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং, ফ্রাংক, প্রভৃতিতে) পরিবর্তিত করার জন্য পুঁজিপতিকে তার পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করতে হয়।

ধরে নেওয়া যাক যে একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগ জুতো উৎপাদন করে, যার মূল্যের পরিচায়ক হল এই সূত্রটি: প=২০ সপু+২০ অপু+১০ উ=৫০। কিন্তু পুঁজিপতি যেহেতু তার শ্রমের (সরল পণ্য উৎপাদক যেমন করে থাকে) পরিবর্তে তার পুঁজিকে উৎপাদনে বিনিয়োগ করেছে, সেই হেতু **পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যয়,** বা একটি পণ্যের ব্যয়-দাম (পণ্যটির জন্য পুঁজিপতির নিজের যা খরচ হয়েছে) পণ্যটির মূল্য থেকে পৃথক হয়। ব্যয়-দামকে আমরা যদি ব ধরি, তা হলে সূত্রটি দাঁড়াবে এই

রকম: ব=২০ সপু+২০ অপু=৪০। উদ্বৃত্ত-মূল্যকে (উ=১০) এই সূত্রটির অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, কেননা তার জন্য পুঁজিপতির কোনো খরচ পড়ে না। তাই, একটি পণ্যের উৎপাদনে পুঁজির বিনিয়োগের পরিমাণটা হল পণ্য-মূল্য বিয়োগ উদ্বৃত্ত-মূল্য।

পুঁজিপতি তার পণ্যটি বিক্রয় করে অর্থের যে অংকটি পাবে, তা শুধু তার উৎপাদন ব্যয়ই পুষিয়ে দেবে না, কিছু বাড়তি অর্থও তার অন্তর্ভুক্ত হবে (এই ক্ষেত্রে, ১০)। এই অতিরিক্তটাই হল পণ্যটিতে অঙ্গীভূত উদ্বৃত্ত-মূল্য, পণ্যটির বিক্রয়ের ফলে যা এক অর্থ-রূপ ধারণ করেছে এবং এইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে **মুনাফায়,** ম-এ। মুনাফা হল পণ্যটির পুঁজিবাদী ব্যয়-দামের, ব-এর উপরে পণ্যটির বিক্রয় দামের অতিরিক্ত। তাই এমন ধারণা হয় যে মুনাফা আগাম দেওয়া পুঁজির সমস্ত অংশ থেকেই উদ্ভূত, কিন্তু তার আসল উৎসটি চাপা থাকে। মার্কস মুনাফাকে বলেছেন উদ্বৃত্ত-মূল্যের এক পরিবর্তিত রূপ। মুনাফা শুধু রূপেই উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে পৃথক নয়, পরিমাণগত দিক দিয়েও তা উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে আলাদা হতে পারে: মুনাফা উদ্বৃত্ত-মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়, যদি একটি পণ্যের বিক্রয় দাম তার মূল্যের উপরে হয়, এবং তা উদ্বৃত্ত-মূল্যের নিচে নেমে আসে, যদি পণ্যটিকে তার মূল্যের নিচে বিক্রয় করা হয়।

সমগ্র আগাম দেওয়া পুঁজি থেকে মুনাফা উদ্ভূত মনে হয় বলে, বুর্জোয়া গবেষকরা নানা ধরনের ভ্রান্ত তত্ত্ব

খাড়া করেছেন। যেমন, 'কৃচ্ছ্রসাধনের তত্ত্ব' অনুযায়ী, পুঁজিপতি মুনাফা পায় কারণ সে তার সমগ্র পুঁজি নিজের পিছনে ব্যয় করা থেকে নিবৃত্ত থাকে, তা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। আমাদের কালে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অন্যতম বহুল প্রচলিত তত্ত্ব হল 'উৎপাদনের তিনটি বিষয়ের' তত্ত্ব; এই তত্ত্ব অনুযায়ী, পুঁজি পুঁজিপতির জন্য মুনাফা দেয়, জমি হল ভূস্বামীর জন্য জমির খাজনার উৎস, আর শ্রম শ্রমিককে মজুরি এনে দেয়। সেই তত্ত্বের রচয়িতারা অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহের আপাতদৃশ্য, ভাসাভাসা চেহারাটাকে উপস্থিত করেন সেগুলির সারমর্মের বদলে।

পুঁজিপতি কোথায় অর্থ বিনিয়োগ করবে: শিশুদের খেলনা, মোটর গাড়ি, চুইংগাম, না সমরোপকরণ উৎপাদনে, তাতে তার কিছু যায় আসে না। তার কাছে যেটা বিবেচ্য তা হল মুনাফার আয়তন। তার পুঁজির প্রতি একক-পিছু যথাসম্ভব বেশি মুনাফা সে আদায় করে নিতে চায়। **মুনাফার হার** হল একটি শতাংশ হিসেবে প্রকাশিত সমগ্র আগাম দেওয়া পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত। মুনাফার হার, র্ম-এর সূত্রটি তা হলে দাঁড়াবে এই রকম:

$$র্ম = \frac{উ}{সপু + অপু} \times ১০০ \times \frac{ব}{ম} \times ১০০$$

আমাদের দৃষ্টান্তটিতে, মুনাফার হার হবে:

$$ম' = \frac{১০}{২০ \text{ সপু} + ২০ \text{ অপু}} \times ১০০ = ২৫\%$$

সহজেই দেখা যায় যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার যত বেশি, মুনাফার হারও তত বেশি $\left(উ' \dfrac{উ}{অপু} \times ১০০\right)$। সেই সঙ্গে, মুনাফার হার পুঁজির অঙ্গীয় গঠনবিন্যাসের বিপরীত-আনুপাতিক।

পুঁজির অঙ্গীয় গঠনবিন্যাস পুঁজিবাদী শিল্পের এক শাখা থেকে আরেক শাখায় পৃথক হয়। তাই, পণ্যগুলি যদি যথামূল্যে বিক্রয় হত, তা হলে মুনাফার হার এক পুঁজিপতি থেকে আরেক পুঁজিপতির বেলায় পৃথক হত। কিন্তু, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, পুঁজির অঙ্গীয় গঠনবিন্যাস নির্বিশেষে, সমস্ত শিল্পের পুঁজিপতিরাই **সমান** পরিমাণ পুঁজির উপরে একটা **গড় মুনাফা** পায়। এ রকম কেন হয়?

ব্যাপারটা এই যে, পুঁজিবাদে বিভিন্ন **শিল্পের অভ্যন্তরে ও নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা** থাকে, এই প্রতিযোগিতা চলার সময়ে পুঁজিগুলি অপেক্ষাকৃত কম মুনাফাদায়ক শিল্পগুলি থেকে বেশি মুনাফাদায়ক শিল্পগুলিতে প্রবাহিত হয়ে চলে, এবং মুনাফার হার সমান-সমান হয়ে যেতে থাকে। পণ্যসামগ্রী আর যথামূল্যে বিক্রীত হয় না, বিক্রীত হয় **উৎপাদনের দামে,** যা পুঁজিপতিদের একটা গড় মুনাফা নিশ্চিত করে। উৎপাদনের দাম' পুঁজিবাদী ব্যয়-দাম ব যোগ গড়

মুনাফা যোগ দিয়ে গঠিত। পণ্যসামগ্রী যখন যথামূল্যে বিক্রীত না-হয়ে উৎপাদনের দামে বিক্রীত হয়, তখন পুঁজির কম অঙ্গীয় গঠনবিন্যাসবিশিষ্ট শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ স্থানান্তরিত হয় পুঁজির উচ্চতর অঙ্গীয় গঠনবিন্যাসবিশিষ্ট শিল্পগুলিতে, যেখানে মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত কম। এইভাবে, মুনাফার হার সমান-সমান হয়ে যায়। পুঁজিপতি দেশে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ থেকে সমান পরিমাণের পুঁজি বাবদ তার মুনাফার অংশটা পায়। এ থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসে যে শ্রমিকরা শুধু তাদের নিজেদের নিয়োগকর্তাদের দ্বারাই শোষিত হয় না, সামগ্রিকভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা শোষিত হয়। আর সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক সংগ্রামই শ্রমিককে মজুরি-দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে।

বাণিজ্যিক পুঁজিপতিরা তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের ভাগটা পায় **বাণিজ্যিক মুনাফার** রূপে (গড় মুনাফা)। শিল্প পুঁজিপতিরা তাদের পণ্যসামগ্রী খোদ ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করার পরিবর্তে বরং বণিকদের কাছে বিক্রয় করে। বিপণনে বিশেষ পারদর্শী বলে, বণিকের বাজার সম্বন্ধে আরও ভালো জ্ঞান আছে, এবং সে পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করতে পারে অনেক তাড়াতাড়ি. তার ফলে বিপণন বাবদ খরচ কমানো সম্ভব হয়। সেই জন্যই, শিল্প পুঁজিপতি এইভাবে প্রকৃত উৎপাদনে আরও অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে বলেই, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ বণিককে দিয়ে দিতে রাজী হয়।

শিল্পপতি ও বণিকদের পাশাপাশি, উদ্বৃত্ত-মূল্য উপযোজন করে ঋণদাতা পুঁজিপতিরাও (ব্যাংকাররা), যারা কুসীদজীবীদের প্রতিস্থাপিত করেছে। যে পুঁজি ঋণ দেওয়া হয় এবং যার **সুদ** থাকে, তাকে বলা হয় ঋণ পুঁজি।

ঋণদাতা পুঁজিপতিকে সুদ দেওয়া সম্ভব হয় এই কারণে যে, যে-পুঁজিপতি অর্থটা পায় সে সেটা ধরুন, বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করার পরিবর্তে, পুঁজি হিসেবে তার উদ্যোগে ব্যবহার করে। সেই পুঁজি ঋণ-গ্রহীতাকে একটা উদ্বৃত্ত-মূল্য দেয়, এবং সে তার একটা অংশ ব্যাংকারকে দেয় সুদের রূপে। অন্য যে কোনো পণ্যের বিক্রয়ে যেমন হয়, তেমনি পণ্য হিসেবে পুঁজির দাম নির্ভর করে তার যোগান ও চাহিদার মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্কের উপরে। সুদ হল সাধারণত গড় মুনাফার একটা অংশ। অর্থের যোগান যখন অর্থের চাহিদাকে ছাপিয়ে যায়, তখন সুদের হার কমে যায়, কিন্তু কেউই বিনা সুদে অর্থ ধার দেয় না।

সুদ মুনাফার একটা অংশ হলেও তার উৎসটি অস্পষ্ট থাকে, ফলে এমন একটা ধারণা হয় যেন অর্থ নিজেই অর্থ আয়ের জন্ম দেয় সুদের রূপে, ঠিক যেমন একটি আপেল গাছে আপেল ফলে। ভাষান্তরে, তদবস্থ অর্থকেই মনে হয় আয়ের উৎস। সেই চরম গূঢ় রহস্যটির জন্ম হয় ঋণ পুঁজির সূত্রটি থেকেই: অ—অ', যেখানে অ'=অ+উ।

পুঁজিপতিরা অর্থ ঋণ দেয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানসমূহ, বা **ব্যাংকগুলির** মারফৎ। ব্যাংকাররা হল অর্থ

পুঁজিপতিদের বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত প্রতিনিধি, পণ্য-পুঁজির ব্যাপারী। শিল্প পুঁজিপতি ও বাণিজ্যিক পুঁজিপতি আর সংগঠনগুলির মুক্ত অর্থ সম্পদ, ব্যক্তিগত সাশ্রয়, এবং রংতিয়ে (যে পুঁজিপতিরা নিজেদের ব্যবসায় চালানোর পরিবর্তে সুদের রূপে একটা আয় পাওয়াই পছন্দ করে) নামে পরিচিত কুপনধারীদের তহবিলও ব্যাংকগুলিতে চলে যায়, ব্যাংকগুলি আমানতকারীদের নির্দিষ্ট একটা সুদ দেয়। ব্যাংকগুলি কিন্তু তাদের সংগৃহীত অর্থের অংকটাকে স্রেফ ধরে রাখে না, তা তারা সক্রিয়ভাবে ঋণ দেয়, এবং দেয় উচ্চতর সুদের হারে। ব্যাংকগুলি হল পুঁজিবাদী উদ্যোগ, যেগুলি ঋণ পুঁজির বাণিজ্য করে। গড় মুনাফার রূপে ব্যাংকারের মুনাফা আসে আমানতগুলির রূপে পাওয়া অর্থের উপরে ব্যাংকের দেওয়া সুদ আর ব্যাংকের দেওয়া ঋণের উপরে তার পাওয়া সুদের মধ্যকার পার্থক্য থেকে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ জমির মালিকদের কাছে যায়। কীভাবে সেটা ঘটে?

বলতে গেলে প্রায় সব পুঁজিবাদী দেশেই, বড় বড় আয়তনের জমি এখনও বৃহৎ ভূস্বামীদের মালিকানাধীন। তারা সাধারণত নিজেরা নিজেদের জমিতে চাষ-আবাদে লিপ্ত হয় না, বরং নির্দিষ্ট একটা অংকের অর্থের বিনিময়ে ইজারাদার-পুঁজিপতিদের (কিংবা পুঁজিপতি খামার-মালিকদের) জমির টুকরো ইজারা দেয়। পুঁজিপতিরা তাদের নিযুক্ত খামার-শ্রমিকদের শোষণ থেকে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য পায়, তার

একটা অংশ ভূস্বামীদের দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ইজারাদার পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশটাকে জমির মালিকের হাতে তুলে দেয় তাকে বলা হয় **জমির খাজনা।**

আগে আলোচিত সামন্ততান্ত্রিক খাজনা থেকে পুঁজিবাদী জমির খাজনা আলাদা। প্রথম, সামন্ততান্ত্রিক খাজনা হল দুটি শ্রেণীর মধ্যে, সামন্ত প্রভু আর ভূমিদাসদের মধ্যে সম্পর্ক, পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী খাজনা হল তিনটি শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক: ভূস্বামী, ইজারাদার পুঁজিপতি ও খামার-শ্রমিক। দ্বিতীয়, সামন্ততান্ত্রিক খাজনার রূপে ভূস্বামীরা উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমগ্রটাই তুলে নিত, পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী জমির খাজনার রূপে তারা তুলে নেয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের শুধু একটা অংশ। অন্য অংশটা ইজারাদার পুঁজিপতির কাছে চলে যায় পুঁজির উপরে মুনাফার রূপে।

ইজারাদার পুঁজিপতি জমির খাজনা দেওয়ার জন্য অর্থটা কোথা থেকে পায়?

জমির বিভিন্ন টুকরোর উর্বরতা বিভিন্ন প্রকার, তাই জমির বিভিন্ন টুকরোয় নিযুক্ত সমান পরিমাণের পুঁজির ফলে উৎপাদের একক-পিছু ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফলন ও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ হবে। বিনিয়োগগুলি সবচেয়ে বেশি হবে সবচেয়ে কম উর্বর জমির টুকরোয়, এবং সবচেয়ে কম হবে সবচেয়ে বেশি উর্বর জমির টুকরোয়। কিন্তু উভয় জমির টুকরো থেকে জাত উৎপাদই বিক্রি হবে সমান দামে, তা নির্ধারিত হয় সবচেয়ে খারাপ জমিতে একক-পিছু বিনিয়োগ দিয়ে।

এর কারণ, জমির পরিমাণ সীমিত এবং সবচেয়ে কম উর্বর জমির টুকরোগুলি বর্জন করা যায় না, কেননা সমস্ত জমির উৎপাদই সমাজের প্রয়োজন। তাই, যে পুঁজিপতিরা সবচেয়ে ভালো বা মাঝারি উর্বর জমিগুলিতে চাষ-আবাদ করে তারা একটা বাড়তি মুনাফা পায়। সেই মুনাফাটা ভূস্বামীর কাছে যায় জমির খাজনার রূপে, আর ইজারাদার পুঁজিপতি একটা গড় মুনাফা পায়। জমির বিভিন্ন ধরনের উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত খাজনাকে বলা হয় **পার্থক্যমূলক** খাজনা ১। জমির একটা টুকরো যখন বাজারের কাছাকাছি অবস্থিত হয় তখনও এই খাজনা দেখা দেয়, কেননা পরিবহণ ব্যয় যত কম হবে, ইজারাদার পুঁজিপতির মুনাফা তত বেশি হবে।

পুঁজিপতি খামার-মালিক যন্ত্রপাতি, সার, উৎকৃষ্ট বীজ, প্রভৃতি ব্যবহার করে তার উৎপাদন ও জমির উর্বরতা বাড়াতে পারে। এ সবের জন্য সেই একই জমির টুকরোগুলিতে বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগ দরকার হয়। কিন্তু সমান বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগের ফলে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদ ফলতে পারে, বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকরতা থাকে। অধিকতর কার্যকর পুঁজি বিনিয়োগ পুঁজিপতির জন্য বাড়তি মুনাফা নিশ্চিত করে, ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সে সেই মুনাফা পাবে। ইজারা পুনর্নবীকরণের সময়ে, ভূস্বামী খাজনা বাড়িয়ে দেবে, এবং সেই বাড়তি মুনাফা চলে যাবে ভূস্বামীর পকেটে। একই জমির টুকরোয় বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগ থেকে পাওয়া গড় মুনাফার

উপরেও সেই উদ্বৃত্তটাকে বলা হয় **পার্থক্যমূলক খাজনা ২**।

ইজারাদার পুঁজিপতি ভূস্বামীকে যে নজরানা দেয় তা পার্থক্যমূলক খাজনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভূস্বামীরা সবচেয়ে খারাপ জমি থেকেও খাজনা পায়। সেটা কোথা থেকে আসে?

সবচেয়ে খারাপ জমির টুকরোর মালিক সেটা ইজারাদার পুঁজিপতির হাতে মাগনায় ছেড়ে দেয় না, ফলে সেই জমির টুকরো থেকে উৎপাদটি বিক্রি করার সময়ে ইজারাদার পুঁজিপতিকে গড় পুঁজির উপরেও একটা উদ্বৃত্ত আদায় করে নিতে হয় ভূস্বামীকে খাজনা মেটানোর জন্য। তার মানে এই যে খামারজাত উৎপাদের বাজার-দাম সবচেয়ে মন্দ জমির টুকরোর উৎপাদনের দামের চেয়ে বেশি হতে হবে (সবচেয়ে মন্দ জমির টুকরোয় উৎপাদন-ব্যয় তৎসহ গড় মুনাফা)। সেই উদ্বৃত্তটা কোথা থেকে আসে?

ব্যাপারটা এই যে কৃষিতে কৃৎকৌশলগত স্তর শিল্পের তুলনায় নিচু, তাই তাতে পুঁজির অঙ্গীয় গঠনবিন্যাসও নিচু। সেই জন্যই, কৃষিতে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি শিল্পে তা গড়ে যেমন তা করে তার চেয়ে আপেক্ষিকভাবে বেশি মজুরি-শ্রমকে চালু করে এবং ফলত, তার চেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয়। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা হেতু শিল্পপতি আর কৃষি পুঁজিপতিদের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের এক পুনর্বণ্টন হতে পারে না। তাই, ভূস্বামী উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই অংশটি উপযোজন করে, সেটি **অনাপেক্ষিক খাজনার** রূপ ধারণ করে।

পার্থক্যমূলক খাজনার বিপরীতে, অনাপেক্ষিক খাজনা জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কিত। খামারজাত উৎপাদকে তা আরও বেশি ব্যয়সাপেক্ষ করে, তাই জনগণের জীবনমান নামিয়ে আনে। জমির খাজনা হল এমন একটা নজরানা, সমাজ যা ভূস্বামীদের পরগাছা শ্রেণীটিকে দিতে বাধ্য হয়। উচ্চতর খাজনা জমির দাম বাড়ায় এবং উৎপাদনশীল বিনিয়োগ থেকে পুঁজিকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়, শহরে ও গ্রামে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশকে মন্থরতর করে। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমজীবী জনগণকে খাজনার আরও ভারি বোঝা বহন করতে হয়।

সংকটের অর্থনীতি

পুঁজিবাদী সমাজে, সমস্ত ক্রিয়াশীল পুঁজির সমগ্রতা, পরস্পরসম্পর্ক ও পরস্পরনির্ভরশীলতা নিয়ে গঠিত হয় **সামাজিক পুঁজি**। সেই সামাজিক পুঁজির সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন হতে হলে, সমস্ত পুঁজিপতিরই নিজেদের উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী: উৎপাদনের উপায় ও ভোগের সামগ্রী বিক্রয় করার সুযোগ থাকা দরকার। ব্যবহৃত হয়ে-যাওয়া প্রয়োজনীয় পুঁজিগত সামগ্রী প্রতিস্থাপন করার জন্য সেগুলি ক্রয় করতে সক্ষমও তাদের হওয়া দরকার। শ্রমিকদের নিজেদের শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ক্রয় করতে, এবং পুঁজিপতিদের ভোগ্যপণ্য ও

বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম হওয়া দরকার। নিজেদের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে পুঁজিপতিদেরও দরকার তাদের উৎপাদন-ব্যয় তুলে নেওয়া এবং একটা মুনাফা পাওয়া।

সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদনে, প্রধান সমস্যাটা হল সামগ্রীতে ও মূল্যে সামাজিক উৎপাদ উশুল করার সমস্যা। সংক্ষেপে, উৎপাদের যে অংশটি তার শরীরী রূপে (উৎপাদনের উপায় ও ভোগের সামগ্রী) ও মূল্যের রূপে (স্থির পুঁজি — সপু, অস্থির পুঁজি — অপু, উদ্বৃত্ত-মূল্য — উ) সামাজিক উৎপাদটির প্রতিটি অংশকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে, বাজারে সেটিকে কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায় সেটাই হল সমস্যা। মার্কস তাঁর পুনরুৎপাদনের পরিকল্পগুলিতে দেখিয়েছেন ('পুঁজি', খণ্ড ২), সামাজিক উৎপাদের মসৃণ পুনরুৎপাদনের জন্য এমন অবস্থা দরকার যেখানে উৎপাদনের উপায় উৎপাদন ও ভোগের সামগ্রী উৎপাদনের মধ্যে (কিংবা সামাজিক উৎপাদনের বিভাগ ১ ও ২-এর মধ্যে), এবং স্থির পুঁজি, অস্থির পুঁজি ও উদ্বৃত্ত-মূল্য, প্রভৃতির মধ্যেও নির্দিষ্ট অনুপাতগুলি বজায় রাখা যায়।

কিন্তু, পুঁজিবাদী বাস্তবতায়, এই সমস্ত অবস্থা ও অনুপাত নিয়ত ব্যাহত হয়। যে সমাজে পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত উৎপাদক এক অনিশ্চিত বাজারের জন্য কাজ করে, সে সমাজে এটাই স্বাভাবিক। প্রত্যেক পুঁজিপতি তার ক্রিয়াকলাপে অন্য পুঁজিপতিদের থেকে স্বতন্ত্র,এবং প্রত্যেকে তার নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা চালিত।

একই সঙ্গে, সব পুঁজিপতিই সামাজিক শ্রম বিভাজনের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধা, এবং একজন অপরজনের উপরে নির্ভর করে। সেই দ্বন্দ্বটি প্রকাশ পায় সামাজিক উৎপাদ উশৃঙ্খল হওয়ার মধ্যে, তা সামাজিক উৎপাদটির পুনরুৎপাদনের সমগ্র ধারাটির উপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে।

মুনাফা-অভিমুখী পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ উশৃঙ্খল হওয়ার ধারাটিকে বিঘ্নিত করে চলে, এবং তার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই দেখা দেয় প্রচণ্ড আলোড়ন আর **অতি-উৎপাদনের পর্যায়ক্রমিক অর্থনৈতিক সংকট,** সমস্ত দ্বন্দ্ব আরও জটিল হয়ে ওঠে। সংকটগুলির উদ্ভব হয়েছিল বৃহৎ পুঁজিবাদী শিল্পের সঙ্গে। প্রথম অর্থনৈতিক সংকট ১৮২৫ সালে দেখা দিয়েছিল ইংলণ্ডে, যখন ইংলণ্ড ছিল পৃথিবীর শিল্প কর্মশালা। প্রথম বিশ্বব্যাপী সংকট ঘটেছিল ১৮৪৭-১৮৪৮ সালে, যখন পুঁজিবাদ অনেকগুলি দেশে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিল এবং একটি বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজার গঠিত হয়েছিল। ১৮৭৩ সালে, পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছিল প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদের ইতিহাসে গভীরতম সংকট, যা উৎপাদনের ঘনীভবন ও একচেটিয়া সংস্থাগুলির গঠনে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। ১৯০০-১৯০৩ সালের সংকট ছিল সাম্রাজ্যবাদী কালপর্বের প্রথম সংকট। 'মহা মন্দা' নামে পরিচিত, গভীরতম ও জটিলতম সংকট গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল ১৯২৯-১৯৩২ সালে। গত দশকে, উৎপাদনে চক্রবৎ মন্দাগুলি আরও অনেক

গভীর হয়ে উঠেছে। স্থায়িত্বকাল ও নিবিড়তায়, ১৯৭৩-১৯৭৫ এবং ১৯৮০-১৯৮২-র সংকটগুলি ছিল যুদ্ধোত্তর কালে সবচেয়ে গুরুতর সংকট। সংকটগুলি অতীতের ব্যাপার এবং উৎপাদন বৃদ্ধিহারে মাঝে মাঝে শুধু অবনতি ঘটেছিল মাত্র — এই মর্মে বহু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের সাম্প্রতিক বক্তব্য সত্ত্বেও, সেগুলির ফলে উৎপাদনে চরম অবনতি ঘটেছিল।

এঙ্গেলসের কথায়, একটা অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে গোটা শিল্প ও বাণিজ্যিক জগৎ লাইনচ্যুত হয়। আসন্ন সংকটের প্রথম লক্ষণগুলি সাধারণত দেখা দেয় সঞ্চলন-ক্ষেত্রে, অর্থ সঞ্চলন ও ক্রেডিটের এক গন্ডগোলের মধ্যে। বহু সংস্থা ও ব্যাংক — তার মধ্যে বড়গুলিও পড়ে — দেউলিয়া হয়ে যায়। শিল্পপতি, বণিক, ব্যাংকার আর দালালদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সকলেরই অর্থ-পুঁজি দরকার হয় নিদারুণভাবে। উত্তমর্ণরা ঋণ শোধ দাবি করে, আর আমানতকারীরা তাদের সঞ্চয় তুলে নেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলিতে ভীড় জমায়। বিক্রি করা যাবে না এমন সব পণ্যে বাজার উপচে পড়ে। বহু উদ্যোগ, বিশেষত ছোট ছোট উদ্যোগ, বন্ধ হয়ে যায়। বেকারদের বাহিনী স্ফীত হয়, আর মজুরি হ্রাস পায়। দাম কমে গেলেও কার্যকর চাহিদা বাড়ে না, এবং পণ্যসামগ্রীপুঞ্জ হ্রাস পায় না। ঊর্ধ্বমুখী মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনীতির সামরিকীকরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশে ক্রমবর্ধমান বাজেট ঘাটতির বর্তমান পুঁজিবাদী অবস্থায় পণ্যসামগ্রীর অতিরিক্ত মজুত বিক্রি করা বিশেষভাবেই দুষ্কর।

সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য, পুঁজিপতিরা তাদের পণ্যসামগ্রীর 'অতিরিক্ত' মজুত থেকে মুক্তি পেতে ও দাম বাড়াতে চেষ্টা করে। উৎপাদনের পরিমাণ কমানো ছাড়াও তারা বিপুল পরিমাণ সামগ্রী ধ্বংস করে ফেলে, ফার্নেসে কয়লার পরিবর্তে গম আর ভুট্টা জ্বালায়, কফি ও কোকো সমুদ্রে ফেলে দেয়, গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি, ফল, ওয়াইন ও অন্যান্য মূল্যবান খাদ্যসামগ্রী ধ্বংস করে ফেলে। তাই প্রশ্ন ওঠে: এ কথা কি সত্যি যে প্রকৃতপক্ষে 'অত্যধিক' সামগ্রী উৎপন্ন হয়?

অবশ্যই না। মৌল ভোগ্যপণ্যের জন্য শ্রমজীবী জনগণের চাহিদা বিরাট, বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেখানে কোটি কোটি মানুষ গৃহহীন এবং অনাহার ও অপুষ্টিতে জর্জরিত। পণ্যসামগ্রীর অতি-উৎপাদনের বিশিষ্টভাবে এক আপেক্ষিক চরিত্র আছে। 'অত্যধিক' পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় জনগণের প্রকৃত প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে নয়, বরং সেগুলির কার্যকর চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে। তাই, উদ্বৃত্তটা হল জনসাধারণের অভাব ও বঞ্চনার উৎস। এই হল পুঁজিবাদী বাস্তবের আপাতবিরোধ।

পুঁজিবাদ উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে বিরাটভাবে বিকশিত করেছে এবং শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়িয়েছে। পুঁজিবাদে, বৃহদায়তন যন্ত্রপ্রধান উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র নিবিড় হয়, উদ্যোগগুলি এক সুবিশাল পরিসরে গিয়ে পৌঁছয়, এবং সেগুলির মধ্যে সামাজিক শ্রম বিভাজন গভীর হয়। ফলে লক্ষ লক্ষ, এমন কি কোটি

কোটি লোক একই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরসম্পর্কিত হয়। কিন্তু সেই সামাজিক উৎপাদনের উৎপাদটি সমাজ ও তার সদস্যদের হাতে দেওয়া হয় না, সেটি উপযোজিত হয় ব্যক্তিগত মালিকদের দ্বারা, পুঁজিপতিদের দ্বারা।

এই হল **পুঁজিবাদের মূল দ্বন্দ্ব** — উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর শ্রমের উৎপাদগুলির উপযোজনের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী রূপের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বই **অতি-উৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকটের** মূল কারণ, এবং তা জনসাধারণের জন্য ভোগের ঘাটতি সৃষ্টি করে।

অর্থনৈতিক সংকটগুলি পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে এবং শ্রমজীবী জনগণের ভাগ্যে ডেকে আনে আরও বেকারি, কষ্টভোগ ও দারিদ্র্য। সেগুলি প্রকাশ করে পুঁজিবাদের নৈরাজ্যপূর্ণ ও লুণ্ঠনমূলক চরিত্রকে, যে-পুঁজিবাদ লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রমের ফলকে ধ্বংস করে এবং মানুষের শ্রমশক্তির অপচয় ঘটায়। সেগুলি দেখায় যে উৎপাদিকা শক্তিগুলি পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের দরুন বাধাপ্রাপ্ত, সেই সম্পর্ক তাদের বিকাশের একটা রূপ আর নয়, বরং একটা নিগড়।

অতি-উৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকট প্রভাবান্বিত করে শুধু শিল্পকেই নয়, কৃষিকেও। এইধরনের **কৃষি সংকট** মুখ্যত প্রকাশ পায় খামারজাত পণ্যের আপেক্ষিক অতি-উৎপাদনে, তার সঙ্গে থাকে দামের হ্রাসপ্রাপ্তি, উৎপাদনের পরিমাণ সংকোচন ও তীব্রতর

প্রতিযোগিতা। বৃহত্তম যেসব খামার আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা টিকে থাকে, আর ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারগুলি ঋণগ্রস্ত হয় এবং অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়। সেটা হল কৃষিতে নিহিত এক জনসংখ্যাধিক্যের লক্ষণ, যা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশেষভাবে বিরাট পরিসরে গিয়ে পৌঁছয়।

কৃষি সংকটগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সেগুলির স্থায়িত্বকাল, দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র। যেমন, প্রথম কৃষি সংকট আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭০-এর দশকের প্রথমার্ধে এবং তা স্থায়ী হয়েছিল ১৮৯০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত, এবং পরবর্তী সংকটটি — ১৯২০ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। একটা নতুন অর্থনৈতিক কৃষি সংকট শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে এবং ছিল ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত, তা মিশে গিয়েছিল শিল্প, আর্থিক ও অন্যান্য সংকটের সঙ্গে।

কৃষি সংকটগুলির প্রধান কারণ হল জমিতে একচেটিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা আর ক্রমবর্ধমান জমির খাজনা, যা খামারজাত পণ্যকে আরও ব্যয়সাপেক্ষ ও তার উশুল হওয়া কষ্টসাধ্য করে তোলে। জমির খাজনার উঁচু স্তর ও জমির ক্রমবর্ধমান দাম বিপুল পরিমাণ পুঁজিকে কৃষিতে উৎপাদনশীল ব্যবহার থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। তাতে বিঘ্নিত হয় স্থায়ী পুঁজির পুনর্নবায়ন, শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও খামারজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস, যে জিনিসটা তাকে আরও দ্রুত উশুল হতে সাহায্য করত। এই সমস্ত কারণে, এমন কি একটা সংকটের অবস্থাতেও দাম পড়ে যায়,

খামারজাত পণ্যের উশ্বল না-হওয়া মজ্বত শিল্পের তুলনায় অনেক ধীরগতিতে সংকুচিত হয়, কখনও কখনও এমন কি বেড়েও যায়। স্বভাবতই, খামারজাত পণ্যের অতি-উৎপাদন অনাপেক্ষিক নয়, আপেক্ষিক, কেননা বিপ্বল সংখ্যক জনসাধারণ, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগ্বলিতে, অণাহার ও অপ্বষ্টিতে ভোগে।

একচেটিয়া আধিপত্য

আজকের দিনের প্বঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হল একচেটিয়া আধিপত্য। বড় বড় একচেটিয়া সংস্থা ও অর্থ-যোগান গোষ্ঠী যে কোনো উন্নত প্বঁজিবাদী দেশে প্রাধান্য বিস্তার করে। একচেটিয়া আধিপত্যে উত্তরণ ঘটেছিল কখন ও কীভাবে?

একচেটিয়া সংস্থাগ্বলি আত্মপ্রকাশ করেছিল উৎপাদিকা শক্তিগ্বলির বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট **উৎপাদনের ঘনীভবনের** ভিত্তিতে। ১৯শ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে ঘটেছিল বড় বড় ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং ধাতুবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক শিল্প, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জাহাজ নির্মাণ, ও অন্যান্য শিল্পে কৃৎকৌশলগত বহ্ব কৃতিত্ব। অত্যন্ত উৎপাদনশীল যন্ত্র ব্যবহৃত হতে লাগল ব্যাপক পরিসরে, উৎপাদনের প্রয্বক্তি ও সংগঠনে ব্বনিয়াদী সব পরিবর্তন ঘটানো হল, দেখা দিল নতুন নতুন শিল্প। এই সমস্ত প্রগতিশীল পরিবর্তন ম্বখ্যত অর্জিত হয়েছিল বড় বড় উদ্যোগে, যারা এগ্বলিকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে

পারত, ফলে তাদের পণ্যসামগ্রীর দাম কমিয়ে প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে জয়ী হতে পারত। উৎপাদন ক্রমেই বেশি করে ঘনীভূত হল অল্প কয়েকটি বৃহৎ উদ্যোগে, তারা এই উৎপাদন একচেটিয়া দখলে আনল। তাই, অবাধ প্রতিযোগিতাকে স্থানচ্যুত করে তার জায়গায় এল একচেটিয়া শাসন।

১৯শ শতাব্দীর শেষ দিক ও ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, একচেটিয়া পুঁজিবাদে, বা **সাম্রাজ্যবাদে,** উত্তরণ ছিল পুঁজিবাদের প্রধান গুণধর্মগুলির বিকাশ ও ধারাবাহিকতার, উৎপাদন ও পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীকরণের যুক্তিসংগত ফল। পুঁজিবাদের বিকাশের সমগ্র ধারাই, তার উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশের ধারাই সেই উত্তরণের পথ প্রশস্ত করেছিল। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের সারমর্ম ও বৈশিষ্ট্যগুলির এক গভীর ও সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থে — যেটি ছিল মার্কসের 'পুঁজির' প্রত্যক্ষ পূর্বানুক্রম — ও তাঁর অন্য কিছু কিছু রচনায়।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি কী? **একচেটিয়া সংস্থাগুলি** হল বৃহৎ উদ্যোগ, সংস্থা বা পরিমেল, যেগুলি উৎপাদন ও বিপণনের বেশ বড় একটা অংশ নিজেদের হাতে ঘনীভূত করে, যেটা তাদের এক বা একাধিক শিল্পে আধিপত্যকে নিশ্চিত করে এবং একচেটিয়া-চড়া মুনাফা পেতে তাদের সক্ষম করে তোলে।

একচেটিয়া সংস্থাগুলি আছে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাদের রূপগুলি আলাদা আলাদা হয়, সেগুলির

মধ্যে আছে কার্টেল, সিন্ডিকেট, ট্রাস্ট ও সংস্থা। গত কয়েক দশকে দেখা গিয়েছিল অতিকায় বহু-শিল্প একচেটিয়া কর্পোরেশনগুলির উদ্ভব, যেগুলি কনগ্লোমারেট নামে পরিচিত। এই সমস্ত অতি বৃহৎ একচেটিয়া সংস্থায় একটি অর্থ-যোগান গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করে বহুবিধ শিল্প ও ক্ষেত্র, ইস্পাত ও অস্ত্রশস্ত্র থেকে শুরু করে জুয়ার আড্ডা পর্যন্ত। ফলে, সংকটগুলির সময়ে নিজেদের পুঁজি নিয়ে কারচুপি করা, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত কৃতিত্বগুলিকে আরও দ্রুত ব্যবহার করা এবং দ্রুত-পরিবর্তমান চাহিদার অবস্থায় নিজেদের প্রতিযোগীদের হারিয়ে দেওয়ার অধিকতর সুযোগ থাকে তাদের।

অতি বৃহৎ একচেটিয়া সংস্থাগুলির আধিপত্য আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন ও অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশে, দেশে উৎপাদনের বেশ বড় একটা অংশ তারা নিয়ন্ত্রণ করে। ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, পৃথিবীতে ১ শতকোটি ডলার পুঁজিসহ একটিমাত্র অতিকায় একচেটিয়া সংস্থা ছিল, ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় এই রকম একচেটিয়া সংস্থা ছিল চারটি, এবং ১৯৭৯ সালে ছিল ৬২৯টি। ১৯৭৮ সালে এই অতিকায় কর্পোরেশনগুলির আয়ত্তে ছিল সমস্ত কর্পোরেশনের মোট পুঁজির ৫০ শতাংশ এবং মুনাফার ৫৯ শতাংশ।

অবাধ প্রতিযোগিতার সাক্ষাৎ বিরোধী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, একচেটিয়া প্রথা প্রতিযোগিতাকে পুরোপুরি বাতিল করে না, প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের রূপ ও

পদ্ধতিগুলি পরিবর্তিত করে শুধু। একই শিল্পের একচেটিয়া সংস্থাগুলির মধ্যে, বিভিন্ন শিল্পের একচেটিয়া সংস্থাগুলির মধ্যে, একচেটিয়া ও অ-একচেটিয়াকৃত উদ্যোগগুলির (বহিরাগত) মধ্যে, এবং একচেটিয়া সংস্থাগুলির নিজেদের অভ্যন্তরেও তীব্র সংগ্রাম চলে। একচেটিয়া শাসন প্রতিযোগিতার নতুন নতুন রূপ ও পদ্ধতির জন্ম দেয়, অবাধ-প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক পুঁজিবাদের তা বৈশিষ্ট্যসূচক নয়। এগুলির মধ্যে আছে সরাসরি হিংসাত্মক কার্যকলাপ, ঘুষদান, গুপ্তরবৃত্তি ও বিভিন্ন অর্থগত কারচুপি। প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্যোগগুলিতে অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ ও অন্যান্য 'দুর্ঘটনা' ঘটানো হয়, গুন্ডাদের আক্রমণ সংগঠিত করা হয়, এবং অন্যান্য নোংরা কৌশল ব্যবহার করা হয় সকলের বিরুদ্ধে সকলের ধ্বংসাত্মক ও পাশবিক যুদ্ধে, যেখানে প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্বলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর টুঁটি টিপে মারে।

একচেটিয়া দাম হল একচেটিয়া সংস্থাগুলির হাতে প্রতিযোগিতার এক শক্তিশালী অস্ত্র, তা তাদের অতি-মুনাফা আদায় করতে সক্ষম করে তোলে। আমরা আগে দেখেছি সাম্রাজ্যবাদ দৃশ্যপটে আবির্ভূত হওয়ার আগে, পণ্যসামগ্রী বিক্রি হত উৎপাদনের দামে (ব্যয়-দাম যোগ গড় মুনাফা), আর একচেটিয়া আধিপত্যের অবস্থায় বেশির ভাগ পণ্যসামগ্রীই বিক্রি হয় চড়া, একচেটিয়া দামে, তা এনে দেয় একচেটিয়া অতি-মুনাফা।

প্রলেতারিয়েতের উপরে শোষণ নিবিড় করে

একচেটিয়া সংস্থাগুলি বিপুল মুনাফা আদায় করে। একচেটিয়া দামের ব্যবস্থা-প্রণালীর মধ্য দিয়ে তারা অ-একচেটিয়াকৃত উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ উপযোজন করে। ক্ষুদ্র উৎপাদকদের (খামার-কর্মীদের) উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একটি অংশও তারা উপযোজন করে একচেটিয়া-নিচু দামে তাদের খামারজাত উৎপাদ কিনে নিয়ে এবং একচেটিয়া-চড়া দামে তাদের কাছে ম্যানুফাকচারজাত উৎপাদ বিক্রি করে। সদ্যমুক্ত ও পরাধীন দেশগুলির সঙ্গে অ-তুল্যমূল্য বিনিময় একচেটিয়া অতি-মুনাফার একটা বড় উৎস। একচেটিয়া সংস্থাগুলি এই সমস্ত দেশে তাদের পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করে একচেটিয়া-চড়া দামে, আর কাঁচামাল আমদানি করে নিচু দামে। এর ফলে, উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে ও উন্নয়নশীল দুনিয়াতেও শ্রমজীবী জনগণের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে।

উৎপাদনের ঘনীভবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে ব্যাংকিং পুঁজির ঘনীভবন। ব্যাংকিং একচেটিয়া সংস্থাগুলি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল ও ক্রেডিটের ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করেছিল ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ব্যাংকিং একচেটিয়া সংস্থাগুলির, কিংবা অতিকায় ব্যাংকগুলির আত্মপ্রকাশ ব্যাংকগুলির ভূমিকাকে এবং একচেটিয়া শিল্পসংস্থাগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পরিবর্তিত করেছিল। এককালের মামুলি মধ্যগ থেকে সেগুলি পরিণত হয়েছিল সর্বশক্তিমান একচেটিয়াপতিতে, নিজেদের হাতে ঘনীভূত করেছিল সমাজের অর্থ সম্পদের বৃহদংশকে।

তারা আর একচেটিয়া শিল্পগুলিকে ক্রেডিট দেওয়ার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখল না, হয়ে উঠল সেগুলির সহ-মালিক। একচেটিয়া শিল্পগুলি তাদের দিক থেকে হয়ে উঠতে লাগল ব্যাংকিং একচেটিয়া সংস্থাগুলির সহ-মালিক। এখান থেকেই হল শিল্প ও ব্যাংকিং একচেটিয়া সংস্থাগুলির পুঁজির পরস্পর-অনুপ্রবেশ, একাঙ্গীভবন, এবং এক নতুন ধরনের পুঁজির — **ফিনান্স পুঁজির** — আত্মপ্রকাশ; এখন এটাই পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে। ফিনান্স পুঁজির গঠন হল সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, এই সাম্রাজ্যবাদ ফিনান্স পুঁজির যুগ হিসেবেও পরিচিত।

ফিনান্স পুঁজির বিকাশের সঙ্গে, মুষ্টিমেয় কিছু ধনপতি পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রাধান্য পায়। সমাজে তাদের ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে এক **ধনকুবেরতন্ত্র** বা financial oligarchy (গ্রীকভাষায়, অলিগার্কি কথাটির অর্থ 'মুষ্টিমেয়র ক্ষমতা')। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে ২০ থেকে ২৫টি অর্থ-যোগান গোষ্ঠী, ব্রিটেনে ১০ থেকে ১৫টি গোষ্ঠী, এবং ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্র ও জাপানে, ৫ থেকে ১০টি গোষ্ঠী।

ধনকুবেরতন্ত্রের শাসন চলে বিভিন্ন রূপে, মুখ্যত 'শেয়ার-হোল্ডিং প্রথার' মধ্য দিয়ে। জয়েন্ট-স্টক কোম্পানিগুলি হল পুঁজিবাদী দেশে বড় বড় উদ্যোগ সংগঠিত করার সবচেয়ে বহুল-প্রচলিত রূপ। তার পুঁজি আসে সংভার ও শেয়ার বিক্রয় থেকে। নামত

প্রত্যেক শেয়ার-হোল্ডারের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও, কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের উপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কার্যত চালায় বৃহত্তম শেয়ার-হোল্ডাররা। শেয়ার যখন বহু শেয়ার-হোল্ডারের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা যায় শেয়ারের মোট সংখ্যার মাত্র ১৫-২০ শতাংশ, এমন কি ৫-১০ শতাংশ নিয়েও; একে বলা হয় **নিয়ন্ত্রণমূলক স্বার্থ।** হোল্ডিং কোম্পানি তার কয়েক প্রজন্মের সংযুক্ত সংস্থাগুলির মারফৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এক বিশাল সামাজিক পুঁজি যা তার নিজের পুঁজিকে অনেকখানি ছাড়িয়ে যায়, এবং এইভাবে একচেটিয়া অতি-মুনাফা আদায় করে।

'ব্যক্তিগত **সম্মিলন**' হল একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ, যার মধ্য দিয়ে ধনকুবেরতন্ত্র তার শাসন প্রয়োগ করে। এর মানে এই যে শিল্প, ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক একচেটিয়া সংস্থাগুলির কর্তৃত্ব করে একই ব্যক্তিরা: ফিনান্স পুঁজির ধনপতিরা অথবা তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। তদতিরিক্ত, সরকারের সঙ্গে তাদের একটা ব্যক্তিগত সম্মিলন থাকে। ধনকুবেরতন্ত্রের শাসন **রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের** ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতার সঙ্গে পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলির ক্ষমতার এক মিলন। উৎপাদনের উপায় ও জাতীয় সম্পদের বেশ বড় একটা অংশ রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৭০-এর দশকে, শিল্পে ও কৃষিতে মোট পুঁজি সংভারে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অংশ ছিল পশ্চিম জার্মানিতে ১৮ শতাংশ, ব্রিটেনে ২৪ শতাংশ,

ইতালিতে ২৮ শতাংশ, ও ফ্রান্সে ৩৪ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল সম্পত্তি-মালিকানা দেশের জাতীয় সম্পদের ২০ শতাংশের কম নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ('সার্বজনিক') ক্ষেত্রটির অন্তর্ভুক্ত হল মুখ্যত অস্ত্র প্রস্তুতের সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্পগুলি, এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অর্থাৎ যেসমস্ত শাখা সমগ্র অর্থনীতির নানান প্রয়োজন মেটায় (পরিবহণ, বিদ্যুৎশক্তি শিল্প, যোগাযোগ, ইত্যাদি) সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্পগুলি। বহু দেশে, রাষ্ট্র বিজ্ঞানেও যথেষ্ট বিনিয়োগ করে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র একচেটিয়া সংস্থাগুলির জন্য একটা বাজার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, বিশেষত **সামরিক-শিল্প সমাহারের** উদ্যোগগুলিকে বিশাল বিশাল সামরিক কনট্র্যাক্ট দিয়ে, এবং কূটনৈতিক মদত যোগায় একচেটিয়া সংস্থাগুলির সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য, বিশেষত, পৃথিবীর নয়া-উপনিবেশবাদী ও অর্থনৈতিক পুনর্বিভাজনের কর্মনীতির জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের জন্য। এই লক্ষ্য নিয়েই বুর্জোয়া সরকারগুলি আগ্রাসী জোট স্থাপনে ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের কাজে একচেটিয়া সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগ দেয়। ফিনান্স পুঁজির স্বার্থে রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় বাজেটের মধ্য দিয়ে জাতীয় আয় বণ্টন ও পুনর্বণ্টন করে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এমন এক দাম ও মজুরির কর্মনীতি অনুসরণ করে, যা একচেটিয়া সংস্থাগুলির স্বার্থানুগ।

বিগত দশকে, একচেটিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর দক্ষিণপন্থী সমরবাদী ও প্রতিহিংসাকামী শক্তিগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্র ও জাপানে। সামরিক-শিল্প সমাহারের ও জাতি-অতিগ একচেটিয়া সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান পরাক্রম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ন্যাটোর সমরবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতির এক অর্থনৈতিক ভিত্তি যোগায়। সামরিক-শিল্প সমাহারের আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে বিভিন্ন দেশে অস্ত্র প্রস্তুতকারকদের পুঁজির পরস্পর-অনুপ্রবেশ ঘটেছে, আধুনিকতম মারাত্মক অস্ত্রের বিকাশ ও প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপকতর সহযোগিতা ঘটেছে এবং মৃত্যু ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাজারগুলির ভাগাভাগি ঘটেছে।

মানবজাতির প্রগতির পথে যা প্রধান প্রতিবন্ধক, সেই রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের বৃদ্ধি তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে শ্রমজীবী জনসাধারণের মৌল প্রয়োজন ও স্বার্থের সঙ্গে বেমানান এক জনবিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে। আকাশ-ছোঁয়া সামরিক ব্যয় উৎপাদনশীল ব্যবহার থেকে সহায়সম্পদকে বিপথচালিত করে, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত কৃতিত্বগুলির প্রয়োগকে বিঘ্নিত করে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি মন্থর করে এবং ব্যাপক বেকারি ও শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত আয়ের অবনতি ঘটায়। সামাজিক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ প্রচণ্ডভাবে কমানো হয়, তাতে জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে দারিদ্র্য আর অনাহার বাড়ে। এই অবস্থায় বুর্জোয়া রাষ্ট্র একচেটিয়া সংস্থাগুলির ইচ্ছাকেই প্রকাশ

করে, ব্যাপক অসন্তোষ দমন করার জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেয়, বহুকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রীতি-নীতিকে পদদলিত করে, জনগণের মনের উপরে নিয়ন্ত্রণ মজবুত করে এবং হিংসা ও বর্ণবাদ, জাতিদম্ভ ও যুদ্ধবাদী মনোভাব ছড়ায়।

একচেটিয়া সংস্থাগুলির বৈদেশিক সম্প্রসারণ

পুঁজি রপ্তানি হল একটা শক্তিশালী হাতিয়ার, একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে যা অতি-মুনাফা বাড়াতে সক্ষম করে তোলে। যে প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল পণ্যসামগ্রী রপ্তানি, তার বিপরীতে সাম্রাজ্যবাদের যুগটির বৈশিষ্ট্য হল পুঁজি রপ্তানি। একচেটিয়া পুঁজিবাদে, পুঁজি সঞ্চয়ন এক বিপুল পরিসরে গিয়ে পৌঁছেছে, তার ফলে দেখা দিয়েছে 'উদ্বৃত্ত' পুঁজি। অবশ্য, তা অত্যধিক অনাপেক্ষিক দিক দিয়ে নয়, বরং একচেটিয়া সংস্থাগুলির দ্বারা তার মুনাফাদায়ক বিনিয়োগের সীমিত সুযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে। কৃষির বিকাশসাধনের জন্য কিংবা জনসাধারণের জীবনমান উন্নত করার জন্য যদি পুঁজি বিনিয়োগ করা যেত, তা হলে কোনো উদ্বৃত্ত পুঁজি থাকত না। কিন্তু তা হলে পুঁজিবাদও পুঁজিবাদ থাকত না।

পুঁজি রপ্তানি হয় দুটি প্রধান রূপে: উদ্যোগপতির পুঁজি ও ঋণ পুঁজি। প্রথম ক্ষেত্রে, উদ্যোগগুলি স্থাপিত হয় অন্যান্য দেশে, এবং রপ্তানিকারক উদ্যোগের মুনাফা

পায়, সেটা উদ্ভূত হয় গ্রহীতা দেশটির শ্রমিকদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে। ঋণ পুঁজি রপ্তানি হয় ঋণের রূপে এবং তার উপরে সুদ থাকে।

পুঁজি প্রারম্ভিকভাবে রপ্তানি হয়েছিল পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে, যেখানে মজুরি কম, কাঁচামাল সস্তা, এবং ফলত মুনাফার হার চড়া। বুর্জোয়া গবেষকরা দাবি করেন যে পুঁজি রপ্তানি দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশগুলির পক্ষে উপকারক, কেননা তারা শিল্প বিকাশে বিনিয়োগ করতে, রেলপথ ও শহর নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে, পুঁজি-আমদানিকারক দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রটির উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, পরিণত হয় তার কৃষি ও কাঁচামাল যোগানদার উপাঙ্গে। পুঁজি রপ্তানি করে একচেটিয়া সংস্থাগুলি কাঁচামালের উৎস ও বাজারগুলির উপরে কর্তৃত্ব লাভ করে, পুঁজি-আমদানিকারক দেশগুলিকে টেনে নিয়ে আসে বন্ধনমূলক লেনদেনে, বিশেষত সামরিক উপকরণ ক্রয়ের মধ্যে, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে এই সমস্ত দেশে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার দায়দায়িত্ব।

পুঁজি রপ্তানির সম্প্রসারণ ঘটায়, মুষ্টিমেয় কিছু ধনী দেশ পরিণত হয় কুসীদজীবীতে, রাঁতিয়ে দেশে। এই দেশগুলি থেকে পুঁজি রপ্তানি উৎপাদনে কিছুটা মাত্রায় বদ্ধাবস্থার সঙ্গে, এবং পরগাছাবৃত্তি ও অবক্ষয়ের কিছু কিছু উপাদানের সঙ্গেও জড়িত। বিদেশী উদ্যোগগুলি থেকে নেওয়া অতি-মুনাফা বা সুদের রূপে রপ্তানি-কৃত পুঁজি বাবদ আগম সাম্রাজ্যবাদী

দেশগুলির একচেটিয়া সংস্থাগুলির সমৃদ্ধির একটা বড় উৎস।

আমাদের কালে, পুঁজি রপ্তানি কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আরও বেশি পুঁজি রপ্তানি হচ্ছে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, সর্বোপরি ইউরোপীয় দেশগুলিতে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে রাষ্ট্রীয় পুঁজি রপ্তানির পরিমাণ ও অংশ বেড়েছে। পুঁজি রপ্তানি করার সময়ে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সরকারের প্রধান লক্ষ্যটা থাকে তাদের পছন্দমতো শাসনব্যবস্থাগুলিকে শক্তিশালী করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে চালিত সামরিক-একচেটিয়া জোট প্রতিষ্ঠা করা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, রাষ্ট্রীয় পুঁজি রপ্তানি চড়া মুনাফা দেয় এবং ব্যক্তিগত পুঁজি ও পণ্যসামগ্রী রপ্তানির সুযোগ বাড়ায়।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলির গঠন ও ক্রিয়াকলাপ এবং **পুঁজিপতিদের মৈত্রীজোটগুলির মধ্যে পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্বিভাজন** পুঁজি রপ্তানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পুঁজি রপ্তানির মধ্য দিয়েই একচেটিয়া সংস্থাগুলি অন্যান্য দেশের মধ্যে ঢোকে এবং বিশ্ব বাজারে বাহুবিস্তার করে; এই পুঁজি রপ্তানির সঙ্গে জড়িত থাকে বিদেশে একচেটিয়া সহযোগী সংস্থা, উপসংস্থা ও অন্যান্য উদ্যোগ গঠন। আভ্যন্তরিক বাজারের উপরে কর্তৃত্ব লাভ করার পর অতিকায় একচেটিয়া সংস্থাগুলি বিশ্ব পুঁজিবাদী

বাজারের দিকে মন দেয়। তাদের উৎপাদনের পরিসর আভ্যন্তরিক বাজারের ক্ষমতাকে বহুদূর ছাপিয়ে যায়, এবং তাদের মধ্যে যারা বৃহত্তম তারা এত বিশাল যে কোনো কোনো পণ্যের বিশ্ব উৎপাদের বেশ বড় একটা অংশ তাদের হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে। অতিমুনাফার তাড়নায়, একচেটিয়া সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারের ভাগাভাগির ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে মতৈক্যে উপনীত হয়। উৎপাদন ও পুঁজির বিশ্বব্যাপী ঘনীভবনের সেই পর্যায়টিকে লেনিন বর্ণনা করেছেন অতি-একচেটিয়া বলে। এই ধরনের একচেটিয়া সংস্থাগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক বিভাজন বাস্তব হয়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলি প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৮৬০-এর দশক থেকে ১৮৮০-এর দশকের মধ্যে, কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্তও সেগুলির মোট সংখ্যা ছিল ৪০-এর নিচে। আমাদের কালে, সেগুলির সবচেয়ে বহুল-প্রচলিত রূপ হল জাতি-অতিগ একচেটিয়া সংস্থা, অর্থাৎ যে একচেটিয়া সংস্থা পুঁজি ও নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়ে জাতীয়, কিন্তু তার ক্রিয়াকলাপে আন্তর্জাতিক। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে ছিল ৭,৩০০টি আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থা, তার প্রত্যেকটির সহযোগী সংস্থা ছিল ২০ বা ততোধিক দেশে। এই একচেটিয়া সংস্থাগুলি পুঁজিবাদী দুনিয়ার বাণিজ্যের তিন-পঞ্চমাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। বৃহত্তম জাতি-

অতিগ সংস্থাগুলির বার্ষিক লেনদেন বহু পুঁজিবাদী দেশের মোট জাতীয় উৎপাদকে ছাড়িয়ে যায়।

১৯৬০-এর দশকের শেষ ভাগ থেকে, জাতি-অতিগ ব্যাংকগুলিরও দ্রুত বিকাশ ঘটেছে; এগুলির মধ্যে আছে বৃহত্তম মার্কিন, পশ্চিম ইউরোপীয়, জাপানী ও অন্যান্য ব্যাংক। আন্তর্জাতিক শিল্প ও ব্যাংকিং একচেটিয়া সংস্থাগুলির একাঙ্গীভূত হওয়ার প্রবণতা থাকে, তারা ফিনান্স পুঁজির জাতি-অতিগ গোষ্ঠীগুলি গঠন করে এবং একটি ধনকুবেরতন্ত্র গঠন করে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশ্ব বাজারের বিভাজন সম্পর্কে ক্রমেই আরও বেশি আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছে, যার ফলে উদ্ভব ঘটেছে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের মতো সব আন্তঃরাষ্ট্র একচেটিয়া মৈত্রীজোটের।

পুঁজিবাদের অধিবক্তারা আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার একটা বড় হাতিয়ার হিসেবে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। যেমন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা কার্ল কাউটস্কি-কর্তৃক সূত্রায়িত 'অতি-সাম্রাজ্যবাদের' তত্ত্ব অনুযায়ী, সাম্রাজ্যবাদের 'অতি-সাম্রাজ্যবাদে' বিবর্তিত হওয়া উচিত, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে একটিমাত্র 'বিশ্ব ট্রাস্ট', বিশ্ব বাজারগুলির বিভাজন সম্পূর্ণ হবে, এবং আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলি প্রশমিত হবে।

কিন্তু জীবনই এই ধরনের সব তত্ত্বকে খণ্ডন করেছে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি একই থাকে। কোনো শান্তিপূর্ণ পুঁজিবাদ নেই

এবং কখনও থাকতে পারে না, কেননা তার সহজাত ভাবাদর্শ হল বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, খোদ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে চালিত সামাজিক প্রতিহিংসাবাদ। পুঁজিবাদের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ফলে, একচেটিয়া সংস্থাগুলির মধ্যে পরিবর্তমান শক্তিসাম্য অনুযায়ী কাঁচামালের উৎস, পুঁজি-বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও বাজারের নতুন পুনর্বিভাজন ঘটে মাঝে মাঝেই। এই পুনর্বিভাজনগুলির সঙ্গে জড়িত থাকে ফিনান্স পুঁজির বিভিন্ন জাতি-অতিগ গোষ্ঠী আর তাদের সমর্থনকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে এক তীব্র সংগ্রাম। একচেটিয়াপতিদের মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি স্বল্পায়ু হয় এবং তাতে নিহিত থাকে তীব্র বিরোধ ও সংঘর্ষের বীজ।

সদ্যমুক্ত দেশগুলিতে অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জাতি-অতিগ সংস্থাগুলি সেই দেশগুলির অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা স্থায়ী করে রাখতে চায়। এই দেশগুলির ও শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে তাতে ব্যবধানটা বিস্তৃততর হয়, পশ্চিমের কাছে তাদের আর্থিক ঋণগ্রস্ততা দ্রুত বেড়ে ১৯৮৩ সালে ৮০০ শতকোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বহু উন্নয়নশীল দেশ পশ্চিমের কাছ থেকে যে নতুন ক্রেডিট পায় তার ৯০ শতাংশ পর্যন্ত (এমন কি ১০০ শতাংশও) দিয়ে দিতে বাধ্য হয় পুরনো ঋণের সুদ পরিশোধ করার জন্য।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন

১৯শ শতাব্দীর শেষে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, এবং কার্যত সমগ্র আফ্রিকা, এশিয়ার একটা বৃহৎ অংশ এবং অনেকগুলি লাতিন আমেরিকান দেশ একচেটিয়া পুঁজির শিকার হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কার্যসিদ্ধির উপায় বাছার ব্যাপারে কোনোকালেই খুঁতখুঁতে ছিল না, তাই কাঁচামালের উৎস ও মুক্ত জমির উপরে তারা দখল কায়েম করেছিল। তথাকথিত সভ্য দুনিয়া পরিণত হয়েছিল এক পরগাছায়, যার আহার্য যোগাত ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির কোটি কোটি মানুষ। ঔপনিবেশিক জাতিগুলির উপরে চাপানো হয়েছিল হিংসা, লুণ্ঠন, অশ্রুতপূর্ব শোষণ ও বর্ণবৈষম্যের এক শাসনব্যবস্থা, যে শাসনব্যবস্থা তাদের নিমজ্জিত করেছিল দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের মধ্যে।

কিন্তু পৃথিবীর অঞ্চলগত বিভাজন একবার সম্পূর্ণ হওয়ার পর, তৃপ্তিহীন একচেটিয়া পুঁজি তৎক্ষণাৎ তাকে পুনর্বিভাজন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিকাশ ঘটে অসমভাবে, এবং তাদের মধ্যে শক্তিসাম্য পরিবর্তিত হয়। সেই জন্যই, ইতিমধ্যে বিভক্ত পৃথিবীকে আবার নতুন করে ভাগাভাগি করার জন্য সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছিল বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে এক সংগ্রামে।

সেই সঙ্গে, ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির শ্রমজীবী জনসাধারণ জাগ্রত হয়ে রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করায় এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ করায় সারা পৃথিবী জুড়ে এক বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ও গতিবেগ সঞ্চয় করেছিল। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় তাদের ইতিহাসে এক আমূল মোড়বদল সূচিত করেছিল। বিপ্লবের ঠিক পরেই, নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক জোয়াল থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামরত জাতিগুলির উদ্দেশে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছিল, তাই পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ আধিপত্য আর থাকতে পারল না। এবং যখন অনেকগুলি দেশে সমাজতন্ত্র জয়ী হল, গড়ে উঠল এক বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তখন **সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল** পুরোপুরি। একের পর এক জাতি জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে উত্থিত হল, সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্রগুলির পতাকা উত্তোলন করল। ১৯১৯ সালে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলি অধিকার করে ছিল পৃথিবীর ভূভাগের ৭২ শতাংশ এবং সেখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ ছিল সেগুলির মধ্যে, পক্ষান্তরে ১৯৮৩ সালে সেই ভূভাগের আয়তন ছিল ০·৭ শতাংশ এবং জনসংখ্যা ০·৩ শতাংশ।

কিন্তু নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে নিজের কক্ষপথে ধরে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ধূর্ততম সব পদ্ধতি ব্যবহার করে চলেছে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী

শক্তিগুলি অনুসরণ করে চলেছে নয়া-উপনিবেশবাদের এক কর্মনীতি, নিজেদের প্রভাব স্থায়ী করে রাখার ও উন্নয়নশীল দেশগুলির উপরে শোষণ নিবিড় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'উপকারক' হিসেবে ভঙ্গি করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এই দেশগুলির রক্ত শুষে চলেছে 'সাহায্যের' ছদ্মবেশে। ঢক্কা-নিনাদিত 'সাহায্যের' প্রকৃত মূল্য প্রকাশ পায় এই ঘটনা থেকে যে সদ্যমুক্ত দেশগুলির উপরে কঠোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। নয়া-উপনিবেশবাদ 'পুরনো', নির্লজ্জ উপনিবেশবাদের ধারাই চালিয়ে যাচ্ছে, যার লক্ষ্য হল পুঁজি রপ্তানি থেকে অতি-মুনাফা আদায় করে নেওয়া এবং 'বাণিজ্যের শর্তের' মধ্য দিয়ে, অথবা এই দেশগুলির রপ্তানি করা কাঁচামালের একচেটিয়া-নিচু দাম আর তাদের আমদানি করা তৈরি পণ্যগুলির একচেটিয়া-চড়া দামের মধ্যেকার পার্থক্যের মধ্য দিয়ে সদ্যমুক্ত দেশগুলিকে লুণ্ঠন করা। অ-তুল্যমূল্য বিনিময় থেকে, বিনিয়োজিত পুঁজির উপরে সুদের রূপে ও অন্যান্য রূপে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির একচেটিয়া সংস্থাগুলি যে মুনাফা তোলে তার যোগফল 'সাহায্যের' পরিমাণকে বহুগুণ ছাড়িয়ে যায়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুরনো ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের চাপানো একটিমাত্র উৎপাদন প্রথার জায়গায় এই দেশগুলি ক্রমে ক্রমে তাদের অর্থনীতির

বিচিত্রতাসাধন করছে এবং পুরো-তৈরি উৎপাদসমূহের উৎপাদন ও রপ্তানিতে বিশেষতা অর্জন করছে। তাই, সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রম বিভাজনের পুরনো রূপগুলির ভাঙনও জড়িত।

এটা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া, সদ্যমুক্ত দেশগুলির পক্ষে তা বহু অসুবিধা সৃষ্টি করে, কেননা বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাদের কবজা শিথিল করতে চায় না। এই দেশগুলিকে আমদানি করতে হয় শুধু তৈরি সামগ্রীই নয়, বহু খাদ্যসামগ্রীও, যেগুলি প্রায়শই উৎপন্ন হয় তাদেরই রপ্তানি করা কাঁচামাল দিয়ে। যেমন, গবাদি পশু রপ্তানিকারক দেশগুলিকে ক্রয় করতে হয় ঘনীভূত দুধ, আখ উৎপাদক দেশগুলিকে ক্রয় করতে হয় চিনি। এমন কি যারা কোকো বীজ ফলায়, তারাও ব্যয়সাপেক্ষ চকোলেট ক্রয় করতে বাধ্য হয়। ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি থাকলেও, সেখানে উৎপন্ন হয় পৃথিবীর শিল্পোৎপাদনের মাত্র ৭ শতাংশ। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি যেখানে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লবের ক্ষেত্র, সেখানে সদ্যমুক্ত দেশগুলি চলেছে শিল্পায়নের গোড়ার পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে। তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা, যারা এই দেশগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক, উপজাতীয় ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

অধিকাংশ সদ্যমুক্ত দেশের পক্ষেই, রাজনৈতিক

স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার পাশাপাশি সামাজিক বিকাশের কেন্দ্রীয় সমস্যাটি হল অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠা, নিজেদের শিল্প সমেত এক স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি সৃষ্টি করা এবং জনগণের জীবনমান উন্নত করা। এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে হলে, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, বিদেশী একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটানো প্রয়োজন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক কঠিন ও অধ্যবসায়পূর্ণ সংগ্রামে জাতিগুলি ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি, সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, এমন কি সরাসরি আগ্রাসনেরও আশ্রয় নেয়। নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এক সফল সংগ্রাম চালানোর জন্য ও তাকে চিরকালের মতো পরাস্ত করার জন্য আলাদা আলাদা দেশের নিজের থেকে সংগ্রাম করাই যথেষ্ট নয়, বরং এক অভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির যোগ দেওয়া উচিত।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বক্ষণ

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের শুধু সর্বোচ্চ পর্যায়ই নয়, তার চূড়ান্ত পর্যায়ও বটে। এই পর্যায়ে, উৎপাদিকা শক্তিসমূহ ও ক্ষয়প্রাপ্ত পুঁজিবাদী বহিরাবরণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যখন মানবজাতির সামনে দেখা দিয়েছে সেগুলিকে নিগড়মুক্ত করে সেগুলির বিপুল ক্ষমতাকে এই গ্রহের

সমস্ত জনগণের কল্যাণ ও সুখের জন্য ব্যবহার করার কর্তব্যকর্ম।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে, একচেটিয়া সংস্থাগুলি উৎপাদিকা শক্তিসমূহের অবক্ষয়ের একটা প্রবণতার জন্ম দেয়। প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মধ্যে তারা কৃৎকৌশলগত প্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের আধিপত্যাধীনে, কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ — সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তি - শ্রমের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়। দুরারোগ্য বেকারি, দুরারোগ্য মন্দা ও উৎপাদনের সংকট, মুদ্রাস্ফীতি এ সমস্তই পুঁজিবাদের অচিকিৎস্য রোগের লক্ষণ।

প্রতিযোগিতা, মুনাফার তাড়না আর অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবস্থায়, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে চলেছে। কিন্তু পুঁজিবাদের প্রকৃতি এমনই যে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতি অবশ্যম্ভাবীরূপেই তার দ্বন্দ্বগুলিকে আরও জটিল করে তোলে: ব্যাপক বেকারি বেড়ে যায় এবং উৎপাদনের বৃহত্তর ক্ষমতা-সম্ভাবনা আর জনসাধারণের প্রকৃত ভোগের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলে। বহুবিধ অর্থনৈতিক শাখার ও গোটা একেকটা রাষ্ট্রের বিকাশ আরও বেশি অসম হয় এবং একচেটিয়া সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়।

পুঁজিবাদ চলমান বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লবের কৃতিত্বগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে না, এবং মানবজাতির সামনের বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলি সমাধানে বাধা দেয়। সবচেয়ে গুরুতর বিশ্বব্যাপী

সমস্যা হল এক নতুন বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা এবং পৃথিবীতে যা জীবনের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে সেই অস্ত্র প্রতিযোগিতা থামানো। পুঁজিবাদ যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনের পক্ষে বিপদের একটা উৎস, এই ঘটনাটাই সম্ভবত পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের সবচেয়ে পরিচয়বাদী চিহ্ন। পুঁজিবাদী দেশগুলির মোট জাতীয় উৎপাদের একটা বড় অংশ যায়, ধরুন, মানবজাতিকে সহায়সম্পদ (শক্তি, কাঁচামাল ও খাদ্য) যোগানোর পরিবর্তে, পরিবেশ সংরক্ষণের পরিবর্তে, অর্থাৎ জনগণের জীবনমান উন্নত করার পরিবর্তে অস্ত্রসজ্জার পিছনে। যখন প্রায় এক শতকোটি মানুষ অনাহার আর অপুষ্টিতে ভোগে, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৪০,০০০ শিশু অনাহার ও রোগে মারা যায়, তখন সারা পৃথিবী জুড়ে অস্ত্র উৎপাদনের পিছনে প্রতিদিন যে প্রায় এক শতকোটি ডলার অপচিত হয়, এর জন্য পুঁজিবাদ ছাড়া আর কেউ দোষী নয়। যদিও পুঁজিবাদের অধিবক্তারা দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন, আসল কারণটা রীতিমত আলাদা। আফ্রিকায় প্রায় এক শতাব্দী ধরে, এশিয়ায় দুই শতাব্দী ধরে এবং লাতিন আমেরিকায় তিন থেকে চার শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক দেশগুলির সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়েছিল, সেখানকার সবচেয়ে উর্বর জমিগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল উপনিবেশবাদীদের জন্য একটিমাত্র ধরনের ফসল ফলানোর জন্য, এবং প্রাপ্ত উৎপাদগুলি রপ্তানি করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে।

সেই জন্যই সাম্রাজ্যবাদ হল ক্ষয়িষ্ণু ও পরগাছাসুলভ পুঁজিবাদ। শাসক শ্রেণীগুলির সম্পদ ও বিলাস বিষম বৈপরীত্যে প্রকট হয়ে ওঠে জনসাধারণের অনাহার, দারিদ্র্য ও নির্মম শোষণের পশ্চাৎপটে।

একচেটিয়া পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হল সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, একচেটিয়া বুর্জোয়া চেষ্টা করে শ্রমজীবী জনসাধারণের সংকীর্ণ নাগরিক অধিকারগুলি আরও খর্ব করতে এবং জাতিসমূহের রাজনৈতিক অধিকারগুলি দমন করতে। বুর্জোয়া শ্রেণী যখন মুক্তির পবিত্র নিশান ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল, সেসব দিন বহুকাল গত হয়েছে এবং 'মানবাধিকার রক্ষা' সংক্রান্ত তার কথাবার্তা কাউকেই প্রবঞ্চিত করতে পারে না। আধুনিক ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের ভাড়াটে অনুচরদের হিংস্র অপরাধের অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে, — তারা জাতিসমূহের পক্ষ থেকে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কোনো প্রচেষ্টা হলেই তাকে দমন করে। সাম্রাজ্যবাদ যেখানেই পারে সেখানেই তার পক্ষে সবচেয়ে মানানসই অত্যাচারী শাসনব্যবস্থাগুলিকে বসায় ও সমর্থন করে, আন্তর্জাতিক আইনের রীতিনীতি ও জাতিসমূহের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে।

পুঁজিবাদের যে দ্বন্দ্বগুলি তার চূড়ান্ত, সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়কে চিহ্নিত করে, সেই সমস্ত দ্বন্দ্বের চরম জটিলতা তার পতনের আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা প্রদর্শন করে।

এই অবস্থায়, একচেটিয়া বুর্জোয়া শ্রেণী তার

আধিপত্য বজায় রাখতে চেষ্টা করে, সমাজতন্ত্রের জয়কে স্থগিত রাখার প্রয়াসে অস্ত্রবলের হুমকির আশ্রয় নেয়। কিন্তু যার কোনো ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ নেই, সেই পুঁজিবাদকে তা রক্ষা করতে পারবে না। লেনিন যেমন বলেছেন, পুঁজিবাদ 'ইতিহাসের দ্বারা প্রাণশক্তিহীন ও দুর্বল' হয়েছে।*

অবশ্য, তার মানে এই নয় যে পুঁজিবাদ স্বেচ্ছায় ঐতিহাসিক রঙ্গভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে, কিংবা তার দ্বন্দ্বগুলির ভারে নিজে থেকে ভেঙে পড়বে। শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনী, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনসাধারণের, সমস্ত শোষিত জনগণের এক আত্মত্যাগপূর্ণ বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদের নিগড়গুলিকে ছুঁড়ে ফেলা যায়।

সাম্রাজ্যবাদ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বক্ষণ। তার ধ্বংসাবশেষ থেকে যে নতুন সমাজ উদ্ভূত হবে তার শুধু বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলিই তা সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে তাদের নিজের কবর-খনককেও: বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীকে।

পুঁজিবাদের শুকিয়ে মরে যেতে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক যুগ প্রয়োজন হয়। এটা হল বিশ্বব্যাপী পরিসরে দুটি বিপরীত সমাজব্যবস্থার — সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সংগ্রামের যুগ। আমাদের কালের সমস্ত বিপ্লবী শক্তি সেই সংগ্রামে জড়িত। প্রথমত,

---

* V. I. Lenin, 'War and Revolution', *Collected Works*, Vol. 24, 1974, p. 417.

তা হল বিদ্যমান সমাজতন্ত্র যা, নিজেকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছে সেই সমস্ত দেশে যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে এবং সেই দেশগুলিই সমগ্র শ্রমজীবী মানবজাতির কাছে আলোকসংকেতস্বরূপ। দ্বিতীয়ত, তা হল নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, যার আঘাতে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এবং তৃতীয়ত, তা হল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের সংগ্রাম।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণের কালপর্বটি হল **পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের** কালপর্ব।

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট হল পুঁজিবাদের বৈপ্লবিক উচ্ছেদের যুগ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গঠন ও বিকাশের যুগ, এবং দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের যুগ, যে সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমেই আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে; তা হল বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষয় ও ভাঙনের যুগ, বিশ্বব্যাপী পরিসরে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ। তার অনেকগুলি পর্যায় আছে। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের প্রথম পর্যায়টির সূত্রপাত হয়েছিল ১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবে, যা সমাজতান্ত্রিক সমাজের যুগটি উন্মুক্ত করেছিল এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশব্যাপী এক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়েছিল। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল ১৯৩৯-

১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও পরে, যখন অনেকগুলি ইউরোপীয় ও এশীয় দেশের জাতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের পথ গ্রহণ করেছিল। এক বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত হয়ে সমাজতন্ত্র বিশ্ব পুঁজিবাদের ক্ষেত্রটিকে আরও সংকীর্ণ করে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট গভীর হয়ে উঠেছিল এবং সেই ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল।

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তৃতীয় পর্যায়টি শুরু হয়েছিল ১৯৫০-এর দশকে, এবং তা আজও পর্যন্ত চলছে। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তুলনায়, তার তৃতীয় পর্যায়টির সূত্রপাত যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এটা আরও একবার দেখায় যে পুঁজিবাদের পতনকে মার্কসবাদীরা যুদ্ধগুলির সঙ্গে যুক্ত করে বলে যেসব কথা বলা হয়, তা সত্য নয়। আমাদের কালে মানবজাতির ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান অন্তর্বস্তু, গতিমুখ ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত হয় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রগতির জন্য সংগ্রামরত শক্তিগুলি দিয়ে। কিউবা প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য দেশ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের পথ গ্রহণ করেছে, পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যোগ দিয়েছে। জাতিসমূহের সংগ্রামের পরিণতিতে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত পতন ঘটেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু

নবীন রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল ছংড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীন বিকাশের পথ গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেছে নিয়েছে অ-পংজিবাদী বিকাশের পথ, সমাজতান্ত্রিক অভিমংখীনতার পথ। সাম্রাজ্যবাদ পংথিবীতে তার এতদিনের আধিপত্য চিরতরে হারিয়েছে। পংজিবাদের সাধারণ সংকট গভীর হয়ে চলেছে, পংজিবাদী অর্থনীতি আরও বেশি অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে, রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পংজিবাদের ফলে পংজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত দ্বন্দ্ব আরও জটিল হয়ে উঠছে এবং শোষণ ও একচেটিয়া শাসনের বিরংদ্ধে, শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম উত্তাল হয়ে উঠেছে।

শোষক শ্রেণীগংলি বিপ্লব সম্বন্ধে সর্বদাই ভীত ছিল। একচেটিয়া বংর্জোয়ারাও তার ব্যতিক্রম নয়, 'সমরোন্মাদনার' ঘোরে তারা পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র ও পংজিবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বিরোধ অস্ত্রবলে মীমাংসা করা যায় না, যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসকরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে টুঁটি টিপে মারতে ও সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল তারা নিজেরাই সেটা দেখেছে। সমাজতন্ত্রের বিরংদ্ধে এধরনের সব 'জেহাদ' ব্যর্থ হতে বাধ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অজেয় পরাক্রম, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের শান্তিকামী বৈদেশিক নীতি, এবং শান্তির জন্য জাতিসমংহের আকাঙ্ক্ষাই এর অঙ্গীকার।

সমাজের পরিকল্পনাভিত্তিক নির্মাণ: সব কিছু মানুষের জন্য

এই অধ্যায়ে আমরা অর্থশাস্ত্রের বিকাশে পুরোপুরি একটা নতুন পর্যায় নিয়ে বিবেচনা করব — বিদ্যমান সমাজতন্ত্র ও ভবিষ্যৎ কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত নতুন বিভাগটি। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ এখনও অত্যন্ত নবীন। তা আত্মপ্রকাশ করেছিল সত্তর বছর আগে, কিন্তু তার গতিশীল অগ্রগমনের পথে তা বিকশিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সামনের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপের মানে হল নতুন অভিজ্ঞতা এবং, ফলত, তার বিকাশের উপায় সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান। সেই অভিজ্ঞতা বিশেষভাবেই মূল্যবান, কারণ বিভিন্ন দেশ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথ গ্রহণ করেছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে।

বিদ্যমান সমাজতন্ত্র

সমাজতন্ত্রের সৌধটির প্রথম ভিত্তিপ্রস্তরটি যখন স্থাপিত হচ্ছিল, তখনই সোভিয়েত জনগণ

অপেক্ষা করে ছিল সেই দিনগুলির জন্য যখন তা মাথা তুলে দাড়াবে সমস্ত নিপীড়িত ও দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ জাতির আশার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই সৌধটি নির্মাণ করার সময়ে তারা এ বিষয়ে সচেতন ছিল যে তাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ইতিহাসের নিয়মের, সমাজপ্রগতির নিয়মের অনুবর্তী।

অবশ্য, পৃথিবীতে এখনও এমন সব লোক আছে যারা সেটা স্বীকার করতে রাজী হয় না। এমন কি ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনা অগ্রাহ্য করে তারা এ কথাও বলে যে সমাজতন্ত্র হল মার্কসীয় কল্পনার বস্তু, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, এবং এর উপরে লোকের আশা ন্যস্ত করা উচিত নয়।

তাদের বক্তব্যগুলি খণ্ডিত হয় বাস্তবেরই দ্বারা, **বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক সমাজের** দ্বারা, যেখানে:

— শ্রেণী ও জাতিগত নিপীড়ন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়েছে;

— বেকারি, অনাহার, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা চিরতরে দূরীভূত হয়েছে;

— প্রত্যেক নাগরিকের আছে কাজ, বিশ্রাম, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, আবাস ও বার্ধক্যে নিরাপত্তার নিশ্চিতিপ্রদত্ত অধিকার;

— জীবনের বৈষয়িক মান ধীরনিশ্চিত গতিতে উন্নত হচ্ছে, এবং প্রত্যেকেরই আছে জ্ঞানলাভের, বিশ্ব ও জাতীয় সংস্কৃতির মূল্যগুলি ভোগ করার অবাধ সুযোগ;

— উদ্যোগ, অঞ্চল, প্রজাতন্ত্র ও সমগ্র দেশের জীবনে যে কোনো সমস্যা আলোচনা ও সমাধানে অংশগ্রহণ করার বাস্তব অধিকার আছে প্রত্যেক নাগরিকের;

এমন এক কর্মনীতি অনুসৃত হয় যার উদ্দেশ্য হল সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তিকে সুদৃঢ় করা, এবং সেই কর্মনীতি সংবিধানে বিধৃত।

এই হল বিদ্যমান সমাজতন্ত্র, এই হল বাস্তব।

সেই বাস্তবের মধ্যে অবশ্য ত্রুটিবিচ্যুতি আর অমীমাংসিত সমস্যা খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু হালকা-রঙের একটা কাপড়ের উপরে গাঢ়-রঙের একটা দাগ যেমন তার আসল রঙের পরিচায়ক নয়, ঠিক সেই রকমই, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রিয়ায় ত্রুটিবিচ্যুতি তার অন্তঃসারকে ও পুঁজিবাদের তুলনায় তার অনস্বীকার্য সুবিধাগুলিকে ম্লান করে দিতে পারে না।

সোভিয়েত জনগণের কাছে, ঠিক যেমন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সচেতন সংগ্রামে যারা উত্থিত হয়েছে তাদের সকলের কাছেই, সেই ভবিষ্যৎ বলতে বোঝায় এক কমিউনিস্ট ভবিষ্যৎ। সমাজতন্ত্র হল কমিউনিস্ট সভ্যতার বিকাশে প্রথম পর্যায় মাত্র, কমিউনিস্ট সভ্যতার বিজয় আপতিক বা ব্যাখ্যাতীত হবে না, বরং তা হবে সচেতন ও উদ্দেশ্যপূর্ণ মানবিক ক্রিয়াকলাপের ফল।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ-নিয়ামক অর্থনৈতিক নিয়মগুলি সম্পর্কে একটা জ্ঞান সেই ক্রিয়াকলাপে এক দিকনির্দেশক যন্ত্র হবে। এই জ্ঞান পেতে হবে সমাজতন্ত্রের অর্থশাস্ত্র থেকে।

নতুন সমাজ নির্মাণকারী যে কোনো দেশের অর্থনীতিই -- বড় অথবা ছোট, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ অথবা যে দেশ শিল্পগত পরিপক্কতার একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় উপনীত হয়েছে — সকলের পক্ষে অভিন্ন অর্থনৈতিক নিয়ম-শাসিত। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস, তার প্রাকৃতিক, জলবায়ুগত ও অন্যান্য অবস্থার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের দরুন প্রায়শই তাৎপর্যপূর্ণ যে সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদ দেখা যায়, সেগুলির কথা স্বভাবতই মনে রাখা উচিত। কিন্তু সেই সমস্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, সমাজতন্ত্র অভিমুখে সমাজের গতির কতকগুলি সাধারণ, বুনিয়াদি সমরূপতা আছে। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের প্রতিপক্ষরা সমাজতন্ত্রের নানা ধরনের 'মডেল' সামনে খাড়া করে, যেগুলি একটির থেকে অপরটি প্রচন্ডভাবে আলাদা এবং যেগুলি নাকি অমুক-অমুক বিশেষ দেশের পক্ষে উপযুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত 'বিভিন্ন মডেলের' রচয়িতারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে পিছন দিকে টেনে পুরনো, প্রাক-সমাজতান্ত্রিক প্রয়োগের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। তাদের কেউ কেউ হাজির হয়েছে 'মানবিক চেহারার সমাজতন্ত্র' নিয়ে, যেটা কার্যত দেখা যায় মুক্তি ও গণতন্ত্রের অলীক স্লোগানে ঢাকা পুঁজিবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যরা উপস্থিত করেছে 'বাজার সমাজতন্ত্রের' তত্ত্ব, যেখানে অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে বাজার দিয়ে, এই মডেলেরও আসল কথা হল পুঁজিবাদী

বন্দোবস্তের পুনরুজ্জীবন, তৎসহ তার সমস্ত কুফল আর শ্রমজীবী জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা।

সমাজতন্ত্রের এই সমস্ত 'মডেলের' পয়গম্বরদের আসল লক্ষ্য হল বিদ্যমান সমাজতন্ত্রকে দুর্বল করা, তার অর্থ ও অন্তঃসারকে বিকৃত করা। তথাকথিত 'আফ্রিকান-ধরনের' সমাজতন্ত্রের 'মডেলগুলিও' ডিজাইন করা হচ্ছে, তার রচয়িতারা এমন কি, ধরুন, 'আরব' সমাজতন্ত্র থেকে তার আবশ্যিক প্রভেদগুলি ব্যাখ্যা করতেও পারে না। বস্তুতপক্ষে, সরকারের রূপ বা ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য প্রধান প্রধান সেই সব প্রশ্নকে বাতিল করে না, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে প্রশ্নগুলির ফয়সালা করে: শ্রমজীবী জনগণের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিগ্রহণ এবং সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্র-অভিমুখী উন্নয়নশীল দেশগুলির অভিজ্ঞতায় তা প্রতিপন্ন হয়। জনগণের কাছে ক্ষমতা উত্তরণ, উৎপাদনের উপায়ের উপরে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা, কৃষিতে সমবায়িক উপাদানগুলির বিকাশসাধন এই সমস্তই বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পথকে চিহ্নিত করে, যদিও প্রতিটি দেশ সেই পথ ধরে অগ্রসর হয় তার নিজস্ব গতিহারে ও তার নিজস্ব পদ্ধতিতে, তার নিজস্ব অসুবিধা ও দ্বন্দ্বগুলির সম্মুখীন হতে-হতে। এই দেশগুলি তাদের অর্থনৈতিক কর্মনীতিতে ক্রমেই বেশি নির্ভর করে সমাজতন্ত্রের অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কৃত নিয়মগুলির উপরে, যে অর্থশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলির বৈধতা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় প্রতিপন্ন হয়েছে।

পুঁজিবাদী সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। শুধু বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি ও সেই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে চূর্ণ করতে সক্ষম শক্তিই পুঁজিবাদে গড়ে ওঠে। সেই শক্তি হল শ্রমিক শ্রেণী, যে থাকে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের পুরোভাগে এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের পথ উন্মুক্ত করে এক বিপ্লব সম্পন্ন করে। সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলিও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে পরিপক্ক হয়: অর্থনীতির সকল শাখায় বৃহদায়তন যন্ত্রপ্রধান উৎপাদন, অর্থাৎ যে সমস্ত উৎপাদিকা শক্তিকে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যবহার করা যায়।

নির্দিষ্ট কিছু কিছু অর্থনৈতিক অবস্থায়, কোনো কোনো দেশ বিকাশের পুঁজিবাদী পর্যায়ের মধ্য দিয়ে না-গিয়েও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে যেতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে তা সম্ভব, যখন এই দেশগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জয়যুক্ত সমাজতন্ত্রের দেশগুলির সমর্থনের উপরে নির্ভর করতে পারে।

কিন্তু সমাজতন্ত্র কখনোই পুরো-তৈরি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। পুরনো ব্যবস্থার জেরগুলি কাটিয়ে উঠতে — বেশির ভাগই তীব্র এক শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে — এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের বুনিয়াদ স্থাপন করতে অল্পাবিস্তর

দীর্ঘকালব্যাপী এক ঐতিহাসিক কালপর্ব দরকার হয়। এই কালপর্বটিকে বলা হয় **পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্ব**। তা শুরু হয় শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা দিয়ে: তাদের নিজেদের শ্রমে যা সৃষ্ট হয়েছে এবং অধিকারবলে তারা যার মালিক তাকে নিজেদের হাতে গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রের শত্রুদের দুরভিসন্ধিপ্রসূত এই বক্তব্য সত্যি নয় যে সমাজতন্ত্র লুণ্ঠন দিয়ে শুরু হয়, কেননা বৃহৎ পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানার নিশ্চিহ্নকরণ এক ন্যায়সংগত পদক্ষেপ, মার্কস যা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত সূত্রে: 'দখলকারীর দখলচ্যুতি'। সদ্যমুক্ত দেশগুলির জাতিসমূহকে এ কথা বোঝানো দরকার হয় না যে শোষকদের, সর্বোপরি বিদেশী পুঁজির, অর্থনৈতিক আধিপত্যের ভিত্তি হল লুণ্ঠন ও হিংসা, যারা সমস্ত সম্পদের সত্যকার স্রষ্টা তাদের স্বেদ ও রক্ত। তাদের নিজেদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকেই তারা সেটা জানে।

নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে এবং অর্থনীতিতে কর্তৃত্বমূলক উচ্চস্থান অধিকার করে শ্রমিক শ্রেণী অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে সামনে এগিয়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণে প্রবৃত্ত হয়। সেই উত্তরণ-কালে অর্থনীতিটা হল বহুক্ষেত্রবিশিষ্ট, তাতে থাকে তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্র: বর্ধিষ্ণু সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র, শ্রমিক শ্রেণী যার প্রতিনিধিত্ব করে; ক্ষুদ্র-পণ্য ক্ষেত্র, মজুরি-শ্রম ব্যবহার করে না এমন সব কৃষক, হস্তশিল্পী, কারিগর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র উৎপাদক

গার প্রতিনিধিত্ব করে; এবং ব্যক্তিগত-পুঁজিবাদী ক্ষেত্র, শহরে ও গ্রামে মজুরি-শ্রম ব্যবহার করে এমন সব পুঁজিবাদী উদ্যোগ। অন্যান্য ক্ষেত্রও থাকতে পারে, যেমন গোষ্ঠীপতিপ্রধান ক্ষেত্র, যদি দেশে উপজাতীয় বা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক তখনও থেকে থাকে, অথবা রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী ক্ষেত্র, রাষ্ট্র যাকে ব্যবহার করে সমাজতান্ত্রিক সামাজিকীকরণের পথ প্রশস্ত করার জন্য।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্ম চলাকালে বহুক্ষেত্রগত কাঠামোটি কাটিয়ে ওঠার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলী গৃহীত হয় যাতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক সমগ্র দেশব্যাপী পরিসরে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপরে **সমাজতন্ত্র-অভিমুখী দেশগুলির** অভ্যুত্থান ও বিকাশ নতুন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করেছে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের তত্ত্ব ও প্রয়োগকে তা সমৃদ্ধ করেছে। সমাজতন্ত্র অভিমুখে এগিয়ে চলার পথে এই দেশগুলির কোনো কোনোটি এখন রয়েছে জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে, অন্যরা গিয়ে পৌঁছেছে সমাজবিকাশের এক উচ্চতর পর্যায়ে, যখন বৈপ্লবিক রূপান্তরগুলি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে।

এই সমস্ত দেশে, একটা আক্রমণাভিযান চালানো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া সংস্থা, স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্ত-প্রভুদের অবস্থানগুলির বিরুদ্ধে; রাষ্ট্র অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটাচ্ছে, বিদেশী পুঁজির ক্রিয়াকলাপের উপরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ কায়েম

করছে, পরিকল্পনার উপাদানগুলি প্রবর্তন করছে, কৃষিসংস্কার সম্পন্ন করছে, গ্রামাঞ্চলে সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে অন্যান্য প্রগতিশীল রূপান্তর কার্যকর করছে। এই সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের গতিহার ও গভীরতা এক এক দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, কিন্তু তাদের বিকাশের প্রধান ধারা অনুরূপ। তাদের সকলেই রয়েছে বিকাশের অ-পুঁজিবাদী পর্যায়ে, তারা সকলেই চেষ্টা করছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বনিয়াদ নির্মাণের ভাবাদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করতে।

উত্তরণ-কালের অন্যতম প্রধান সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণী সংগ্রামের নিবিড়ভবন। গভীরতর সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর শোষক শ্রেণীগুলির বিশেষ সুবিধাকে ক্রমেই বেশি সীমিত করে এবং তাদের স্বার্থ লঙ্ঘন করে বলে, তা নিবিড় হয়ে ওঠে। আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিরোধকে বাইরে থেকে জোরালো সমর্থন জানায় সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী শক্তিগুলি, যারা এই দেশগুলিকে আবার পুঁজিবাদী বিকাশের পথে ফিরিয়ে আনতে প্রয়াস পায়।

জনসমষ্টির যারা বৃহদংশ, যারা শোষণ দূরীকরণে, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মে উত্তরণের পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টিতে আগ্রহী সেই শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতি কৃষকসমাজের ক্রমবর্ধমান সংসক্তি সেই সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে। শ্রমজীবী জনগণের

অগ্রবাহিনী পার্টিগুলির নেতৃত্বাধীন যে সমস্ত দেশ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অবস্থান গ্রহণ করে, তারা সেই পথে বিরাট অগ্রগতি করেছে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার মূলকথা

সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথাবলম্বী যে দেশগুলির অর্থনীতি পশ্চাৎপদ, কৃষিপ্রধান, সেই দেশগুলির সামনে প্রথম কর্তব্যকর্ম হল কৃষিকেও পুনঃসংগঠিত করতে সক্ষম এক বৃহদায়তন যন্ত্রপ্রধান শিল্প গড়ে তোলা। আর যে সমস্ত দেশ ইতিমধ্যেই শিল্পায়নের পর্যায় অতিক্রম করেছে, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী বিকাশজনিত অসংগতিগুলি তাদের অবশ্যই দূর করতে হবে, যেমন: অন্যান্য শাখার স্বার্থহানি ঘটিয়ে কোনো কোনো শাখার উপরে একপেশে জোর, অনেকগুলি শাখায় যন্ত্রীকরণের অভাব, ইত্যাদি। সাধারণত দরকার শিল্প উৎপাদনের বিভিন্ন শাখাকে আরও যুক্তিসহভাবে পুনর্বিন্যাস্ত করা এবং উৎপাদনের বহু ধারাকে আধুনিক যন্ত্রপাতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এই প্রতিজ্ঞাকে প্রমাণ করেছে যে শিল্পায়নের চরিত্র ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর করে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় তা কার্যকর হয় তার উপরে, মুখ্যত উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার প্রাধান্যশালী রূপটির উপরে। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক

মালিকানার ভিত্তিতে সম্পন্ন **সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন** চরিত্রে, গতিহার ও পরিসরে, তহবিলের উৎস ও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিণতিতে পুঁজিবাদী শিল্পায়ন থেকে নীতিগতভাবে আলাদা।

পুঁজিবাদী শিল্পায়ন বুর্জোয়া অর্থনীতির সহজাত এলোমেলোভাবে ক্রিয়াশীল নিয়ম-শাসিত। সেই ধরনের উৎপাদনের প্রকৃতিটি চক্রবৎ, যা অর্থনৈতিক বিকাশের নিম্নহারের কারণ। অধিকাংশ বুর্জোয়া দেশেই শিল্পায়ন সম্পন্ন হতে ১০০ থেকে ২০০ বছর লেগেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে, তা মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়েছিল ১০-১২ বছরে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুফলগুলি এতে প্রদর্শিত হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পায়নের অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্য ছিল, তা উদ্ভূত হয়েছিল এই ঘটনা থেকে যে সে ছিল পৃথিবীতে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং বৈরিভাবাপন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা বেষ্টিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার শিল্পায়ন শুরু করেছিল অর্থনৈতিক বিকাশের এক নিচু স্তর থেকে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে অর্থনীতি ছিল বিধ্বস্ত। দেশের সুপ্রাচীন পশ্চাৎপদতা দূরীকরণ ও এক অখণ্ড সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা — অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই কাজগুলি একমাত্র সম্পন্ন করা যেত শিল্পায়নের উচ্চ হারের মধ্য দিয়েই। এই হারের সমস্যাটি ছিল বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পশ্চাৎপদ অর্থনীতি প্রধানত গঠিত ছিল লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কৃষক খামার দিয়ে, যা ছিল পুঁজিবাদের

পুনরুজ্জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি। যে পুঁজিবাদী বেষ্টনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জনগুলিকে দুর্বল ও ধ্বংস করা, সেই বেষ্টনও যত দ্রুত সম্ভব দেশের শিল্পায়ন প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল। তার জন্য দরকার ছিল সর্বাত্মক প্রচেষ্টার, জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত আভ্যন্তরিক সহায়-সম্পদের সমাবেশ ঘটানোর।

সেই দুরূহ বছরগুলিতে সোভিয়েত জনগণ যদি চরমতম চেতনা, সংগঠন ও সাহসের পরিচয় না দিত, তা হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনোই একটা পরাক্রমশালী শিল্প শক্তি, বৈরিভাবাপন্ন পুঁজিবাদী দুনিয়ার মুখোমুখি সমাজতন্ত্রের ঘাঁটি হয়ে উঠতে পারত না। সেটা ছিল এমন একটা সময় যখন ন্যূনতম অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীরও যোগান ছিল কম। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের কর্মসূচিতে অনুপ্রাণিত জনসাধারণ সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠেছিল।

১৯৩৭ সালের মধ্যে, অর্থাৎ, শিল্পায়ন অভিযান শুরু হওয়ার ১০ থেকে ১২ বছর পরে, সোভিয়েত ইউনিয়ন শিল্প উৎপাদনের পরিমাণের দিক দিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো শিল্পোন্নত দেশকে পিছনে ফেলে ইউরোপে প্রথম স্থান ও পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। ১৯১৭ সালে, পৃথিবীর শিল্পোৎপাদে এ দেশের অংশ ছিল ৩ শতাংশ, আর ১৯৩৭ সালে তা হয়েছিল প্রায় ১০ শতাংশ।

পুঁজিবাদী শিল্পায়নের বিপরীতে, সমাজতান্ত্রিক

শিল্পায়নের ফলে শ্রমজীবী জনসাধারণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের প্রত্যক্ষ উন্নতি ঘটে। বুর্জোয়া দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের যা অনিবার্য কুফল, সেই বেকারি থেকে শ্রমজীবী জনগণকে চিরতরে মুক্ত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্ষম হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের দরুন। শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে শ্রমজীবী জনগণের আয় শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুপাতে বেড়েছিল।

শিল্পায়ন দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার জন্য, জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখার কৃৎকৌশলগত পুনর্গঠনের জন্য এবং নতুন, সমাজতান্ত্রিক ধারায় কৃষির পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল। তা অর্থনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানাকে শক্তিশালী করেছিল, শহরগুলিতে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে বহিষ্কৃত করতে সাহায্য করেছিল, শিল্পে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রটির জয় ও শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছিল, সমাজে তার নেতৃভূমিকা বাড়াতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতা সংহত করেছিল।

শিল্পায়ন সোভিয়েত দেশের ভাগ্যে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সফল বিকাশই ছিল ১৯৪১-১৯৪৫ সালে ফাশিস্ত হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের জয়লাভের অন্যতম নিয়ামক বিষয়। যুদ্ধের পর, সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বৃদ্ধি ও বিকাশ সোভিয়েত

ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন বিরাট আন্তর্জাতিক তাৎপর্যসম্পন্ন ছিল। সারা পৃথিবীকে তা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুফলগুলি দেখিয়েছিল এবং মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করেছিল অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণের প্রথমতম অভিজ্ঞতা দিয়ে। প্রত্যেক দেশের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসারে, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্পন্নকারী অন্যান্য দেশও সেই অভিজ্ঞতাকে সৃষ্টিশীলভাবে ব্যবহার করেছে।

জাতিসমূহের সমতার অর্থনৈতিক বনিয়াদ

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফল ছিল সব কটি জাতীয় প্রজাতন্ত্রে ও দেশের সমস্ত অঞ্চলে আধুনিক শিল্প গঠন, তাদের অর্থনৈতিক অসমতা দূর করার পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভিত্তিতে, জারতন্ত্রী রাশিয়ার আমলে যেখানে প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্ক প্রাধান্যশালী ছিল, মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া, দূর প্রাচ্য ও অন্যান্য সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাৎপদ বহু জাতিই বিকাশের পুঁজিবাদী পর্যায়টির পাশ কাটিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে গিয়েছিল।

বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের মধ্যেকার ঐতিহাসিকসূত্রে পাওয়া ব্যবধান

কাটিয়ে ওঠায়, বিশেষত জারতন্ত্রী রাশিয়ার প্রাক্তন ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক প্রত্যন্ত এলাকাগুলির পশ্চাৎপদতা দূরীকরণে সোভিয়েত জনগণের সাফল্যের কথা এখন সারা পৃথিবী জানে। সেই পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেক প্রজাতন্ত্রকেই অনেকগুলি শতাব্দীকে সংনমিত করে কয়েকটি দশকে পরিণত করতে হয়েছিল। আমাদের কালে, তাদের সকলেরই রয়েছে অতি-উন্নত এক শিল্প-কৃষি অর্থনীতি। অর্থনৈতিক স্তরগুলি সমান হয়ে গিয়েছিল, কারণ পিছিয়ে-থাকা প্রজাতন্ত্রগুলির বিকাশ সমগ্র সোভিয়েত অর্থনীতির বৃদ্ধিকে অনেকদূর ছাপিয়ে গিয়েছিল। ১৯২২ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ৫৩৭ গুণ বেড়েছিল, অথচ এই অঙ্কটা ছিল কাজাখ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ৯৩৮ গুণ, তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ৮৯৮ গুণ, ও কিরগিজ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ৭১২ গুণ। প্রাগ্রসর জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলির অভ্যুদয় হয়েছে এমন সব এলাকায়, যেখানে বিপ্লবের সময়েও উপজাতীয় ব্যবস্থা খুবই জীবন্ত ছিল, যেখানে অজ্ঞতা ছিল সর্বব্যাপী, যেখানে সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে জারতন্ত্র পদদলিত করেছিল।

ঐতিহাসিকভাবে সংক্ষিপ্ত এক কালপর্বে, প্রাক্তন জাতীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের শিখরে গিয়ে পৌঁছেছিল। বিপ্লবের আগে, মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের ৯ থেকে ৪৯ বছর

জনগোষ্ঠীর জনসমষ্টির মধ্যে সাক্ষর ২-৮ শতাংশের বেশি ছিল না। এই অঞ্চলগুলিতে উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল না একটিও। আমাদের কালে মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলিতে ও কাজাখস্তানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে ১২৬টি, সেখানকার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৭,০৫,০০০। এই প্রজাতন্ত্রগুলির জনসমষ্টির মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের অংশটা বহু উন্নত পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় বেশি। যেমন, উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও কাজাখ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে জনসমষ্টির মাথা-পিছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ইতালি, কানাডা, ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স ও জাপানের চেয়ে বেশি।

সমস্ত সোভিয়েত জাতি ও জাতিসত্তা-কর্তৃক প্রকৃত সমানতা অর্জিত হওয়ায় এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুনিশ্চিত বিকাশ ঘটায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে গড়ে উঠেছে এক অখণ্ড জাতীয়-অর্থনৈতিক সমাহার। তা অর্থনৈতিক ভিত্তি যোগায় এক নতুন ঐতিহাসিক সত্তা গঠনের: সোভিয়েত জনগণের। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে জাতীয় সমস্যার এক বাস্তব ও আমূল সমাধান একমাত্র সম্ভব সামাজিক জীবনের এক বৈপ্লবিক পুনর্নবায়নের মধ্য দিয়েই।

নিঃস্বার্থ সহায়তা

পুরনো আমলে, পুঁজিবাদী শিল্পায়ন সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের মধ্যে, সেই দেশগুলি পৃথিবীর ভূখণ্ডের একটা বড় অংশকে গণ্য করত

পুঁজিবাদী দুনিয়ার পরিসীমা বলে, 'পুঁজিবাদী সভ্যতার করদ রাজ্য' বলে। সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায়, বহু সদ্যমুক্ত দেশ তাদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠা ও এক স্বাধীন অর্থনীতি সৃষ্টির কাজের সম্মুখীন হয়েছে। এই কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করতে হবে শিল্পায়নের ধারায়, সে কাজে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা ও সহায়তার উপরে নির্ভর করে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের আগেই লেনিন লিখেছিলেন যে বিপ্লবের বিজয়ের পর জয়যুক্ত জনগণ প্রাচ্যের জাতিগুলিকে কাছাকাছি টেনে আনার জন্য যথাসাধ্য করবে: 'আমাদের চেয়ে আরও বেশি পশ্চাৎপদ ও নিপীড়িত এই জাতিগুলিকে আমরা 'নিঃস্বার্থ সাংস্কৃতিক সহায়তা' দেওয়ার প্রয়াস করব... ভাষান্তরে, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দিকে, শ্রম হালকা করার দিকে, গণতন্ত্রের দিকে, সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে তাদের সাহায্য করব।'* তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্ম এই জাতিগুলির পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ, তারা 'নিকট ভবিষ্যতে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য... বিশ্ব ইতিহাসের আগামী দিনটি হবে এমন

---

* V. I. Lenin, 'A Caricature of Marxism and Imperialist Economism', *Collected Works*, Vol. 23, 1974, p. 67.

একটি দিন যখন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিপীড়িত জাগরূক জাতিগুলি শেষ পর্যন্ত জাগ্রত হবে এবং তাদের মুক্তির জন্য নিয়ামক দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম শুরু হবে।'*

গত কয়েক দশকে লেনিনের বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে: সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং, উপনিবেশবাদের নতুন নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, জনগণের মুক্তির বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া পরিবর্তনাতীত। সদ্যমুক্ত দেশগুলিতে সমাজবিকাশের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপ দেখা দিয়েছে, এবং তারা যে সমস্ত পথ গ্রহণ করেছে তাও রীতিমত বহুবিধ। তাদের কেউ কেউ বেছে নিয়েছে বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক পথ, অন্যত্র দৃঢ়মূল হয়েছে পুঁজিবাদী সম্পর্ক। কোনো কোনো দেশ স্বাধীন কর্মনীতি অনুসরণ করে, অন্যরা সাম্রাজ্যবাদের কর্মনীতির অনুসারী। শেষোক্তটা সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দসই, আর সদ্যমুক্ত দেশগুলির দৃঢ়তর স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদীদের আদৌ পছন্দসই নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা বলতে গেলে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করার ও সদ্যমুক্ত দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সুবিধাজনক সহযোগিতা বিকশিত করার এক সুসংগত কর্মধারা তারা অনুসরণ করছে।

---

* V. I. Lenin, 'The Question of Nationalities and Autonomisation', *Collected Works*, Vol. 36, 1971, pp. 610, 611.

বহু উন্নয়নশীল দেশের এখনও উপনিবেশবাদের গুরুতর কুফল নির্মূল করা বাকি রয়েছে, এখনও তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কৃষি ও কাঁচামাল যোগানদার উপাঙ্গ হয়ে রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপরে তাদের অব্যাহত অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার দরুন, উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে পুঁজির বহির্গমন বছরে প্রায় ১২০-১৩০ শতকোটি ডলার। এই লুণ্ঠন সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমাজপ্রগতিকে মন্থর করতে স্পষ্টতই বাধ্য। লুণ্ঠন ও শোষণ-ভিত্তিক পুরনো, ন্যায়বিচারহীন সম্পর্ক-ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত হওয়া দরকার সমানতা ও পারস্পরিক সুবিধা-ভিত্তিক এক নতুন ব্যবস্থা দিয়ে। উন্নয়নশীল দেশগুলি এই ধরনের এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সপক্ষে বলে আসছে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ তাদের এই প্রয়াসে সমর্থন জানায়।

সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাজনক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠেছে, তা হল সমানতা ও পারস্পরিক সুবিধা-ভিত্তিক এই ধরনের সম্পর্ক-ব্যবস্থার এক মূর্তরূপ। এই সহযোগিতা মুখ্যত চালানো হয় সুষম বৈদেশিক-বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে সেই সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করে যেগুলি তাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও তার কাঠামো উন্নত করার জন্য তাদের দরকার। ১৯৬০-এর

দশকের মধ্যভাগ থেকে, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে শুল্ক-মুক্ত সামগ্রী আমদানি প্রবর্তন করেছে, যার ফলে শেষোক্তদের রপ্তানির সুযোগ বেড়েছে এবং পারস্পরিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটেছে।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলির ক্রেডিট ও আর্থিক সম্পর্ক বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক নতুন ও কার্যত অভূতপূর্ব ব্যাপার। এই সমস্ত রাষ্ট্রকে ক্রেডিট দেওয়া হয় সহজ শর্তে ও দীর্ঘ মেয়াদে। ক্রেডিট অনুযায়ী নির্মিত শিল্প প্রকল্পগুলি যাতে সঞ্চয়ন সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য এই মেয়াদগুলি যথেষ্ট দীর্ঘ, ক্রেডিট পরিশোধ হয় সেই সঞ্চয়ন থেকে।

১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকের মধ্যে ৯২টি এশীয়, আফ্রিকান ও লাতিন আমেরিকান দেশে ৩,৩০০ শিল্প প্রকল্প চালু হয়েছিল পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ও কৃৎকৌশলগত সহায়তায়। উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে এই ধরনের সহযোগিতার গুরুত্ব স্পষ্ট হয় এই ঘটনা থেকে যে এশীয় ও আফ্রিকান দেশগুলিতে উৎপন্ন ৪০ শতাংশের বেশি পিণ্ড লোহা ও ৩০ শতাংশ ইস্পাত আসে সোভিয়েত সহায়তায় নির্মিত উদ্যোগগুলি থেকে।

সেই সহযোগিতার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য এই যে তা কোনো সামরিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক

দায়দায়িত্বের সঙ্গে বাঁধা নয়, কোনো কৃৎকৌশলগত নবোদ্ভাবনা, উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞান, প্রভৃতি গোপন রাখার নিয়ম তার সঙ্গে জড়িত নয়। বরং, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকতম কৃতিত্বগুলি অনুসারে সাজসরঞ্জামের সম্পূর্ণ সেট সরবরাহ করে, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সবচেয়ে দক্ষতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের পাঠায়, যাতে জাতীয় কর্মীরা নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী ও অবিচল অর্থনৈতিক সম্পর্ক পারস্পরিক সুবিধাজনক এবং তা পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলিরও উপকারে আসে। উৎপাদে পরিশোধ করার বন্দোবস্ত অনুসারে, উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছ থেকে তারা তাদের অর্থনীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী পায়।

সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের নিঃস্বার্থ সহায়তা সমাজতন্ত্র-অভিমুখী দেশগুলিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ধারার উপরে বিশেষ কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে।

এই দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক আমল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আপেক্ষিক অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার দরুন শিল্পায়ন ব্যাহত হয়। তাদের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে এবং শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের উপরে যে একপেশে, বিকৃত কাঠামো চাপিয়ে দিয়েছিল সেটা ঠিক করতে

দীর্ঘ সময় ও অনেক প্রচেষ্টা লাগে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের একটা স্থায়ী কৃষি উপাঙ্গে, কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের উৎসে পরিণত করতে চেয়েছিল।

বিদ্যমান সমাজতন্ত্র এই দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসনের নীতি আরও কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে, এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি পেতে সক্ষম করে তোলে।

কৃষির সহযোগ

সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণের পক্ষে কৃষি সহযোগ বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়নে তা সম্ভব হয়েছিল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের ফলে; এই বিপ্লব শুধু যে পুঁজিবাদী কল-কারখানাগুলিকে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল, অর্থাৎ পুঁজিবাদী সম্পত্তির জাতীয়করণ করেছিল, তাই নয়, ভূসম্পত্তিগুলিও বিলুপ্ত করেছিল। সোভিয়েত ক্ষমতার গোড়ার বছরগুলিতে, ভূস্বামী ও কুলাকদের (অর্থাৎ, মজুরি-শ্রম যারা ব্যবহার করত সেই ধনী কৃষকদের) মালিকানাধীন জমি দরিদ্রতম কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। তা কৃষক গৃহস্থালিগুলিকে শক্তিশালী করেছিল, যাদের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোত না সেই ব্যাপক দরিদ্র কৃষকদের পরিণত করেছিল মধ্য কৃষকে, যারা হয়ে উঠেছিল খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খামারজাত সামগ্রীর প্রধান

থেকে জটিলতর রূপগুলিতে, যোগান ও বিপণন সমবায় থেকে উৎপাদক সমবায়ের দিকে যেতে কৃষকদের সাহায্য করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদক সমবায়গুলি গ্রহণ করেছিল যৌথ খামারের (কলখোজ) রূপ। যৌথ খামারগুলি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। সেই পথ ধরে অগ্রসর হতে গিয়ে তারা শুধু সাফল্যেরই দেখা পায় নি, অসুবিধারও সম্মুখীন হয়েছে, বিশেষত যৌথ খামার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সঠিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, যৌথখামারে পারিশ্রমিকের পদ্ধতি, সহায়ক গৃহস্থালিগুলির ভূমিকা ও স্থান নির্দিষ্টকরণ, প্রভৃতির বিষয়ে। কিন্তু আসল জিনিসটি শুরু থেকেই স্থির হয়ে গিয়েছিল: যৌথ খামার প্রথা কৃষকসমাজকে নিয়ে এসেছিল সমাজতন্ত্রের পথে, এবং তার জয়লাভ ঘটায় সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রটি সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ও বিকাশে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ তাদের সুনির্দিষ্ট অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তা ব্যবহার করছে। তা উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষকসমাজের পক্ষেও সামাজিক চাষ-আবাদের সুবিধাগুলি দেখায়। এই সমস্ত দেশের অনেকগুলিতে কৃষকসমাজই জনসমষ্টির বৃহদংশ, কৃষি উৎপাদন বিকশিত করার জরুরি প্রশ্নটি এখনও তাদের সামনে রয়েছে।

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলির জের দূরীকরণ এই দেশগুলিতে সমাজপ্রগতির এক আবশ্যিক শর্ত। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ক্ষুদ্রায়তন কৃষক-উৎপাদনকে বৃহদায়তন উৎপাদনের ধারায় নিয়ে আসার দুটি পথ আছে। তার একটি হল বুর্জোয়া পথ, যখন বৃহদায়তন পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি তৈরি হয় এবং কৃষকরা পরিণত হয় মজুরি-শ্রমিকে, অথবা নামত স্বাধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি সম্পত্তি মালিকে (খামার-মালিক), শক্তিশালী একচেটিয়া সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতার মুখোমুখি কাজ চালাতে যাদের কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। সেটা হল সর্বনাশ, দারিদ্র্যদশা, দাসত্ববন্ধন ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার পথ।

অন্যটি হল সমাজতান্ত্রিক পথ। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক (যৌথ) মালিকানার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির (রাষ্ট্রীয় খামার) পাশাপাশি অত্যন্ত লাভজনক ও অত্যন্ত যন্ত্রীকৃত বড় বড় কৃষি উদ্যোগ গঠন এর সঙ্গে জড়িত। তা হল কৃষি কর্মের শিল্প কর্মের এক প্রকারভেদে রূপান্তর ঘটিয়ে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীগুলির মধ্যেকার প্রভেদ ক্রমে ক্রমে অপসারিত করে কৃষকসমাজের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার পথ।

সমাজতন্ত্র-অভিমুখী দেশগুলি অনুসরণ করছে দ্বিতীয়, সমাজতান্ত্রিক পথ। কৃষকদের নতুন সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে টেনে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কৃষি সংস্কারকর্ম প্রবর্তন করে। কিন্তু এই সংস্কারকর্মগুলির রূপায়ণ প্রচুর অসুবিধার সঙ্গে জড়িত, কেননা ধরাবাঁধা

চাষ-আবাদের কৌশলের ভিত্তিতে এক আধা-জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতি এই দেশগুলির কৃষিতে এখনও টিকে আছে, উপজাতীয়, গোষ্ঠীপতিপ্রধান, দাস-মালিক ও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের জেরগুলি এখনও রয়েছে। সেই সঙ্গে, গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীগত বর্গবিভাজন একটা সমৃদ্ধিশালী বর্গের জন্ম দিয়ে চলেছে, যে বর্গটি প্রগতিশীল কৃষি রূপান্তরের বিরোধী।

এই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য কাজ করে অনেকগুলি উন্নয়নশীল দেশ কৃষির সহযোগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

সাক্ষরতার চেয়েও বেশি

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শিল্পায়ন ও কৃষির যৌথীকরণের অবস্থায়, বিজ্ঞানসম্মত ধারায় চালিত বৃহদায়তন যন্ত্রীকৃত উৎপাদনের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞদের তৈরি করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষ কঠিন কাজের সম্মুখীন হয়েছিল, কেননা জারতন্ত্রী রাশিয়ার কাছ থেকে পাওয়া সর্বব্যাপী নিরক্ষরতা এক সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে কাটিয়ে ওঠা দরকার ছিল। বিপ্লবের আগে, ৯ থেকে ৪৯ বছর বয়ঃগোষ্ঠীতে রাশিয়ার জনসমষ্টির প্রায় তিন চতুর্থাংশ লিখতে-পড়তে জানত না, আর শিক্ষা ছিল শ্রমজীবী জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে। সোভিয়েত ক্ষমতা দেশে

ভূসম্পত্তিজনিত বিভাজন লুপ্ত করেছিল এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা, জাতিসত্তা, ধর্ম বা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের জন্য স্কুলগুলিকে অবারিত করে দিয়েছিল। জনশিক্ষা প্রসারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবলীর ফলে সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম ২০ বছরে প্রায় ৬ কোটি নিরক্ষর মানুষকে লিখতে ও পড়তে শেখানো হয়েছিল, যার ফলে নিরক্ষরদের অংশটা কমে এসে দাঁড়িয়েছিল ন্যূনতম মাত্রায়, এবং শেষ পর্যন্ত নিরক্ষরতা সারা দেশ জুড়ে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছিল। কিন্তু, লেনিন যে কথা বলেছিলেন, 'শুধু সাক্ষরতাই আমাদের বেশি দূর নিয়ে যাবে না। সংস্কৃতিকে আমাদের অবশ্যই আরও অনেক উঁচু স্তরে তুলতে হবে।'* উচ্চতর ও বিশেষীকৃত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এক জালবিস্তার দেশে তৈরি করা হচ্ছিল। একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল শ্রমিকদের বিভাগগুলি, যারা সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্থান করেছিল এবং সেখানকার স্নাতকদের উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেতে সক্ষম করেছিল। ১৯৩৯ সালে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাত্র ২২ বছর পরে, অর্থনীতিতে নিযুক্ত প্রত্যেক এক হাজার জনের মধ্যে ১২৩ জন ছিল উচ্চতর বা মাধ্যমিক (সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ) শিক্ষাপ্রাপ্ত।

---

* V. I. Lenin, 'The New Economic Policy and the Tasks of the Political Education Departments. Report to the Second All-Russia Congress of Political Education Departments, October 17, 1921', *Collected Works,* Vol. 33, 1976, p. 74.

আমাদের কালে, এই অঙ্কগুলি খুবই সামান্য বলে মনে হয়, কেননা ১৯৮২ সালের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপযুক্তভাবে কর্মে নিযুক্ত জনসমষ্টির প্রায় ৮৫ শতাংশ ছিল উচ্চতর বা মাধ্যমিক (সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ) শিক্ষাপ্রাপ্ত। বৈশিষ্ট্যের বিষয়, শিক্ষাগত মান বিশেষ দ্রুতভাবে বেড়েছে জারতন্ত্রী রাশিয়ার প্রাক্তন জাতীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে, প্রাচ্যের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলিও তার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ১৯৩৯ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে, প্রতি ১,০০০ জনে উচ্চতর বা মাধ্যমিক (সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ) শিক্ষাপ্রাপ্ত ১০ ও ১০ বছর বয়সের উপরে ব্যক্তিদের সংখ্যা উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বেড়েছিল ১২ গুণের বেশি এবং তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বেড়েছিল ১৫,৫ গুণ।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞরাই এক নতুন, জনগণের বুদ্ধিজীবিসমাজের মেরুদণ্ড গঠন করেছিল। লেনিনের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের পরিকল্পনা অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নে সংসাধিত এক **সংস্কৃতি বিপ্লবের** অন্যতম প্রধান ফল ছিল এই জনগণের বুদ্ধিজীবিসমাজ গঠন। তা ছিল সত্যিই এক বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া, যার উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে সংস্কৃতির শীর্ষদেশে তুলে আনা, সংস্কৃতিকে জনসাধারণের নাগালের মধ্যে আনা এবং অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির কৃতিত্বগুলি দিয়ে বিশ্ব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করা।

দেশের শিল্পায়ন, কৃষির যৌথীকরণ ও সংস্কৃতি

বিপ্লবের কর্মধারার সফল রূপায়ণ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালের দ্বন্দ্বগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব করে তুলেছিল, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রবেশ করেছিল বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পর্বে। তাই, মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের বিজ্ঞানসম্মত পূর্বাভাসগুলি ইতিহাসে সর্বপ্রথম কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হয়েছিল, মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করেছিল বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা দিয়ে। নতুন সমাজ গড়ার উপায় সম্বন্ধে বুনিয়াদী জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে অর্থনৈতিক তত্ত্ব তদনুযায়ী বিকাশলাভ করেছে। তার কয়েকটি আবশ্যিক প্রতিপাদ্য বিবেচনা করা যাক।

সমাজতন্ত্রের মূলস্তম্ভ

উৎপাদনের উপায়ের উপরে **সামাজিক মালিকানা** হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি, সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বে প্রধান উপাদান, তার মূলস্তম্ভ এবং তার প্রগতির প্রধান উৎস।

সামাজিক মালিকানা বলতে বোঝায় এই যে উৎপাদকরা নিজেরাই — শ্রমজীবী জনগণ — ঐকত্রিকভাবে, অথবা যৌথভাবে উৎপাদনের উপায়ের মালিক। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সেটাই উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের গোটা ব্যবস্থাটাকে নির্ধারণ করে।

প্রথম, সামাজিক মালিকানা উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া এবং তাই

সমাজের কিছু লোকের অন্য লোককে শোষণ করার সম্ভাবনা বাতিল করে।

দ্বিতীয়, সামাজিক মালিকানা উৎপাদনের উপায়ের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি যোগায়, সাথিসুলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্কে উৎপাদকদের একত্রে যুক্ত করে, এবং তাদের ব্যক্তিগত কাজের মান উন্নত করার জন্য তাদের নৈতিক ও বৈষয়িক প্রণোদনা দেয়।

তৃতীয়, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তা তাদের মধ্যে সর্বপ্রকার ক্ষতিকর প্রতিযোগিতাকে বাতিল করে এবং তাদের সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের উচ্চ সচেতনতার অভিব্যক্তি হিসেবে সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতা অর্জন অভিযানের উদ্ভব ঘটায়।

চতুর্থ, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা সুষম অর্থনৈতিক বিকাশের, একটিমাত্র পরিকল্পনার অধীনে সমগ্র অর্থনীতিকে চালানোর এক জরুরি প্রয়োজনের জন্ম দেয় ও তার অবস্থা সৃষ্টি করে।

সেই জন্যই সামাজিক মালিকানা হল সমাজতন্ত্রের শত্রুদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। তারা বলে যে এই মালিকানার কোনো বাস্তব অর্থনৈতিক মানে নেই, কেননা তা নাকি আসলে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, অর্থনীতির উপরে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু তারা এটা উল্লেখ করতে ভুলে যায় যে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি

মালিকানাই হল অকৃত্রিম গণতন্ত্র সহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসত্তার ভিত্তি।

জনগণের উপকারার্থে

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় অর্থনৈতিক নিয়মগুলির অন্তঃসারে ও সেগুলির ক্রিয়ার প্রকৃতিতে একটা বুনিয়াদি পরিবর্তন ঘটে। সমাজ তার অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং উৎপাদনের বিকাশকে একটিমাত্র লক্ষ্য অভিমুখে চালিত করতে সক্ষম হয়। **সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের লক্ষ্য হল সমাজের সকল সদস্যের সামগ্রিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।** সেই মহৎ ও সত্যিকার মানবিক লক্ষ্য নির্ধারিত হয় খোদ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়েই, তার মূল অর্থনৈতিক নিয়ম দিয়েই। সেই নিয়ম পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম থেকে সারগতভাবে পৃথক। ব্যক্তিগত মালিকানায়, উৎপাদন ও তার বিকাশের লক্ষ্য হল মুনাফা, আর সামাজিক মালিকানায়, তা হল শ্রমজীবী জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো এবং ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা। সম্পত্তি-মালিকানার রূপটি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত উপায়কেও নির্ধারণ করে। ব্যক্তিগত-পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও উচ্চতর মুনাফা অর্জিত হয় শ্রমজীবী জনগণের উপরে শোষণের মধ্য দিয়ে, এবং তাদের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রয়াস

যত বেশি ও তাদের জীবনমান যত নিচু, তাদের পুঁজিপতি নিপীড়কদের পরাক্রম ও সম্পদ তত বেশি। সামাজিক সম্পত্তি-মালিকানায়, উৎপাদনের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্য হল শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ পূরণ করা, এবং তাদের শ্রম যত বেশি উৎপাদনশীল, তাদের জীবনমান ও জীবনের গুণগত উৎকর্ষ তত উঁচু।

সেই জন্যই, সামাজিক মালিকানায় ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রমজীবী জনগণের অভিন্ন বুনিয়াদি স্বার্থ থাকে, যা কর্মের ঐক্য ও অভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। তা তাদের কাজ করার নতুন নতুন প্রণোদনা দেয়: তাদের প্রধানতম সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে উচ্চ সচেতনতা এবং সকলের ও প্রত্যেকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর একমাত্র উৎস হিসেবে সামাজিক সম্পদের ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রয়াস। সেই সঙ্গে, সামগ্রিকভাবে সমাজও শ্রমজীবী জনগণের এই ধরনের উন্নয়নে আগ্রহী, যা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের আরও ত্বরান্বিত বৃদ্ধির ও এক বর্ধিষ্ণু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এক অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত। সেটাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃত মানবিকবাদ প্রদর্শন করে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদনের স্বাভাবিক ও বিষয়গত লক্ষ্য হল মানুষের প্রয়োজন মেটানো। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম, শ্রমজীবী জনগণ নিজেরাই— বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্যগুলির উৎপাদকরা —

মানবজাতির প্রগতির সমস্ত ফল ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে।

সমাজতন্ত্রে জীবনমান নির্ধারিত হয় শুধু বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্যগুলির লভ্যতা দিয়েই নয়, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা, যা উদ্ভূত হয় নিশ্চিতিপ্রদত্ত কাজের অধিকার থেকে; শিক্ষালাভের অবাধ সুযোগ; সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের গঠনমূলক, অর্থপূর্ণ শ্রম ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অবস্থা যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করে সেই সমাজের পরিবেশের মতো জিনিসগুলি দিয়েও।

একটিমাত্র পরিকল্পনার অধীনে

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সুষম বিকাশ। শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতির সর্ব ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা স্থাপিত হওয়ায়, ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমগ্র জনগণের স্বার্থে অর্থনীতির সচেতন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশাসনের জন্য, সমগ্র সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের জন্য উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতা আর উৎপাদনের নৈরাজ্যের পুঁজিবাদী নিয়মটির স্থান গ্রহণ করে সমানুপাতিক ও সুষম অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ম। পরিকল্পনা হয়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্রিয়ার এক বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ।

প্রয়োজনের জগৎ থেকে মুক্তির জগতে সেই

ঐতিহাসিক অগ্র-পদক্ষেপের গুরুত্ব যে কী বিরাট তা বলা কঠিন। লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মিলিত কাজকে চালিত করা, তাদের যৌথ শ্রম সংগঠিত করা, সমগ্র সমাজের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত কৃতিত্বগুলি ব্যবহার করা এবং যুক্তিসহ ধারায় অখণ্ড অর্থনীতিকে চালানো সম্ভব করে তোলে পরিকল্পনাই। সচেতনভাবে বিশদীকৃত ও রূপায়িত একটি পরিকল্পনা উৎপাদনের আধুনিক উপায়গুলিকে দক্ষভাবে ব্যবহার করতে, এবং উৎপাদনী ও ভোগ্য পণ্যে সমাজের চাহিদা যথাসম্ভব পূর্ণভাবে মেটানোর জন্য জাতীয় অর্থনীতির শাখাগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুপাত রক্ষা করতে সাহায্য করে। পরিকল্পনা অর্থনৈতিক সমানুপাত প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তোলে, তা সামাজিক উৎপাদনের কর্মদক্ষতা বাড়াতে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের পরিসরে শ্রম-সময় সর্বাধিক মাত্রায় সাশ্রয় করতে সাহায্য করে।

জাতীয়-অর্থনৈতিক অনুপাতগুলি উন্নত করার প্রধান প্রধান ধারা নির্ধারিত হয় অর্জিত স্তরটিকে গণ্য করে দেশের অর্থনীতির বিকাশের একের পর এক প্রতিটি স্তরে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে, এই ধরনের নির্দেশক-নীতি বিশদীকৃত হয় দেশের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী বিকাশের দিকে লক্ষ রেখে, যাতে জনগণের জীবনমান উন্নত করা যায় এবং সামাজিক উৎপাদনের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা যায়। সমস্ত

জাতীয়-অর্থনৈতিক অনুপাতকে এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার অধীনস্থ করা হয়; এই কাজগুলির মধ্যে আছে উৎপাদনের উপায় উৎপাদন ও ভোগের সামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে, শিল্প ও কৃষির মধ্যে, উৎপাদন ক্ষেত্র ও পরিবহণ, প্রভৃতির মধ্যে পরস্পরসম্পর্ক।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজতন্ত্র-অভিমুখী দেশগুলি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাদের প্রথম ব্যবহারিক পদক্ষেপ করছে। কঙ্গো জন-প্রজাতন্ত্র, মাদাগাস্কার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও সেশেলস প্রজাতন্ত্র পাঁচ-সালা বিকাশ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, এবং সমাজতান্ত্রিক ইথিওপিয়া গ্রহণ করেছে দশ-সালা বিকাশ পরিকল্পনা।

একটিমাত্র পরিকল্পনার অধীনে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ, যা উৎপাদনের সমস্ত শাখা ও ধারার মধ্যে পরস্পরসম্পর্ক ও যোগসূত্র নির্ধারণ করে, এক অখণ্ড সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপাদান হিসেবে সেগুলির বিকাশের গতিহার ও গতিমুখ, এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির বণ্টন নির্ধারণ করে, তা সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব করে তোলে।

পরিকল্পনাগুলি এক বিরাট সংগঠনী শক্তি। কোন পথে সমাজকে যেতে হবে, সেগুলি তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ছকে দেয়। পরিকল্পনাগুলি হল তৎপরতার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, যেগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের দিকনির্দেশ করে এবং বর্তমান

পর্যায়ে ও দীর্ঘ-মেয়াদি পরিসরে অর্জিতব্য লক্ষ্যমাত্রাগুলি নির্ণয় করে দেয়।

বণ্টনের ন্যায়সংগত নীতি

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের অনুষঙ্গী বণ্টনের নীতি অনুসারে ব্যক্তিগত উৎপাদক 'সমাজের কাছ থেকে ফেরৎ পায় — বাদসাদ দেওয়ার পর — ঠিক সে যা তাকে দেয়',* অর্থাৎ, তার কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী। 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী' — সমাজতন্ত্রে এই হল বণ্টনের ন্যায়সংগত নীতি, যা সমতাবাদী বণ্টনের বিরুদ্ধে তথা নিজের কাজের দ্বারা একজন প্রকৃতই যা উপার্জন করে সমাজের কাছ থেকে তার বেশি নিয়ে সেই সত্যিকার সামাজিক সমতাকে লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করে এমন যে কারোরই বিরুদ্ধে চালিত। শ্রমজীবী জনগণের সমাজ বরদাস্ত করতে পারে না সেই অলস-নিষ্কর্মাদের, যারা অন্য লোকেদের শ্রমের বিনিময়ে বেঁচে থাকে এবং সামাজিক সম্পদের যথাসম্ভব বড় একটা অংশ হস্তগত করার চেষ্টা করে।

শোষণ ও কাজ করার বাধ্যবাধকতা দূর করে

---

* Karl Marx, 'Critique of the Gotha Programme,' in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, 1973, p. 17.

সমাজতন্ত্র শ্রমের গুরুত্বকে এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় উন্নীত করেছে, এবং সেটাই তার শক্তির এক অফুরন্ত উৎস। তা মানুষকে দিয়েছে কাজ করার অধিকার আর কর্তব্যও। সমাজতন্ত্রের নীতি হল 'যে কাজ করে না, সে খাবেও না।'

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদীরা সহজেই প্রতারণাযোগ্য লোককে ভয় দেখানোর জন্য এটাকে ব্যবহার করে: তারা বলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বলা যায় কী করে, যখন ব্যক্তি কাজ করতে বাধ্য। কিন্তু এ হল তাদের যুক্তি যারা অন্য লোকের শ্রমের বিনিময়ে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত। কাজ করার পবিত্র কর্তব্যে অবহেলা পরগাছাবৃত্তির সমতুল, যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতির পক্ষেই পরক। কোনো মেহনতি মানুষ এই ধরনের মনোভাবের সঙ্গে একমত হতে পারে না, এবং সেই জন্যই, এমন কি সমাজতন্ত্রে কাজ এখনও সকলের পক্ষে জীবনের মুখ্য চাহিদা হয়ে না উঠলেও, যথাসম্ভব ভালোভাবে ও কার্যকরভাবে কাজ করার বাসনা সত্যিই সামূহিক।

সেই বাসনাকে, সেই সামূহিক আগ্রহকে রাষ্ট্র সর্বপ্রকারে সমর্থন করে। রাষ্ট্র পারিশ্রমিকের ব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন করতে চেষ্টা করে, নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে যাতে ব্যক্তিগত বৈষয়িক প্রণোদনার নীতি সারা জাতীয় অর্থনীতি জুড়ে কাজ করে, এবং শ্রমের পরিমাপ ও ভোগের পরিমাপের মধ্যে যথাসম্ভব সম্পূর্ণতম সামঞ্জস্য পালনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে।

সমাজতন্ত্রে শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির

উদ্ভব ঘটে তাদের শ্রম নিয়োগের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তাদের অর্থ-আয়ের বৃদ্ধি থেকে, এবং সামাজিক ভোগ তহবিল থেকে অর্থ-প্রদান ও উপকারগুলির বিস্তৃতি থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক-দানই শ্রমজীবী জনগণের আয়ের মোট বৃদ্ধির তিন-চতুর্থাংশ, তা সুষমভাবে জনগণের ভোগ শুধু বাড়ানোই সম্ভব করে তোলে না, প্রণোদনা হিসেবে পারিশ্রমিকের ভূমিকা বাড়ানোও, কাজের চূড়ান্ত ফলাফলের উপরে, তার অধিকতর কর্মদক্ষতার উপরে তার নির্ভরতা শক্তিশালী করাও সম্ভব করে তোলে।

কমিউনিস্টবিরোধী ভাবাদর্শবিদদের সবচেয়ে প্রিয় 'তত্ত্বগুলির' একটিতে বলা হয় যে সমাজতন্ত্রে আয় পুঁজিবাদে আয়ের মতোই অসম। এই 'তত্ত্বের' রচয়িতারা দক্ষ ও অল্প-দক্ষ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মী ও শ্রমিকদের পারিশ্রমিকে পার্থক্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। কিন্তু কোনো সত্যিকার মার্কসবাদী কোনোকালে দাবি করে নি যে সমাজতান্ত্রিক বণ্টনের নীতি বলতে সমতাবাদী পারিশ্রমিক বোঝায়। সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিকের নীতিটিরই অর্থ এই যে অসম কাজের ফলে অসম পারিশ্রমিক থাকবে। আরেকটা বিষয় এই যে একজন দক্ষ শ্রমিকের উচ্চতর পারিশ্রমিক উৎপাদনে তার বৃহত্তর অবদানের সঙ্গে জড়িত। তা শ্রমজীবী জনগণের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান উন্নত করার পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা যোগায়। শিক্ষার সমান অধিকার এবং শ্রমজীবী

জনগণের শিক্ষাগত ও দক্ষতাগত মান বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্র ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সযত্ন মনোযোগ সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের পারিশ্রমিক বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। তা সুস্পষ্ট হয় শুধু ক্রমবর্ধমান দক্ষতার মান আর মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান অংশ থেকেই নয়, অপেক্ষাকৃত নিচু ও গড়-পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত বর্গগুলির, দুঃসহ জলবায়ুতে যারা কাজ করে তাদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর ব্যবস্থা, প্রভৃতি থেকেও।

সামাজিক ভোগ তহবিল, অর্থাৎ, রাষ্ট্রের দ্বারা শ্রমজীবী জনগণকে অর্থ-প্রদান ও উপকারগুলি, ভোগের ক্ষেত্রে কিছুটা অসমতা কাটিয়ে ওঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টনে এই অসমতা অবশ্যম্ভাবী (এবং এই ঘটনাটিও এর একটা কারণ যে সমান মজুরির ফলে পরিবারের গঠনবিন্যাসসাপেক্ষে ব্যক্তি-পিছু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃত আয় ঘটে)। এই সমস্ত অর্থ-প্রদান ও উপকার শ্রমিকদের ও অফিস কর্মচারীদের পারিবারিক বাজেটে এক প্রত্যক্ষগোচর সংযোজন। সামাজিক ভোগ তহবিল যদি না থাকত, এবং শ্রমজীবী জনগণের আয় যদি শুধু মজুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তা হলে পারিবারিক বাজেটে থাকত ব্যয়ের বাড়তি কতকগুলি খাত, তার জন্য বিরাট অর্থবরাদ্দ দরকার হত। যেমন, আবাসন ও সার্বজনিক উপযোগিতা বাবদ অর্থ-প্রদান বেড়ে যেত প্রায় তিন গুণ, প্রাক-স্কুল

শিশুপালন ব্যবস্থাগুলির জন্য অর্থ-প্রদান বেড়ে যেত পাঁচ গুণ, ইত্যাদি।

সামাজিক ভোগ তহবিলের বিনিময়ে জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্র যেসব ব্যবস্থা নেয়, সেগুলি ব্যক্তিকে তার সারা জীবন সাহায্য করে, প্রভাবিত করে তার অস্তিত্বের প্রতিটি দিককে: কাজের অবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সন্তানদের লালনপালন, সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ, আবাসন, বিশ্রাম ও অবসরবিনোদন, প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক হাতিয়ার

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এক সুষম বিকাশের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা আপনা থেকেই কার্যকর হয় না, তার জন্য দরকার হয় রাষ্ট্র ও শ্রমজীবী জনসাধারণের বলিষ্ঠ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ; এই শ্রমজীবী জনগণ পরিকল্পনাগুলির বিশদীকরণে ও সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ব্যাপারে, অর্থাৎ লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি রূপায়ণে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায়, সমগ্র রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক যন্ত্রব্যবস্থাটাকে রূপান্তরিত করা হয় 'একটিমাত্র বিশাল যন্ত্রে, এক অর্থনৈতিক জীবদেহে, যা এমনভাবে কাজ করবে যাতে কোটি কোটি মানুষ একটিমাত্র পরিকল্পনার দ্বারা চালিত হতে সক্ষম হয়...'*। সেই সঙ্গে, বিরাট পরিসরে বিকশিত হয়

---

* V. I. Lenin, 'Extraordinary Seventh Congress

শ্রমজীবী জনগণের উদ্যোগ ও দুঃসাহসিক নবোদ্ভাবনা, যা পরিকল্পনাগুলির পূরণ ও অতিপূরণ নিশ্চিত করে।

উল্লেখ্য যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনায় উদ্যোগ ও নবোদ্ভাবনার অধিকতর সুযোগ উপস্থিত করে: পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালিত হয় প্রতিযোগিতা আর মজুরি-শ্রম শোষণ মারফৎ মুনাফা করার সংকীর্ণ পথ ধরে।

সুষমভাবে বিকাশমান এক সংগঠিত সমাজ হিসেবে, সমাজতন্ত্রের আছে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নিজস্ব পদ্ধতি। এখানে অর্থনৈতিক যন্ত্রব্যবস্থাটি সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম-নির্ধারিত একটিমাত্র লক্ষ্য-অর্জনের দিকে চালিত এবং তার কাঠামোটি সমানুপাতিক ও সুষম বিকাশের নিয়ম ও সমাজতন্ত্রের অন্যান্য অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী গঠিত। ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বাধিক ফল অর্জনে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সমাজের এক প্রত্যক্ষ স্বার্থ আছে বলে, সেটাই হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অকাট্য নিয়ম। অর্থনৈতিক যন্ত্রব্যবস্থাটির সমস্ত অঙ্গের, মুখ্যত অর্থনৈতিক হিসাবগণনের (খোজরাসচিয়োত)* উদ্দেশ্যও তাই, তা সামগ্রিকভাবে সমাজ আর জাতীয় অর্থনীতির

---

of the R.C.P.(B), March 6-8, 1918, Political Report of the Central Committee, March 7, *Collected Works,* Vol. 27, 1977, p. 90-91.

প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন অর্থনৈতিক একক, উদ্যোগ ও সমিতির মধ্যে পরস্পরসম্পর্কের ভিত্তি যোগায়।

বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে তার রূপ যত বিচিত্রই হোক না কেন, অর্থনৈতিক হিসাবগণনের প্রধান প্রধান নীতি নিম্নরূপ:

— অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে উদ্যোগটির স্বাধীনতা;

— উদ্যোগটির কাজকর্মের ব্যয় ও সুফলগুলির অর্থের হিসাবে বিশ্লেষণ; উদ্যোগটিকে মুনাফাদায়ক করার প্রয়োজনীয়তা;

— উদ্যোগটির অর্থনৈতিক কৃতিত্বের জন্য প্রতিটি কর্মিসংঘ ও মেহনতি ব্যক্তির বৈষয়িক প্রণোদনা দায়িত্ব;

— উদ্যোগটির কাজকর্মের উপরে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ।

মোটের উপরে, অর্থনৈতিক হিসাবগণন হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি, যা ব্যবহৃত হয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলি সফলভাবে অর্জন করার জন্য, উদ্যোগটির বৈষয়িক, আর্থিক ও শ্রম সম্পদের আরও যুক্তিসহ প্রয়োগের জন্য, এবং সেটির মুনাফাদায়ক কাজের জন্য।

অর্থনৈতিক হিসাবগণন অনুযায়ী, উদ্যোগটি তার হাতে ন্যস্ত উৎপাদন পরিসম্পদগুলি নিয়ে কাজ করে এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অনুযায়ী আগম সর্বাধিক বাড়াতে চেষ্টা করে। উৎপাদনকে যুক্তিসহ ধারায় সংগঠিত করার ব্যবস্থা সে গ্রহণ করে এবং তার হাতে ন্যস্ত সহায়সম্পদ নিয়ে কাজ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে বর্তমান পর্যায়ে উদ্যোগ ও সমিতিগুলির উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের

ব্যাপারে অধিকার প্রসারিত করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে, কেন্দ্রীয়ভাবে স্থিরীকৃত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য তাদের দায়িত্ব এবং তাদের শরিকদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী তাদের দায় বাড়ানো হচ্ছে। উদ্যোগের মুনাফা থেকে গঠিত অর্থনৈতিক প্রণোদনা তহবিলগুলি আরও বেশি করে ব্যবহৃত হচ্ছে কর্মিসংঘগুলিকে ও মেহনতি ব্যক্তিদের আরও বেশি বৈষয়িক প্রণোদনা যোগানোর জন্য। সোভিয়েত উদ্যোগগুলি ও সমিতিগুলি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তিনটি তহবিল: উৎপাদন বিকাশ, বৈষয়িক প্রণোদনা, এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও আবাসন তহবিল। লক্ষণীয় বিষয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিয়ন্ত্রণাধীনে ও অংশগ্রহণে কর্মিসংঘগুলির সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এই তহবিলগুলি ব্যবহার করা হয়।

একটি উদ্যোগকে যদি নিজের পথ প্রশস্ত করতে হয় এবং সমগ্র সমাজের জন্য ও তার নিজের কর্মিসংঘের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট সঞ্চয়ন সৃষ্টি করতে হয়, তা হলে তাকে মুনাফা করতে হবে।

একটিমাত্র পরিকল্পনার অধীনে বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য দরকার সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিসরে এক যথাযথ ব্যয় ও সুফল বিশ্লেষণ, যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্তব্যকর্মগুলির সফল রূপায়ণের জন্য সমস্ত উৎপাদনী সহায়সম্পদের সম্পূর্ণতম ও সবচেয়ে যুক্তিসহ ব্যবহারে সাহায্য করে।

সেটা করা হয় অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলির সাহায্যে,

যেগুলি সমাজতন্ত্রের পক্ষে সহজাত এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। এখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করে দামের ব্যবস্থা, যার মধ্যে আছে প্রস্তুত শিল্প সামগ্রীর রাষ্ট্রীয় দাম, খামারজাত পণ্যের সংগ্রহ দাম, এবং ভোগ্য পণ্য ও কৃত্যকসমূহের খুচরো দাম। এই সমস্ত দাম স্থির করা হয় কেন্দ্রীকৃতভাবে এবং উৎপাদন ব্যয় ও বিপণন ব্যয় উভয়কেই পুষিয়ে দেওয়ার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ন সৃষ্টি করার জন্য তা উদ্দিষ্ট। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সমস্ত দামের পাশাপাশি আছে সেই সব দাম, যেগুলি কিছুটা পরিমাণে নির্ভর করে যোগান ও চাহিদার মধ্যেকার পরস্পরসম্পর্কের উপরে, যেমন, নিজস্ব সহায়ক খামার থেকে উৎপাদ বিক্রয়ের জন্য তথাকথিত যৌথ-খামার বাজারের দাম।

সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলির ব্যবস্থাতন্ত্রের মধ্যে ক্রেডিট ও অন্যান্য ব্যাংকিং ক্রিয়া, খাজনা, উৎপাদনী সহায়সম্পদ ব্যবহারের জন্য উদ্যোগগুলির দ্বারা অর্থ-প্রদান, ইত্যাদিও পড়ে।

এরই ভিত্তিতে বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদরা এই সিদ্ধান্ত টানেন যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যেহেতু এই ধরনের অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করে, সেই হেতু পুঁজিবাদী, বা বাজার অর্থনীতি থেকে তার তফাৎ নাকি খুবই সামান্য। কিন্তু বিষয়টা এই নয় যে এই হাতিয়ারগুলিকে কী নামে অভিহিত করা হচ্ছে, বরং বিষয়টা এই যে সেগুলির সারমর্ম কী, সেগুলি কাদের সেবা করে, এবং অর্থনৈতিক জীবনে কী ভূমিকা পালন

করে। সমাজতন্ত্রে ব্যবহৃত অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পণ্য-অর্থ উপাদানগুলি থেকে, যা শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে অবশ্যম্ভাবীরূপেই দুঃখদুর্দশা ঘটায় এবং কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রই কখনও যা সামলাতে পারে না সেই বাজারের শাসন থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন — প্রকৃতিতে ও উদ্দেশ্যে, উভয়তই।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক যন্ত্রব্যবস্থাটি এক অতিকায় যন্ত্রের মতো, যার সমস্ত অংশকে ছন্দে-ছন্দে ও মসৃণভাবে কাজ করতে হবে। অবশ্য, যন্ত্রটি চালাতে সক্ষম হওয়া চাই এবং তার কাঠামো আর তার অংশগুলির মিথষ্ক্রিয়ার পিছনকার নীতিগুলি সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান থাকা চাই।

বিষয়গত অর্থনৈতিক নিয়মগুলি হৃদয়ঙ্গম করা এবং সেগুলির ব্যবহারের নীতিসমূহ নির্ণয় করার কাজটা শুধু বিজ্ঞানের সামনেই নয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কর্মপ্রয়োগেরও সামনে সমুপস্থিত, যে ব্যবস্থাপনার পরিচায়ক হল কোটি কোটি মানুষের ক্রিয়াকলাপ, কেননা সমাজতন্ত্রে এই ক্রিয়াকলাপই গঠন করে অর্থনীতির 'আচরণ প্রণালী'। কঠোর কেন্দ্রিকতা, এমন কি যখন তা 'অতি-বুদ্ধিমান' কম্পিউটারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তখনও, অর্থনীতির সুষম বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে না, যদি না জনসাধারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিচালনার কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়। জনগণ তাদের কাজে অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং সমগ্র সমাজের স্বার্থে ও

সমাজের প্রত্যেক সদস্যের স্বার্থে সেগুলিকে আরও বেশি মাত্রায় রূপায়িত করতে চেষ্টা করে।

চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ

চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রধানতম যে কাজটির মধ্যে অর্থনৈতিক বিকাশ ও জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর চাবিকাঠি রয়েছে, তা হল **শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি**। উৎপাদের একটি একক উৎপাদনে যত কম শ্রম ও স্বল্পতর উপায় ব্যবহৃত হয়, সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর সম্ভাবনা তত বাড়ে। এটা সকলের কাছেই রীতিমত পরিষ্কার, কিন্তু অসুবিধাটা হল শ্রম উৎপাদনশীলতায় প্রকৃত বৃদ্ধি অর্জনের উপায় খুঁজে বার করা।

সে দিক দিয়েও, পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতন্ত্র ব্যাপকতর সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রথমত, শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য সত্যিকার এক ব্যাপক দায়বোধ থাকে। তা প্রকাশ পায় সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতা অর্জন অভিযানে, জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান উদ্যোগের মধ্যে, তারাই তাদের কর্মস্থলে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য, প্রযুক্তি ও শ্রম সংগঠন ত্রুটিহীন করার জন্য উপায়ের সন্ধান করে। কোটি কোটি মানুষের সেই আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা প্রণালীর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শ্রমজীবী জনগণের জ্ঞান ও দক্ষতার দ্বারা বহুগুণবর্ধিত উদ্যোগই শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে

সহায়ক হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে এরূপ বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য প্রথমেই দরকার বৃহদায়তন শিল্পের বৈষয়িক ভিত্তি নিশ্চিত করা, উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত কৃতিত্বগুলি প্রবর্তন করা, শ্রমজীবী জনগণের সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্তর ও তাদের বিশেষ কৃৎকৌশলগত প্রশিক্ষণের মান বাড়ানো, শ্রম নিয়মানুবর্তিতা ও সংগঠন উন্নত করা এবং লোককে আরও ভালোভাবে ও আরও কর্মদক্ষভাবে কাজ করতে শেখানো।

বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতি হল শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিয়ামক বিষয়, বৈষয়িক ভিত্তি। যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধন হয় যন্ত্রের ক্ষমতা ও ক্রিয়ার দ্রুতি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে, এবং যেগুলি চালানোর জন্য যথেষ্ট কায়িক শ্রম নিয়োগ দরকার হয় সেই সমস্ত প্রথাগত যন্ত্র থেকে আধা-স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশল ও রোবটে উত্তরণের মধ্য দিয়ে। তাই, সমাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতির অর্থনৈতিক ফল-প্রভাব একটা বড় সামাজিক ফল-প্রভাব সৃষ্টি করে: নতুন প্রযুক্তি কাজের প্রকৃতিটারই পরিবর্তন ঘটায়, জোরটা ক্রমে ক্রমে সরে যায় কায়িক ক্রিয়া থেকে মানসিক ক্রিয়ার দিকে। শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সমাজকে কাজের সময় ক্রমে ক্রমে কমাতে এবং তার ফলে বিশ্রাম, শিক্ষা, খেলাধুলো, প্রভৃতির জন্য শ্রমজীবী জনগণের মুক্ত সময়ের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম করে তোলে, এ কথা বিবেচনা করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে এরূপ বৃদ্ধি মেহনতি

ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশের এক আবশ্যকীয় শর্ত।

সেই সঙ্গে, শ্রমজীবী জনগণের বেড়ে-চলা শিক্ষাগত স্তর, দক্ষতার মান ও সাধারণ সংস্কৃতি শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির এক কার্যকর উপাদান। আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত প্রগতি শুধু মালমশলা আর প্রযুক্তির উপরেই নয়, মুখ্যত যারা অতি পরিশীলিত যন্ত্রের বিকাশ ঘটায় ও সেগুলি চালায় তাদের উপরে চাহিদা বাড়ায় বলে তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, প্রত্যেক মেহনতি মানুষ এখন আরও বেশি পরিমাণ শ্রমের সাধিত্র ও উৎপাদনের উপায় নিয়ে কাজ করে, এবং সেগুলির আরও কার্যকর ব্যবহার শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে তার জ্ঞান, দক্ষতার মান, কর্মকুশলতার গুণগত উৎকর্ষ ও কাজের প্রতি সৃষ্টিশীল মনোভাবের উপরে।

শ্রম উৎপাদনশীলতা যত বেশি, দেশের অর্থনীতি তত শক্তিশালী এবং তার সামাজিক উৎপাদ তত বেশি হয়।

সামাজিক উৎপাদ

একটা নির্দিষ্ট কালপর্বে সমাজের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত মূল্য হল তার **সামাজিক উৎপাদ**। তা কীভাবে বণ্টিত হয়? প্রথমত, তার একটি অংশ ব্যবহৃত হয় উৎপাদনের পিছনে সমাজের খরচ প্রতিস্থাপিত করার জন্য: কাঁচামাল ও অন্যান্য মালমশলা ও জ্বালানির মূল্য; শ্রম

চলার মধ্য দিয়ে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা পুরো-তৈরি উৎপাদটিতে পাচারিত মূল্য, ইত্যাদি। **এই সমস্তই হল প্রতিস্থাপন তহবিল।** প্রতিস্থাপন তহবিলের মূল্য বাদ দেওয়ার পর সামাজিক উৎপাদের যে অংশটি অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় **জাতীয় আয়,** বা **নতুন সৃষ্ট মূল্য।** জাতীয় আয় দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমটি হল **সঞ্চয়ন তহবিল,** অর্থাৎ উৎপাদনের সম্প্রসারণের জন্য সমাজের বরাদ্দ করা সহায়-সম্পদ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রযুক্তিগুলি: বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, থিয়েটার, প্রভৃতি নির্মাণ ও সজ্জিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়-সম্পদও এই তহবিলের অন্তর্ভুক্ত। ভোগ তহবিল থেকে সংরক্ষিত ও বীমা তহবিলও তৈরি হয়। সমাজতন্ত্রে জাতীয় আয়ের অপর বড় ও ক্রমবর্ধমান অংশটি হল **ভোগ তহবিল।** সোভিয়েত ইউনিয়নে তা হল জাতীয় আয়ের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি। জাতীয় অর্থনীতির ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে কাজের জন্য পারিশ্রমিক-প্রদান হিসেবে, এবং বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাগত ও জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও ব্যবহৃত সহায়-সম্পদ এই তহবিলের অন্তর্ভুক্ত। এই তহবিল থেকে শিশুদের লালনপালন ও শিক্ষার জন্য, বৃদ্ধ, পঙ্গু ও কাজ করতে অক্ষম অন্যান্যদের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় মেটানো হয়। ভোগ তহবিলের একটি অংশ যায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও প্রতিরক্ষার জন্য। রাষ্ট্রীয় বাজেটের যে সমস্ত খাতের মধ্য দিয়ে জাতীয় আয়ের প্রধান অংশটি সঞ্চিত ও বণ্টিত হয়, তার মধ্যে প্রতিরক্ষা বাবদ বরাদ্দের স্থান

অপেক্ষাকৃত সামান্য এবং তার অংশটা মোটের উপরে স্থিতিশীল।

সমাজতন্ত্রে যে সমস্ত নীতি অনুসারে সামাজিক উৎপাদ ও জাতীয় আয় বণ্টিত হয়, তার এই রূপরেখা থেকেই দেখা যায় যে জনগণের জীবনমান উন্নত করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বরাদ্দ সহায়-সম্পদের পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদনের সামগ্রিক পরিমাণের উপরে তথা প্রতিস্থাপন ও সঞ্চয়ন তহবিল কতটা দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তার উপরে। সেই জন্যই সমগ্র সমাজ শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিতেই নয়, তার অধিকতর কর্মদক্ষতাতেও আগ্রহী। সেটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে, যখন উৎপাদনের সহায়সম্পদের আরও বৃহত্তর পরিমাণ তার মধ্যে আকৃষ্ট হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে মাথা-পিছু জাতীয় আয় বেড়েছে ১০·৬ গুণ, এবং প্রকৃত আয় বেড়েছে ৬ গুণ।

উৎপাদনের কর্মদক্ষতা বাড়ানো একটা বহুমুখী প্রক্রিয়া, যার প্রধান প্রধান অঙ্গ হল:

প্রথম, উৎপাদন প্রক্রিয়াসমূহের যন্ত্রীকরণ ও অটোমেশনের মধ্য দিয়ে এবং শ্রমজীবী জনগণের দক্ষতার মান উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অর্জিত উচ্চতর শ্রম উৎপাদনশীলতা।

দ্বিতীয়, আরও পরিশীলিত কৃৎকৌশল ও শ্রমের উন্নততর সংগঠনের মধ্য দিয়ে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের উন্নততর ব্যবহার।

তৃতীয়, প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি পর্যায়ে

প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধন ও উৎপাদের গুণগত মান উন্নয়নের মধ্য দিয়ে কাঁচামাল ও অন্যান্য মালমশলা ও জ্বালানির মিতব্যয়ী ব্যবহার।

এই সমস্ত অঙ্গ একত্র মিলেই গঠিত হয় উৎপাদনের নিবিড়করণের ধারণাটি, যা সমগ্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশে এক নতুন পর্যায় সূচিত করে।

উৎপাদনের নিবিড়করণ উন্নত সমাজতন্ত্রে ঠিক ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ, যতখানি গুরুত্বপূর্ণ নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপনের সময়ে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন। তা হল পুনরুৎপাদনের সারগতভাবে নতুন ও অত্যন্ত কার্যকর একটা ধরন।

নিবিড় ধরনের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সমাজতন্ত্রের এই অনস্বীকার্য সুফলের সুস্পষ্টতম প্রকাশ যে, উৎপাদনের উপায়কে যারা নিজেদের হাতে গ্রহণ করেছে এবং যারা তাদের অখণ্ড জাতীয় অর্থনীতিকে পরিকল্পিত ধারায় চালায়, সেই শ্রমজীবী জনগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকদের তুলনায় নিজেদের দেশের উন্নততর প্রভু। একটিমাত্র কর্মিসংঘ হিসেবে জনগণ প্রধান উৎপাদিকা শক্তির — খোদ মনুষ্যশ্রমের যুক্তিসহ ব্যবহারেই মুখ্যত আগ্রহী। তাদের শ্রমের ফলগুলির যাতে অপব্যয় না ঘটে এবং উৎপাদনে ও ভোগে সর্বাধিক মাত্রায় উশুল হয়, সেটাও তারা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে। এ কথা সত্যি, সমাজের সমস্ত সদস্যই সরাসরি তা বুঝতে শুরু করে না, অভিন্ন সম্পত্তিকে নিজেদের সম্পত্তি বলে গণ্য করার একই মনোভাব গড়ে ওঠার জন্য জনগণের পক্ষে বেশ দীর্ঘ এক ঐতিহাসিক

কালপর্ব দরকার হয়। কিন্তু এরূপ বোধ আসতে বাধ্য, এবং শ্রমজীবী জনগণের আরও ব্যাপক অংশ সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রতি, তাদের সহকর্মীদের প্রতি উচ্চ কর্তব্যবোধ গড়ে তুলছে।

এ সবই দেখায় যে সমাজতন্ত্র সারগতভাবে নতুন উৎপাদন-সম্পর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং তার ভিত্তিতেই তা বিকাশলাভ করে, এই উৎপাদন-সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনের অবাধ সুযোগ দেয়। সেই লক্ষ্য হল: জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্থিরনিশ্চিতভাবে বাড়ানো। এর মানে এই যে সমাজতন্ত্র মানবজাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির সত্যিকার সীমাহীন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে।

সমাজতন্ত্রের অর্থশাস্ত্র সেই পথ ধরে সফল অগ্রগমনের সত্যিকার দিকনির্দেশ দেয়।

এক নতুন ধরনের বিশ্ব অর্থনীতি

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ায়, ভূমণ্ডলে অভ্যুদয় হয়েছিল এক নতুন দুনিয়ার — সমাজতন্ত্রের দুনিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল অনেকগুলি ইউরোপীয় ও এশীয় দেশে, আর লাতিন আমেরিকায় সমাজতান্ত্রিক পথাবলম্বী প্রথম দেশ ছিল কিউবা। এই দেশগুলি গঠন করেছে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তার অর্থনৈতিক ভিত্তি হল **বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।**

১৯১৯ সালে, সোভিয়েত রাশিয়া যার প্রতিভূ ছিল,

সেই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ছিল পৃথিবীর ভূখণ্ডের ১৬ শতাংশ এবং জনসমষ্টির ৭·৮ শতাংশ, আর ১৯৮২ সালে সেই অঙ্কটা বেড়ে হয়েছিল যথাক্রমে ২৬·২ শতাংশ ও ৩২·৭ শতাংশ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এখন পৃথিবীর শিল্প উৎপাদের ৪০ শতাংশের বেশি উৎপন্ন করে। ১৯৫০ সালে সারা পৃথিবী যে শিল্প সামগ্রী উৎপন্ন করত সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন একাই তার চেয়ে বেশি করে।

এই গ্রহে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি। দুই ব্যবস্থার এই সহাবস্থান হল আমাদের কালে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের এক নতুন রূপ। কিন্তু বিপরীত দুই বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বা যুদ্ধ তাতে পূর্বানুমিত নয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিতুলনায়, সমাজতন্ত্র সেই সংগ্রামে অস্ত্র আস্ফালন করে না অথবা অস্ত্রবল ব্যবহারের হুমকি দেয় না, কেননা তার শক্তি নিহিত রয়েছে সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের মহান বিপ্লবী কর্মাদর্শের ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারের মধ্যে। বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদরা 'বিপ্লব রপ্তানির' অভিযোগ করে, যদিও তারা ভালো করেই জানে যে বিপ্লব রপ্তানি করা যায় না, বিপ্লব ঘটে ও জয়যুক্ত হয় একমাত্র তখনই যখন নির্দিষ্ট দেশের ভিতরে তার বিষয়গত ও বিষয়ীগত পূর্বশর্তগুলি গড়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নামে বিপ্লব রপ্তানির অভিযোগ করে নির্লজ্জতম

সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলি নিজেরাই প্রতিবিপ্লব রপ্তানির আশ্রয় নিয়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাস সেই মর্মে অজস্র দৃষ্টান্তে পূর্ণ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মনে করে যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। সেই প্রতিযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের অনস্বীকার্য সুবিধাগুলি প্রদর্শন করে এবং তাই পৃথিবীতে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ ধারার উপরে বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করে। কোটি কোটি মানুষ সমাজতন্ত্রকে দেখে মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রগতিশীল সমাজ হিসেবে, যা শ্রমজীবী জনসাধারণকে দেয় মুক্তি, প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, জ্ঞানলাভের ব্যাপক সুযোগ ও ভবিষ্যতে আস্থা। সমাজতন্ত্র জনগণের জীবনে শান্তি আনে, ন্যায়বিচারপূর্ণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং তা মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত জাতিগুলির এক নির্ভরযোগ্য দুর্গ।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অন্যতম প্রধান সুবিধা এই যে তা হল সত্যিকার সমানতা, পরস্পরের সাফল্যের জন্য উদ্বেগ, ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার দুনিয়া। আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বে দীর্ণ ও তার রাষ্ট্রগুলির অসাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, নিপীড়ন ও দাসত্ববন্ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী দুনিয়া থেকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে এটাই সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় অন্যান্য

দেশের উপরে কোনো কোনো দেশের শোষণের কোনো অবকাশ নেই, এবং প্রবলতর, শিল্পোন্নত দেশগুলি দুর্বলতর দেশগুলির উপরে একটা একপেশে অর্থনৈতিক কাঠামো চাপিয়ে দেয় না অথবা সেগুলিকে কৃষি বা কাঁচামাল যোগানদার উপাঙ্গে পরিণত করে না। বিপরীতপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরগুলিকে সমস্তরবিশিষ্ট করার নিয়মের অধীন, যা কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় একদা-পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে সর্বাত্মক ও নিঃস্বার্থ সহায়তাদানের মধ্য দিয়ে, যাতে তাদের অগ্রসর রাষ্ট্রগুলির স্তরে তুলে আনা যায়। সমস্ত দেশই আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাজনে সমান অংশ গ্রহণ করে, উৎপাদনের যে সমস্ত শাখার জন্য নির্দিষ্ট দেশটিতে অবস্থা সবচেয়ে অনুকূল সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের জাতীয় অর্থনীতিকে সর্বপ্রকারে বিকশিত করতে তা তাদের সক্ষম করে।

অভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে আরও বেশি অভিন্ন উপাদানের জন্ম দেয়। তাদের ক্রমে ক্রমে কাছাকাছি আসার সেই প্রক্রিয়াটি স্পষ্টতই একটি সমরূপতা। এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে, সেই সমরূপতা প্রকাশ পেয়েছে **আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংবদ্ধতার** বিকাশে। অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রসার ঘটানোর জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ সেই প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে। এটি একটি মুক্তদ্বার সংগঠন, পরিষদের লক্ষ্য ও নীতিসমূহ মানে এবং এই সমস্ত নীতির ভিত্তিতে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এমন যে কোনো দেশ এতে যোগ দিতে পারে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংবদ্ধতার নিহিতার্থ হল উৎপাদন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রধান প্রধান শাখায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে গভীর ও স্থায়ী যোগসূত্র। এর সঙ্গে জড়িত সম্মিলিত পরিকল্পিত ক্রিয়াকলাপ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠা, এবং অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত সহযোগিতার বহুবিধ রূপ ও পদ্ধতি। এই রূপগুলির একটি হল সম্মিলিতভাবে শিল্প প্রকল্পগুলি নির্মাণ করা, যা আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি গঠনের সূত্রপাত করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংবদ্ধতার সাফল্যগুলি সমাজতন্ত্রের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা-সম্ভাবনাগুলির, পুঁজিবাদের উপরে তার ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্বের নতুন ও প্রত্যয়জনক প্রমাণ যোগায়।

সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষসাধন ও কমিউনিজমে ক্রমান্বিত উত্তরণ

সমাজতন্ত্র এক গতিশীল ব্যবস্থা। তার মানে শুধু এই নয় যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্রুত ও স্থিরনিশ্চিত বিকাশ সংকট ও মন্দা থেকে মুক্ত, বরং তা এও বোঝায় যে তার বিকাশের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার, তার উৎপাদিকা শক্তিসমূহ ও উৎপাদন-সম্পর্কেরও,

নিয়ত গুণগত পুনর্নবায়ন জড়িত। এই ক্রমাগত উৎকর্ষসাধনই একটা প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, তার সৃষ্টিশীল ক্ষমতা-সম্ভাবনা ও সুবিধাগুলির চিহ্ন।

সমাজতন্ত্র হল কমিউনিস্ট গঠনরূপের **প্রথম ও নিম্নতর পর্ব**। তার বিকাশে তা কতকগুলি নিয়ম-শাসিত ও ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়। উত্তরণ কালের পর্যায়ে জনগণ নতুন সমাজের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি স্থাপনের কর্তব্য সম্পন্ন করে, জাতীয় পরিসরে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং শোষক শ্রেণীগুলিকে ও যে সমস্ত কারণে সেগুলির জন্ম হয় তা নিশ্চিহ্ন করে। এই সমস্ত কর্তব্যকর্ম সমাধা হয়ে গেলে পর বলা যায় যে সমাজতন্ত্র **প্রধানত** নির্মিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে, সহজাতভাবে সমাজতান্ত্রিক, সমষ্টিবাদী নীতির ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। এই সমস্ত কর্তব্যকর্ম রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রবেশ করে **উন্নত সমাজতন্ত্রের** এক ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী কালপর্বে। সেই পর্যায়ের প্রধান অন্তর্বস্তু হল সমাজতন্ত্রের আরও উৎকর্ষসাধন, কমিউনিজমের দিকে সমাজের ক্রমান্বিত অগ্রগমন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন রয়েছে এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক পর্যায়ের শুরুতে। সে-ই সর্বপ্রথম দেশ, যে এই উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের পর্যায়ে প্রবেশ করবে।

ইতিহাস দেখায় যে এই পর্যায়গুলিকে লাফ দিয়ে

পার হয়ে আসা যায় না, সত্যিকার কমিউনিস্ট সম্পর্ক একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের ঠিক পরেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না, কেননা তা হবে ইতিহাসের পরিবর্তনাতীত নিয়মের বিরোধী, এবং আবশ্যকীয় পর্যায়গুলি বাদ দিয়ে চলার, দৌড়ে এগিয়ে যাওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টাই নতুন সমাজ নির্মাণের ক্ষতি করতে বাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সামগ্রীর প্রাচুর্য ছাড়াই, কিংবা যে অবস্থায় মানব চৈতন্য তখনও এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছয় নি যখন কাজ সকলের জীবনের মুখ্য চাহিদা হয়ে ওঠে, সেই অবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন প্রবর্তন করার চেষ্টা করা বৃথা হবে। এরূপ প্রাচুর্যের জন্য অত্যন্ত কর্মদক্ষ বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করা দরকার এবং কাজের প্রতি এরূপ মনোভাব গড়ে তুলতে বহু বছরের কঠোর প্রচেষ্টা প্রয়োজন হবে।

আবশ্যকীয় ঐতিহাসিক পর্যায়গুলিকে বাদ দিয়ে চলা না-গেলেও, সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা যায় এবং অবশ্যই ত্বরান্বিত করতে হবে। এর জন্য সমস্ত শর্ত সমাজতন্ত্রের আছে। সমাজতন্ত্র প্রধানত নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর, তা তার নিজের ভিত্তিতেই বিকশিত হতে শুরু করে। তার মানে এই যে এমন কোনো শ্রেণী বা সামাজিক গোষ্ঠী থাকে না যারা সমাজপ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করবে, এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকলেরই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমাগত উৎকর্ষবিধানে স্বার্থ থাকে। এটা এও বোঝায় যে সমাজতন্ত্র নির্ভর করে এক অগ্রসর বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তির উপরে,

আধুনিক বহুক্ষেত্রবিশিষ্ট শিল্প ও বৃহদায়তন যন্ত্রীকৃত কৃষিকে কেন্দ্র করে গঠিত এক শক্তিশালী জাতীয়-অর্থনৈতিক সমাহারের উপরে। একটা নতুন ধরনের অতিসৌধ — সমগ্র জনগণের এক রাষ্ট্র, যা ব্যাপকতম, সুসংগততম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের, অকৃত্রিম জনগণের ক্ষমতার বিকাশকে নিশ্চিত করে — সুপ্রতিষ্ঠিত, পরিপক্ক সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের অনুষঙ্গী হয়, যে সম্পর্ক সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি।

এ সবই উৎপাদিকা শক্তিগুলির নিয়ত বিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের উৎকর্ষসাধনের অবস্থা সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লবের আধুনিকতম কৃতিত্বগুলির রূপায়ণ আধুনিক পর্যায়ের সমাজতন্ত্রের উৎপাদিকা শক্তিগুলিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটায়, দেখা দেয় উৎপাদনের জটিল যন্ত্রীকরণ ও অটোমেশন, কম্পিউটর ও রোবটের ব্যাপক ব্যবহার, ও নমনীয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন, যার ফলে নতুন নতুন উৎপাদ তৈরির দিকে দ্রুত ও দক্ষভাবে যাওয়া সম্ভব হয়। বিদ্যুৎশক্তি শিল্পে পারমাণবিক শক্তি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে বিরাট পরিসরে, এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পাওয়ার গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত দেশব্যাপী এক বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রিড গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। রাসায়নিক শিল্প ও জীবপ্রযুক্তি আরও বিকশিত করা হবে। এ সবের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এক বাস্তব কৃৎকৌশলগত বিপ্লব ঘটবে, উৎপাদিকা শক্তিগুলি গুণগতভাবে এক নতুন পর্যায়ে

উন্নীত হবে, এবং শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

শ্রমের সাধিত্রগুলিতে এই ধরনের সব বুনিয়াদি পরিবর্তনের পাশাপাশি ঘটবে সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তি — স্বয়ং শ্রমজীবী ব্যক্তিমানুষের উৎকর্ষসাধন। পরিশীলিত যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক কার্যকলাপের অংশটা বেড়ে যাবে বলে তার কাজের প্রকৃতিটাই বদলে যাবে। কাজকে তা করে তুলবে আরও আকর্ষক, তাকে পূর্ণ করবে সৃষ্টিশীল অন্তর্বস্তু দিয়ে, এবং সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে সক্ষম করে তুলবে আরও পূর্ণতর মাত্রায় নিজের সামর্থ্য প্রদর্শন করতে।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের সেই সামাজিক দিকটিই উৎপাদনকর্মে সংশ্লিষ্ট মানুষের মধ্যে সম্পর্কের বিজ্ঞান হিসেবে অর্থশাস্ত্রের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। স্পষ্টতই, সামাজিক উৎপাদনের প্রত্যেক শাখায় শ্রমের পরিবর্তমান প্রকৃতি সমাজতন্ত্রের উৎপাদন-সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে এবং অখন্ড ও পরিকল্পিত সামাজিক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে জনগণকে সংহত করবে।

সমাজতন্ত্রের খোদ ভিত্তিতেই -- উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানাতেও সারগত সব পরিবর্তন ঘটবে। ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত তার দুটি রূপ — রাষ্ট্রীয় (সমগ্র জনগণের) ও সমবায়িক (যৌথ খামার) -- শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি আসবে এবং তার পর একত্রে মিশে গিয়ে সমগ্র জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হবে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে সম্পত্তি-মালিকানার একটি রূপ অপরটিকে আত্মস্থ করে নেবে। কার্যক্ষেত্রে,

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি-মালিকানার উৎকর্ষসাধন ও সমবায়িক সম্পত্তি-মালিকানার অধিকতর সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে তারা কাছাকাছি আসছে। বিরাট বিরাট সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগ হিসেবে, যৌথ খামারগুলি সম্মিলিত চাষ-আবাদ ও গবাদি পশুপালন ইউনিট, নির্মাণ সংগঠন, প্রভৃতি তৈরি করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা ও সহায়-সম্পদকে একত্র করছে। রাষ্ট্রীয় কৃষি উদ্যোগগুলির সঙ্গে স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতাতেও তারা প্রবৃত্ত হয়। খামারজাত পণ্যের উৎপাদন, শিল্পগত প্রক্রিয়ণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের ব্যবস্থা করে যে কৃষি-শিল্প সহযোগ, তাও গতিবেগ সঞ্চয় করছে। এসবই সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার দুটি রূপকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে সাহায্য করে। সেটাই বিরাট সামাজিক-রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন, কেননা সম্পত্তি-মালিকানার একটি রূপ গঠন ক্রমে ক্রমে সম্ভব করে তুলবে শ্রমিক শ্রেণী, যৌথ খামারি আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার শ্রেণীগত প্রভেদ কাটিয়ে উঠতে এবং সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক কাঠামোর ভিতরে সারগতভাবে এক শ্রেণীহীন সামাজিক ইমারত গঠন করতে।

তাই, বিপরীত শ্রেণীসমূহে (শোষক ও শোষিত) সমাজের বিভাজন প্রথমে দূর করে এবং যে ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনগণের দুটি বন্ধুভাবাপন্ন শ্রেণী ঘনিষ্ঠ ঐক্যের মধ্যে থাকে ও বিকশিত হয় এমন এক ব্যবস্থা সৃষ্টি করার পর, সোভিয়েত জনগণ এখন আরেকটি দৃঢ় পদক্ষেপ করছে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের চূড়ান্ত লক্ষ্য, এক কমিউনিস্ট সমাজের দিকে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান কখনোই ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজকে প্রতিটি অনুপুঙ্খে চিত্রিত করার চেষ্টা করে নি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতারা তার বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণগুলির রূপরেখা বর্ণনা করেছিলেন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে। তাঁদের দূরদৃষ্টি, তাঁদের বিশ্লেষণের অসাধারণ যথাযথতা সত্যিই বিস্ময়কর। স্ফটিকখণ্ডের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ বলা অথবা গণৎকারদের উদ্ভাবনের সঙ্গে সেই বিশ্লেষণের কোনো সম্পর্ক নেই, জীবন তা খুব ভালোভাবেই দেখিয়েছে। কমিউনিজম আর তার প্রথম ও নিম্নতর পর্ব সমাজতন্ত্রের মাঝখানে কোনো দুর্ভেদ্য দেয়াল নেই।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের গোড়ার দিনগুলিতেই লেনিন কমিউনিজমের বীজ দেখতে পেয়েছিলেন এক আপাত সরল, দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে, যখন একটি লোকোমোটিভ শেডের শ্রমিকরা একটা বিশ্রামের দিনে কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই একটি রেলইঞ্জিন মেরামত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বসন্তের সেই দিনটিতে তাদের কাজকে লেনিন অভিহিত করেছিলেন 'মহৎ সূচনা' বলে, এবং তিনি ঠিকই বলেছিলেন: তা উদ্ভব ঘটিয়েছিল এক আন্দোলনের, যা সমাজতান্ত্রিক জীবনযাপন-প্রণালীর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে এবং যা সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতা অর্জন অভিযান নামে পরিচিত। গত ছয় দশকে, কোটি

কোটি মেহনতি মানুষ সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। তার রূপগুলি পরিবর্তিত হতে পারে এবং তাতে অংশগ্রাহীরা আরও নতুন নতুন উদ্যোগ দেখাতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা সব সময়ে একই: উচ্চ চেতনা, আত্মত্যাগমূলক শ্রম, এবং সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ উদ্বেগ। ব্যক্তিমানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হিসেবে, সামাজিক সমৃদ্ধির অফুরন্ত উৎস হিসেবে কাজের প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাবের এগুলিই হল লক্ষণ।

কমিউনিজম নির্মিত হচ্ছে অধ্যবসায়পূর্ণ মনুষ্যশ্রম দিয়ে, কেননা প্রতিটি ব্যক্তির যে উপকার তা করবে সেটা অত্যাশ্চর্য স্বর্গীয় আশীর্বাদের মতো আকাশ থেকে পড়তে পারে না।

যে সমাজে, মার্কসের কথায়, সমবায়িক সম্পদের সমস্ত উৎস আরও প্রাচুর্যের সঙ্গে প্রবাহিত হবে, যেখানে শ্রম হয়ে উঠবে 'শুধু জীবনের উপায় নয় বরং জীবনের মুখ্য চাহিদা', এবং যেখানে 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী' নীতিটি জয়যুক্ত হবে এমন এক সমাজ, মুক্তি ও সমানতার এক সমাজ, সুসমঞ্জসভাবে বিকশিত ব্যক্তিমানুষদের এক সংগঠিত সমিতি — এটাই হবে ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট সমাজ, মানবসভ্যতার চরম কৃতিত্ব।

শ্রমজীবী জনগণের, গমগ্র মানবজাতির সুখের জন্য যারা এক অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, শান্তি ও প্রগতির সেই সমস্ত শক্তির এটাই মহত্তম লক্ষ্য।

অতি-উৎপাদনের অর্থনৈতিক সংকট — পুঁজিবাদী চক্রের এক অবশ্যম্ভাবী পর্ব, যার বৈশিষ্ট্য হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমস্ত দ্বন্দ্ব উদ্‌গত হওয়া, পণ্যসামগ্রীর অতি-উৎপাদন, বিপণন সংক্রান্ত সমস্যাগুলির জটিলতা বৃদ্ধি, দ্রুত সংকুচিত উৎপাদন, ক্রমবর্ধমান বেকারি ও শ্রমজীবী জনসাধারণের অবস্থার অবনতি।

অতিসৌধ — অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও তার সঙ্গে মানানসই সমস্ত ভাবাদর্শগত অভিমত ও সম্পর্ক (রাজনীতি, আইন, নীতিবিদ্যা, ধর্ম, দর্শন, শিল্পকলা), এবং তদনুষঙ্গী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানও (রাষ্ট্র, পার্টি, গীর্জা, প্রভৃতি)।

অর্থ — একটি বিশেষ পণ্য, যা পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে এক বিশ্বজনীন তুল্যমূল্য হিসেবে কাজ করে।

অর্থনীতি — ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত উৎপাদন-সম্পর্কের সামগ্রিকতা, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি; বিভিন্ন শাখা ও উৎপাদনের ধারা সহ একটি দেশের অর্থনীতি।

অর্থনৈতিক নিয়মগুলি — অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও ব্যাপারসমূহে সবচেয়ে অপরিহার্য ও স্থায়ী বিষয়গত পরস্পরসম্পর্ক ও কার্যকারণ সম্পর্ক।

অর্থনৈতিক পরীক্ষানিরীক্ষা — পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর কার্যকরতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চালানো পরীক্ষানিরীক্ষা বা পাইলট প্রকল্প।

অর্থনৈতিক বর্গসমূহ — মানুষে মানুষে প্রকৃতই বিদ্যমান সামাজিক-উৎপাদন সম্পর্কের এক তত্ত্বগত প্রকাশ।

অর্থনৈতিক ভিত্তি — সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থাৎ, ঐতিহাসিক বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে উৎপাদন-সম্পর্কের সামগ্রিকতা।

অর্থনৈতিক হিসাবগণন (খোজরাসচিয়োত) — সমাজতন্ত্রে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি; তার ভিত্তি হল যাদের আগম দিয়ে নিজেদের

ব্যয় পোষাতে হবে সেই উদ্যোগ ও সমিতিগুলির ক্রিয়াকলাপ ও উপকারের অর্থ-আকারে বিশ্লেষণ করা, এবং কর্মিসংঘগুলির বৈষয়িক প্রণোদনা ও বৈষয়িক দায়িত্ব।

অস্থির পুঁজি — পুঁজির যে অংশটি শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যা তার পরিমাণ বদলায়।

আদিম-সম্প্রদায়গত উৎপাদন-প্রণালী — ইতিহাসের প্রথম উৎপাদন-প্রণালী, যার ভিত্তি ছিল আদিম উৎপাদনের উপায় ও যৌথ শ্রমের উৎপাদের উপরে পৃথক পৃথক কমিউনের যৌথ মালিকানা, এবং এই উৎপাদগুলির বণ্টন ছিল সমতাবাদী।

আবশ্যকীয় উৎপাদ — বৈষয়িক উৎপাদনে একজন শ্রমিকের সৃষ্ট উৎপাদের অংশ, যা সেই নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় তার স্বাভাবিক অস্তিত্ব ও পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায়ের সমষ্টি।

আবশ্যকীয় শ্রম — বৈষয়িক উৎপাদনে আবশ্যকীয় উৎপাদ করতে শ্রমিকদের ব্যয়িত শ্রম, সেই উৎপাদটি তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ ও শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের কাজে লাগে।

উৎপাদন — যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লোকে সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক মূল্য সৃষ্টি করে, মানুষের জীবনের ভিত্তি।

উৎপাদন-প্রণালী — ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত জীবনধারণের উপায় লাভের প্রণালী, বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে উৎপাদিকা শক্তিসমূহ ও তদনুষঙ্গী উৎপাদন-সম্পর্কের ঐক্য।

উৎপাদন-সম্পর্ক — বৈষয়িক মূল্যের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা মানুষে-মানুষে সামাজিক সম্পর্ক।

উৎপাদনের উপায় — বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে মানুষের ব্যবহৃত শ্রমের সমস্ত সাধিত্র ও বিষয়বস্তু।

উৎপাদনের দাম — পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে একটি পণ্যের দাম যা উৎপাদনের ব্যয় যোগ গড় মুনাফার সমান।

উৎপাদনের নৈরাজ্য — ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকানাভিত্তিক পণ্য অর্থনীতিতে পরিকল্পনার অভাব ও বিশৃঙ্খলা, যা প্রতিযোগিতা ও অর্থনৈতিক নিয়মগুলির এলোমেলো ক্রিয়ার দ্বারা চিহ্নিত।

উৎপাদিকা শক্তিসমূহ — উৎপাদনের উপায় (শ্রমের সাধিত্র ও শ্রম প্রয়োগের বিষয়বস্তু) এবং উৎপাদনের

উপায়কে যারা চালু করে, সেই জ্ঞান, উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ও শ্রমদক্ষতাবিশিষ্ট মানুষ।

উদ্বৃত্ত-উৎপাদ — আবশ্যকীয় উৎপাদের অতিরিক্ত, প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের শ্রমে সৃষ্ট সর্বমোট সামাজিক উৎপাদের অংশ।

উদ্বৃত্ত-মূল্য — পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর মূল্যের যে অংশটি মজুরি-শ্রমিকদের দাম না দেওয়া শ্রমে সৃষ্ট হয় তাদের শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত এবং পুঁজিপতিরা যা বিনা ক্ষতিপূরণে উপযোজন করে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য, অতিরিক্ত — একজন একক পুঁজিপতির উদ্যোগে উৎপন্ন একটি পণ্যের একক মূল্য সেই পণ্যটির সামাজিক মূল্যের চেয়ে যখন কম হয়, তখন সেই পুঁজিপতির উপযোজিত বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য।

উদ্বৃত্ত-মূল্য, অনাপেক্ষিক — পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ নিবিড় করার পদ্ধতি হিসেবে কর্ম-দিবস দীর্ঘ করে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য।

উদ্বৃত্ত-মূল্য, আপেক্ষিক — পুঁজিপতির দ্বারা মজুরি-শ্রম শোষণ নিবিড় করার অন্যতম পদ্ধতি, আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমানো ও তদনুযায়ী উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে পাওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার — অস্থির পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত, যা শ্রমশক্তি শোষণের মাত্রা দেখায়।

একচেটিয়া দাম — বাজার দামের একটি রূপ, উৎপাদন ও বিপণনে একচেটিয়া আধিপত্যের দরুন যা মূল্য ও উৎপাদনের দাম থেকে আলাদা হয়ে যায়, এবং একচেটিয়া মুনাফা দেয়।

একচেটিয়া সংস্থা, পুঁজিবাদী — পুঁজিপতিদের এক পরিমেল বা মৈত্রীজোট, যা একচেটিয়া মুনাফা আদায় করার জন্য উৎপাদন ও বিপণনের বেশ বড় একটা অংশের উপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল একচেটিয়া আধিপত্য।

কমিউনিজম — উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানাভিত্তিক কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের উচ্চতর পর্ব; যে সমাজের প্রধান লক্ষ্য হল প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন।

কমিউনিস্ট উৎপাদন-প্রণালী — উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানাভিত্তিক ও সমগ্র সমাজের স্বার্থে সুষম বিকাশভিত্তিক বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনের এক প্রণালী।

কৃষির যৌথীকরণ — ক্ষুদ্র ও খণ্ডবিক্ষিপ্ত একক

খামারগুলির বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক যৌথ খামারে স্বতঃপ্রণোদিত একীকরণের মধ্য দিয়ে কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর।

ক্লাসিকাল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র — বুর্জোয়া অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশে এক প্রগতিশীল ধারা, পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালী যখন উদীয়মান ছিল এবং যখন পর্যন্ত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম অবিকশিত ছিল, সেই সময়ে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

কর্ম-দিবস — দিবসের যে অংশে মেহনতি ব্যক্তিমানুষ একটি উদ্যোগে বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে।

গঠনরূপ, সামাজিক-অর্থনৈতিক — এক ঐতিহাসিক ধরনের সমাজ, যা বিকশিত হয় এক নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রণালীর ভিত্তিতে; তার সংশ্লিষ্ট অতিসৌধ সমেত ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত এক উৎপাদন-প্রণালী।

জমির খাজনা — কৃষিতে সাক্ষাৎ উৎপাদকের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একটি অংশ, জমির মালিকের দ্বারা তা উপযোজিত হয়।

জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি — পুঁজিবাদী উদ্যোগের প্রধানতম রূপ, যে কোম্পানির পুঁজি গঠিত হয় সংভার ও শেয়ার বিক্রয় মারফৎ।

জাতীয় আয় — একটি নির্দিষ্ট দেশের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন সৃষ্ট মূল্য; সর্বমোট সামাজিক উৎপাদের মূল্যের সেই অংশ, যেটি এক নির্দিষ্ট কালপর্বে (এক বছরে) ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়ের মূল্য বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে।

জাতীয়করণ, সমাজতান্ত্রিক — প্রলেতারীয় রাষ্ট্র কর্তৃক শোষক শ্রেণীগুলিকে উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে বৈপ্লবিকভাবে দখলচ্যুত করা এবং সেগুলিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

দাম — মূল্যের এক অর্থ-মুদ্রাগত প্রকাশ।

দাস-মালিক উৎপাদন-প্রণালী — মানুষের উপরে মানুষের শোষণের ভিত্তিতে ইতিহাসের প্রথম সামাজিক উৎপাদন-প্রণালী, যেখানে উৎপাদনের উপায় আর স্বয়ং মজুর (দাস) হল দাসমালিকের সম্পত্তি।

ধনকুবেরতন্ত্র — একদল ফিনান্স পুঁজির মালিক, সমাজে যাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে।

নয়া-উপনিবেশবাদ — অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে-থাকা দেশগুলির জাতিসমূহের উপরে শোষণ ও নিপীড়ন চালানোর উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির এক কর্মনীতি। পুঁজি রপ্তানির রূপে অর্থনৈতিক

সম্প্রসারণকে রাজনৈতিক ও সামরিক চাপের সঙ্গে প্রায়শই একত্রে মেলানো হয়।

পণ্য — বিক্রয়ের জন্য উদ্দিষ্ট একটি উৎপাদ।

পুঁজি — যে মূল্য মজুরি-শ্রম শোষণের ফল হিসেবে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে।

পুঁজি রপ্তানি — বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগ, যা একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক এবং যার উদ্দেশ্য হল একচেটিয়া মুনাফা আদায় করা এবং বিদেশী বাজারগুলির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্রটিকে সম্প্রসারিত করার জন্য সংগ্রামে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানগুলি সুদৃঢ় করা।

পুঁজিবাদী চক্র — পর পর সংযুক্ত পর্বগুলির মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনের গতি: সংকট, মন্দা, আরোগ্য ও তেজীভাব। সংকট হল চক্রটির প্রধান পর্ব, একটি চক্রের শেষ ও পরের চক্রটির শুরু।

পুঁজিবাদে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় — কর্ম-দিবসের যে অংশে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্য পুনরুৎপাদন করে।

পুঁজিবাদে ব্যাংক — পুঁজিবাদী ক্রেডিট ও অর্থ-যোগান উদ্যোগ, যেগুলি ঋণদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে মধ্যগ হিসেবে কাজ করে, অর্থ-পুঁজি নিয়ে কারবার

করে এবং মুনাফা বার করে নেয়, যে মুনাফা শ্রমিকদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ।

পুঁজিবাদে মজুরি — শ্রমশক্তি পণ্যটির মূল্য ও দামের এক পরিবর্তিত রূপ, যা উপরে-উপরে শ্রমের জন্য মূল্য-প্রদান বলে প্রতিভাত হয়।

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট — অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত জীবনের সমস্ত দিক সমেত সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের অবস্থা। পুঁজিবাদের যে সাধারণ সংকট শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ও ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের জয়ের ফলে, তার প্রধান চিহ্ন হল দুটি বিপরীত সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় — সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী — পৃথিবীর বিভাজন এবং তাদের মধ্যে সংগ্রাম।

পুঁজির সঞ্চয়ন — পুঁজিবাদী সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুঁজিতে পরিবর্তন।

পুনরুৎপাদন — সামাজিক উৎপাদ, উৎপাদন-সম্পর্ক ও শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন সমেত নিরবচ্ছিন্ন পুনর্নবায়নের দিক থেকে দেখা সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়া।

পেটি-বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র — অর্থশাস্ত্রের একটি ধারা, যাতে পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যবর্তী শ্রেণী, পেটি বুর্জোয়ার ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়।

প্রতিযোগিতা, পুঁজিবাদী — সর্বাধিক মুনাফার জন্য পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিপণনের বৃহত্তর অংশটি পাওয়ার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিদের মধ্যে বা তাদের পরিমেলগুলির মধ্যে সংগ্রাম।

প্রলেতারিয়েত — মজুরি-শ্রমিকদের একটি শ্রেণী, যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত, যারা নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে বেঁচে থাকে, এবং যারা পুঁজির দ্বারা শোষিত হয়; বুর্জোয়া সমাজের অন্যতম প্রধান শ্রেণী, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে ঐতিহাসিক উত্তরণের প্রধান বিপ্লবী চালিকা শক্তি।

প্রলেতারিয়েতের অবস্থার অনাপেক্ষিক অবনতি — পুঁজিবাদে প্রলেতারিয়েতের জীবনমান নিম্নমুখী হওয়া, পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়মের ও পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়মের ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফল। এর অর্থ হল আবাসন, আহার্য, ইত্যাদি সহ প্রলেতারিয়েতের জীবনের ও কাজের অবস্থা আরও খারাপ হওয়া।

প্রলেতারিয়েতের অবস্থার আপেক্ষিক অবনতি — বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সম্পদের তুলনায় শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার অবনতি, জাতীয় আয়ে, জাতীয়

সম্পদে তার অংশ হ্রাস এবং সেই সঙ্গে শোষক শ্রেণীগুলির অংশে ততটা বৃদ্ধি।

ফিজিওক্র্যাট — ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রবিদরা, অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তুকে যাঁরা সঞ্চলনের ক্ষেত্র থেকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করেছিলেন, এবং যাঁরা পুঁজিবাদে সামাজিক উৎপাদের পুনরুৎপাদন ও বণ্টনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ শুরু করেছিলেন।

ফিনান্স পুঁজি — শিল্প ও ব্যাংকিং একচেটিয়া সংস্থাগুলির একত্রীভূত পুঁজি।

বণ্টন — সামাজিক উৎপাদের পুনরুৎপাদনের একটি পর্ব, যা উৎপাদন ও ভোগকে যুক্ত করে; উৎপাদন-সম্পর্কের অন্যতম দিক।

বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্তনের পদ্ধতি — বস্তু বা ব্যাপারের অন্তরতম অন্তঃসার উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে অবধারণার প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক চেহারা ও অকিঞ্চিৎকর উপাদানগুলি থেকে মনোযোগ সরিয়ে আনা।

বিনিময় — সামাজিক শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ক্রিয়াকলাপের বা শ্রমের উৎপাদের বিনিময়; সামাজিক পুনরুৎপাদনের একটি পর্ব, যা উৎপাদন ও

বণ্টনকে ভোগের সঙ্গে যুক্ত করে; উৎপাদন-সম্পর্কের অন্যতম দিক।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — সর্বাত্মক অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাজন, এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বাজারের দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে যুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমস্ত জাতীয় অর্থনীতি।

বুর্জোয়া শ্রেণী — পুঁজিবাদী সমাজের শাসক শ্রেণী, উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক, সেগুলিকে তারা মজুরি-শ্রম শোষণের জন্য ব্যবহার করে।

বেকারি — পুঁজিবাদে এক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার, সেখানে সক্ষমদেহী জনসমষ্টির একাংশ চাকরি থেকে ও জীবনধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত হয় এবং শ্রমের এক সংরক্ষিত বাহিনীতে পরিণত হয়।

ব্যবহার-মূল্য — একটি জিনিসের উপযোগিতা, হয় ভোগের সামগ্রী হিসেবে, না হয় উৎপাদনের উপায় হিসেবে প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা।

ভোগ — মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বৈষয়িক মূল্যগুলির ব্যবহার; পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্ব ও উৎপাদন-সম্পর্কের অন্যতম দিক।

মজুরি-শ্রম— পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে সেই সব শ্রমিকের শ্রম, যারা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত, নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য, এবং শোষণের অধীন।

মানুষের উপরে মানুষের শোষণ — যে অবস্থায় সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত-শ্রমে সৃষ্ট এবং কখনও তাদের আবশ্যকীয় শ্রমের একটি অংশ দিয়েও সৃষ্ট উৎপাদগুলি কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই উপযোজিত হয় সেই শ্রেণীটির দ্বারা, যে উৎপাদনের উপায়ের মালিক।

মার্কেণ্টাইলিজম — পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের কালপর্বে (১৫শ-১৮শ শতাব্দী) বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মনীতিতে একটি মতধারা।

মুদ্রাস্ফীতি — পুঁজিবাদে অর্থের এক অবচয়, যার প্রকাশ ঘটে দাম বাড়ার মধ্যে, এবং যার ফলে শাসক শ্রেণীর অনুকূলে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটে।

মুনাফা, পুঁজিবাদী — পুঁজি বিনিয়োগের উপরে একটা অতিরিক্ত হিসেবে প্রতীয়মান উদ্বৃত্ত-মূল্যের এক পরিবর্তিত রূপ, পুঁজিপতিরা যা বিনা ক্ষতিপূরণে উপযোজন করে।

মুনাফা, বাণিজ্যিক — পুঁজিবাদী উৎপাদনের

প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুনর্বণ্টনের ফল হিসেবে বাণিজ্যিক পুঁজিপতিদের পাওয়া মুনাফা।

মুনাফার গড় (সাধারণ) হার — অঙ্গীয় গঠনবিন্যাসের প্রভেদগুলিকে গণ্য না করে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় বিনিয়োজিত সমান পরিমাণের পুঁজির উপরে সমান মুনাফা।

মুনাফার হার — সমগ্র আগাম দেওয়া পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত, যা একটি পুঁজিবাদী উদ্যোগের মুনাফাদায়কতা দেখায়।

মূল্য — একটি পণ্যের মধ্যে অঙ্গীভূত পণ্য উৎপাদকদের সামাজিক শ্রম, যা সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রেই অভিন্ন এবং বিনিময় কালে সেগুলিকে প্রমেয় করে তুলে পণ্যসামগ্রীর ভিত্তি হিসেবে যা কাজ করে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ — বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও একচেটিয়া পুঁজির একাঙ্গীভবন, একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তার মুনাফা বাড়ানোর জন্য, বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে দমন করার জন্য, দেশজয়ের যুদ্ধ বাধাবার জন্য, এবং শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

শিল্পায়ন, সমাজতান্ত্রিক — বৃহদায়তন শিল্প গঠন,

বিশেষত যে সমস্ত শাখা উৎপাদনের উপায় উৎপন্ন করে এবং সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি গড়া সম্ভব করে তোলে।

শ্রম — মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে পরিবর্তিত ও অভিযোজিত করার লক্ষ্য নিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ মানবিক ক্রিয়াকলাপ।

শ্রম, অতীত — বৈষয়িক মূল্যগুলিতে: উৎপাদনের উপায় ও ভোগের সামগ্রীতে অঙ্গীভূত শ্রম।

শ্রম, জীবন্ত — সচেতন ও উদ্দেশ্যপূর্ণ মানবিক ক্রিয়াকলাপ, একটি ব্যবহার মূল্য বা উপযোগী ফল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানসিক ও কায়িক শক্তির ব্যয়।

শ্রম, বিমূর্ত — যে শ্রম একটি পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে, যা সাধারণভাবে মানবিক শ্রমশক্তির ব্যয়, তাতে সেই ব্যয়ের মূর্ত রূপটি গণ্য করা হয় না এবং যা সমস্ত পণ্য উৎপাদকের পরস্পরসম্পর্ক প্রকাশ করে।

শ্রম, মূর্ত — বিশেষভাবে উপযোগী রূপে ব্যয়িত শ্রম, এক নির্দিষ্ট ধরনের উপযোগী শ্রম, যা একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে।

শ্রম প্রয়োগের বিষয়বস্তু — একটি জিনিস বা

একপ্রস্ত জিনিস, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় লোকে যার উপরে কাজ করে।

শ্রমশক্তি — মানুষের কাজ করার ক্ষমতা, বৈষয়িক মূল্য উৎপাদনে ব্যবহৃত তার শারীরিক ও আত্মিক সামর্থ্যের সামগ্রিকতা।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা — শ্রম-সময়ের একটি এককে সৃষ্ট ব্যবহার-মূল্যের পরিমাণ দিয়ে, অথবা উৎপাদের একক-পিছু ব্যয়িত শ্রম-সময়ের পরিমাণ দিয়ে পরিমাপ করা মূর্ত শ্রমের ফলপ্রসূতা, কার্যকরতা।

শ্রমের সহযোগ — একই শ্রম-প্রক্রিয়ার অথবা বিভিন্ন অথচ পরস্পরসম্পর্কিত শ্রম ক্রিয়ায় বহু লোকের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপ।

শ্রমের সাধিত্র — উৎপাদনের উপায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, শ্রমের বিষয়বস্তুগুলির উপরে কাজ করার জন্য মানুষ যে জিনিসগুলি ব্যবহার করে।

শ্রেণীসমূহ, সামাজিক — মানুষের বড় বড় গোষ্ঠী, যারা পরস্পর থেকে পৃথক সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট এক ব্যবস্থায় তাদের স্থানের দিক দিয়ে, উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের (অধিকাংশই আইনে বিধিবদ্ধ) দিক দিয়ে, তাদের সামাজিক সংগঠনে ভূমিকা, এবং ফলত, তাদের হাতে সামাজিক সম্পদের অংশ, এবং কীভাবে তারা সেটা

পায়, সেই দিক দিয়ে। শ্রেণীসমূহের মধ্যে প্রধান প্রভেদটা রয়েছে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মধ্যে।

সমাজতন্ত্র — কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপের প্রথম, বা নিম্নতর, পর্ব।

সমাজতন্ত্রে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় — যে সময়ে মেহনতি ব্যক্তিমানুষ উৎপন্ন করে সামাজিক উৎপাদের সেই অংশটি, যে অংশটি তার প্রাণশক্তি ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে এবং তার শারীরিক ও আত্মিক সামর্থ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করে।

সমাজতন্ত্রে ব্যাংক — যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সুষমভাবে অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা করে এবং উদ্যোগগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপরে হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে ক্রেডিট, পরিশোধ ও নগদ মুদ্রার ক্রিয়ার সাহায্যে।

সমাজতন্ত্রে মজুরি — সমগ্র জনগণের উদ্যোগগুলিতে সৃষ্ট আবশ্যকীয় উৎপাদের প্রধান অংশটির অর্থ-মুদ্রাগত অভিব্যক্তি, সামাজিক উৎপাদনে তাদের শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী শ্রমজীবী জনগণের ব্যক্তিগত ভোগে তা ব্যয়িত হয়।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি — উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার

ভিত্তিতে পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন যন্ত্রপ্রধান উৎপাদন।

সমাজতান্ত্রিক সমকক্ষতা অর্জন — শ্রমজীবী জনসাধারণের আরও বেশি সৃষ্টিশীল উদ্যোগ এবং সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধিতে সমগ্র জনগণের স্বার্থ সম্বন্ধে তাদের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার মধ্য দিয়ে শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ও সামাজিক উৎপাদনের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর একটি পদ্ধতি।

সম্পত্তি-মালিকানা — বৈষয়িক মূল্যের, মুখ্যত উৎপাদনের উপায়ের উপযোজন ও ব্যবহারের ব্যাপারে ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত মানবিক সম্পর্কের রূপ।

সর্বমোট সামাজিক উৎপাদ — একটা নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) সমাজে উৎপন্ন সমস্ত বৈষয়িক মূল্য।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী — জমিতে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা এবং খোদ মজুরদের (ভূমিদাস) উপরেই আংশিক মালিকানার ভিত্তিতে, সামন্ত প্রভুদের (ভূস্বামী) দ্বারা ভূমিদাসদের শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-প্রণালী।

সামরিক-শিল্প সমাহার — সামরিক-শিল্প একচেটিয়া সংস্থাসমূহ, প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক চক্র ও রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের এক মৈত্রীজোট, যারা মুনাফা করা আর একচেটিয়া বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসন সুদৃঢ় ও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে নিয়ত অস্ত্র বাড়িয়ে তোলার পক্ষপাতী।

সামাজিক শ্রম বিভাজন — জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা সমাজে পৃথক পৃথক কাজকর্ম সম্পন্ন করা।

সাম্রাজ্যবাদ — একচেটিয়া পুঁজিবাদ, তার বিকাশের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়; ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু পুঁজিবাদ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বক্ষণ।

সুদ — ঋণ পুঁজির মালিকের অর্থ-সম্পদের সাময়িক ব্যবহারের জন্য ক্রিয়ারত পুঁজিপতি (শিল্পপতি বা বণিক) তাকে মুনাফার যে অংশটি দেয়।

সুষম বিকাশ — সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের এক সমরূপতা, যার অর্থ এই যে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্যগুলি সম্ভাব্য পূর্ণতম মাত্রায় অর্জন করার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা ও ক্ষেত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুপাতগুলি সমাজ নিয়ত ও ইচ্ছাকৃতভাবে রক্ষা করে।

স্থির পুঁজি — পুঁজির যে অংশটি উৎপাদনের উপায় ক্রয় করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং যার মূল্য উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয় না।

স্থূল বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র — অবৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল পুঁজিবাদের পক্ষ সমর্থন এবং বিদ্যমান সমাজতন্ত্র, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।